অনাগত সুদিনের তরে

"বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার" অনুবৃত্ত (Sequel)

হেম কানুনগো।

Prof: B. N. Banerjee.
Renaissance Publisher.
15, Bankim Chatterjee Street,
Calcutta.

Selling Agent :
Com. Broja Behari Barman.
Burman Publishing House.
72, Harrison Road,
Calcutta.

Printed by Sukumar Mitra
Sanjibani Press.
6, College Square, Calcutta.

পরিচয়

"অনাগত সুদিনের তরে" পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারী কত সহস্র বৎসর ধরে যে অপেক্ষা করছে তার ঠিক নাই। এই অনাগত সুদিনের আশা দিয়েই মানব সমাজে ধর্ম্মের উদয় এবং তার রকমারি ফিরিস্তি। সেই অনাগত সুদিনের সন্ধান ধর্ম্মের চর্চ্চায় না পেয়ে মানুষ তার নিজের জ্ঞান বুদ্ধির বলে তারই সন্ধানে বেরিয়েছে। আজ সে তার লক্ষ্যের সান্নিধ্যে এসে পড়েছে। তারই সন্ধান শ্রদ্ধেয় লেখক এই বইখানির মধ্যে দিয়েছেন।

কুসংস্কারের বদ্ধ কারা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর সত্যাশ্রয়ী নির্ব্বিকার মন যে সত্য মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে—তাই তিনি লিপিবদ্ধ করে দশের কাছে ধরে দিয়েছেন—আশা প্রত্যেক সত্যাগ্রহী মানুষ মানুষের প্রজ্ঞালব্ধ এই জ্ঞান সঞ্চয় করে জীবনের ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে।

মানুষের প্রজ্ঞালব্ধ যে জ্ঞান তা ক্রমবর্দ্ধমান এবং ক্রমবর্দ্ধমান বলেই ক্রমোন্নতিশীল। যা ক্রমবর্দ্ধমান ও ক্রমোন্নতিশীল তার সীমা টেনে ইতি করা যায় না। যতদিন মানুষ এ গ্রহে আপন প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে জীবনের পথে চলতে থাকবে, জ্ঞানের পরিসীমাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সে কারণ, প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞান অসীম এবং অসীম বলেই সার্ব্বভৌম হতে বাধ্য। এই সার্ব্বভৌম জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলতে যুগে যুগে মানুষকে যে মূল্য দিতে হয়েছে, উন্নতির পরিপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে অহঃরহঃ যে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে আসতে হয়েছে তারই রক্তাক্ত ইতিহাসই তথাকথিত মানব সভ্যতার ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হয় না। দাস আর প্রভু এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে সমাজে যত বৈষম্য যত সজ্ঘাৎ যত অনাচার, অত্যাচার, হিংসা, দ্বেষ,

এক কথায় পশুবৎ নীচ প্রবৃত্তির অবাধ প্রভুত্ব চলেছিল। সর্ব্ববিধ সুখ-স্বচ্ছন্দ ও প্রতিপত্তি লাভের লোভ, প্রভু শ্রেণীকে যেমন হিংস্রক করে তুলেছিল, অপর দিকে মনুষ্য জীবনের সকল অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে দাস শ্রেণী পশু পর্য্যায়ে নেমে গিয়েছিল। আজও সেই শ্রেণী-সংগ্রাম থামে নাই. ধর্ম্মের নামে, কৃষ্টির নামে বেশ মোলায়েম করে আজও তা' চালান হচ্ছে। আজও নানারূপ উপধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করে সেই প্রতিপত্তি ও সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগের উৎকট প্রয়াস প্রভুশ্রেণীরা চালিয়ে চলেছেন। "আমি" "আমার" ও "আমাদের" ইত্যাদি বিভেদ প্রসূত সঙ্কীর্ণ জ্ঞান দ্বারা দেশাত্ম-বোধ ও দেশ প্রেমের উপধর্ম্ম সৃষ্টি করে মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান ও ক্রমোন্নতিশীল জ্ঞানের পথকে রোধ করে দেবার চেষ্টার আর অন্তঃ নাই। যদিও আজ দেখতে পাচ্ছি ঐসব সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের কুসংস্কার পাশ ছিন্ন করে এই গ্রহের কোনও এক ভৌগলিক সীমাবদ্ধ স্থানের অধিবাসীরা মানবতার পথে চলার জন্য আয়োজন করছে, মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতির পথের সন্ধান সকল দেশের দাস-শ্রেণীদের কাছে ধরে দিয়েছে, কিন্তু তাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য প্রভুশ্রেণীদের তোড়জোড়ও কম হচ্ছে না। দেশ-প্রেম নামে উপধর্ম্মের দোহাই পেড়ে দাস শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে তোলার কোনও আয়োজনই তারা অসম্পূর্ণ রাখছে না। শ্রেণী সংগ্রামের এই জ্বলন্ত ইতিহাস আজকের দিনে মানব সভ্যতার এক নূতনতম অধ্যায় সৃষ্টি করেছে তা' চক্ষুষ্মান মাত্রেই দেখতে পাচ্ছে।

গ্রন্থকার বাঙ্গলা সাহিত্যে একেবারে অপরিচিত নন। তাঁর মত জ্ঞানী ও সাহিত্যিককে লোক সমাজে পরিচিত করার প্রয়াস আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ঠিক যেন প্রদীপ ধরে চাঁদ দেখানর মত দেখায়। সে ধৃষ্টতা আমি করব না। যে সত্য তিনি মাদ্রাজে নয় আন্দামানে বসে তাঁর মানস চক্ষে ধরতে পেরেছিলেন তাকেই তিনি "অনাগত

সুদিনের তরে" বলে লোক সমাজে ধরে দিয়েছেন। তিনি জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর তাঁর জ্ঞান সৌধের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। তিনি প্রকৃত জ্ঞানী কাজেই তিনি শিব (শুভ) সুন্দরের উপাসক। নির্লিপ্তভাবে নিরালায় বসে তিনি অনাগত মানব সমাজের যে নিখুঁত ছবি দক্ষ শিল্পীর ন্যায় এঁকেছেন তা নিছক কল্পনা নয়, অলিক স্বপ্ন নয়, তা কুসংস্কারমুক্ত শুদ্ধ মনে প্রতিভাত জাগ্রত সত্যেরই রূপ।

তাঁর বলার ভঙ্গী ও ভাষা আধুনিক এবং তিনি বলছেন তাঁদেরই জন্য, যাঁরা নির্জ্ঞান ও অবচেতন মনের মধ্যে জড়িভূত কুসংস্কারের চোখ রাঙ্গানী থেকে সংজ্ঞান মনটিকে শৈশবকাল হতে মুক্ত রাখবার সুযোগ পেয়ে এসেছে—শুধু সুযোগ পাওয়া নয় লীনাদেবীর মত ঘরে বাইরে সত্যানুসন্ধানের কাজে লাগাতে পেরেছে।

তিনি Revolution এর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তা' ধারাবাহিকভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন। আদিম জীবের সৃষ্টি ও তার চেতনার সঙ্গে উদ্ভূত সহজাত মূল প্রবৃত্তিগুলি, তাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রগতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে যে তথ্য প্রশ্নোত্তর ছলে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন তা' প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই সাদরে গ্রহণ করবে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। কেননা তা চিরন্তনী সত্য। যা' চিরকালের সত্য তা' মানবের মঙ্গলপ্রদ। সত্য ও শিব বলেই তা চিরসুন্দর।

পুস্তকখানির যথার্থ পরিচয় দিতে গেলে তাঁরই ভাষায় তাঁরই ভাবে কথা কইতে হয়। সে চেষ্টা আমি করব না। আমি শুধু পুস্তকখানি সকলকে পড়তে অনুরোধ করছি। বিশেষ করে তাঁদের বলি, যাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের পরীক্ষা সমুদ্র পার হয়ে অথবা না হয়ে, আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা এই দুই প্রবৃত্তিকে ধরে, শৈশব হতে অর্জ্জিত অবচেতন মনের কুসংস্কারের বশেই জীবনের নীড় বেঁধে বসেছেন অথবা বাঁধতে চলেছেন।

এই বইখানিতে তাঁরা দেখতে পাবেন ; আগে revolution নিজের মনের মধ্যে না আনতে পারলে, গ্রন্থকারের কথায় সেই মরণে না মরতে পারলে, revolution এর প্রকৃত তাৎপর্য্য কোনদিনই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন না।

গ্রন্থকার এই কর্ম্মময় পৃথিবীতে মরে অকর্ম্মণ্য হয়ে যে সত্যের কথা বলতে চেয়েছেন তাতে যদি কৈতববাদীদের মন সঙ্কীর্ণ কৈতববাদের কবল হতে মুক্ত হবার জন্য কখনও উন্মুখ হয় তবে তাঁর শ্রম সার্থক হবে। আমার কিন্তু সন্দেহ হয় যে সহস্র সহস্র বৎসরের উৎকট কৈতব-বাদের সাধনায় যে জাতীর মনে কড়া পড়ে গেছে তাতে caustic লাগালে কি সারবে ? Acid Picric এর ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ?

হরি কুমার চক্রবর্ত্তী

লেখকের নিবেদন

বৈজ্ঞানিক ডঃ আইন্‌ষ্টাইন্ বলেন :—

(যুগান্তর, ১৯শে সেপ্টেম্বার, ১৯৪৫ ।)

"বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সভ্যতা এবং মানব সমাজের মুক্তি নাই। মানব সমাজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, (সার্ব্বজনিন) ন্যায় নীতিই এই রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগুলি সশস্ত্র থাকিবে ততদিন যুদ্ধ বাধিবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রহিয়া যাইবে।" সত্যকার বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই এই অভিমত।

এই ভবিষ্যৎ বাণীর 'বিশ্ব রাষ্ট্রই' আমাদের এই 'অনাগত সুদিনের তত্ত্বের' বিষয়-বস্তু।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানব ইতিহাসের ধারা জাগ্রত চেতনায় অনুধাবন করলে, দেখা যায় যে, জনগণের বহুকালের দুর্নীতি-দুর্গতিপূর্ণ দুর্দ্দিনের পর সত্য-সুদিন, ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে জয়ের পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছিল। চিনের গৃহ-যুদ্ধ সমাপ্তির পর, সে সুদিনের সুপ্রভাত হয়ত হত। কিন্তু এই সেদিন তার জয়ের শেষ ধাপে, জয়ের পথ রুদ্ধ করল আণবিক বোমা।

এই মানবিক দুর্ভাগ্যে রাসিয়া ছাড়া প্রায় সমস্ত দেশে হিট্‌লারিজম্ অল্প বিস্তর ঘোমটা খুলছে,—বিশেষ করে ভারতে।

এখন কেবল সাম্যবাদ বনাম হরেক রকম বৈষম্যবাদ অর্থাৎ পরার্থপরতা বনাম রকমারি কায়েমী স্বার্থপরতার মধ্যে স্নায়বিক সংঘর্ষ সুস্পষ্ট হতে থাকবে। এতে মানবিক "ন্যায়-নীতি" বা সার্ব্বজনীন সত্যের গতি কিছুটা পশ্চাৎ অপসরণ করবে, মাত্র-কয়েক বছরের জন্য।

এই সংঘর্ষ হচ্ছে বিশ্বের আর্থিক বৈষম্যজাত দুর্নীতি দুর্গতি বনাম সার্ব্বজনিন সাম্য মৈত্রী অনধীনতা নিয়ে। এই বিরাট সত্যটা সম্বন্ধে ইত্যবসরে দুনিয়ার জনগণ আরও অনেকটা, আর ভারতে জাতীয়তাবাদীগণ কিছুটা সচেতন হবেন।

এখন এই জয়যাত্রার পথপ্রদর্শক রূপে, অগ্রদূত রাসিয়া পন করেছে, ছ'মাসের মধ্যে অটম বোমা অথবা অটম বোমা অপেক্ষা অধিকতর ধ্বংসাত্মক কোন কিছু আবিষ্কার করবেই।

ছ'মাস হোক বা নাহোক, অনতি বিলম্বে তা না করলে, জগতের ধনতন্ত্রবাদ (অর্থাৎ প্রকৃত সাম্যতন্ত্র বিরোধী যে কোন তন্ত্র) দুনিয়া হতে বিলুপ্ত হবে না। তা না হলে সারা দুনিয়াতে খাঁটি সাম্যতন্ত্রের প্রচলন সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হবে। আর হবে প্রত্যেক দেশে নব নব হিট্‌লারের অভ্যুত্থান। এরি মধ্যে তা হতে সুরু করেছে। বকেয়া হিটলার বা তার প্রেতাত্মা হয়ত সমাধি ফুঁড়ে, নব হিটলারদের হাতে হাত মেলাতে পারবে।

দুনিয়ার ইতিহাসে, এই সর্ব্বপ্রথম রাসিয়াতেই সার্ব্বজনিন সাম্যের সত্যিকার ভিত্তি মাত্র হাতে কাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনও কিন্তু সাম্যবাদ পূর্ণরূপে রাসিয়াতে অভিব্যক্ত হয় নি। তবু ঐ আদর্শ অবিলম্বে দুনিয়াতে প্রবর্ত্তিত করতে না পারলে রাসিয়ার ধ্বংস অনিবার্য্য। কাজেই মরণ পণ করেই, জগতের অন্য সব স্বার্থান্বেষী প্রভু-দাস তন্ত্রীদের অমানুষিক যুদ্ধ, বাধা, বিঘ্ন, বিরোধিতা সত্ত্বেও, পৃথিবীকে (সেই সঙ্গে সাম্যাতঙ্কগ্রস্থ ভারতকেও) এক অখণ্ড বিশ্বরাষ্ট্রে পরিণত করতে রাসিয়া নিজের প্রাণের দায়ে এখন বাধ্য।

সেই আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ব-বিপ্লবের পর আসবে সেই সুদিন, যেদিন সার্ব্বজনিন সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার স্থায়ি ভিত্তি হবে সর্ব্বমানব হৃদয়ে চির সুপ্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ উদ্ভূত হবে অনধীনতার সত্য "বিশ্বরাষ্ট্র"

কম্‌সে কম্ তিনটি জেনারেসন্ (শত বছর) লাগবে তার পূর্ণ সুষমা মণ্ডিতস্বরূপ ক্রমাভিব্যক্ত হতে।

ঐ পূর্ণ বিকশিত সুদিনের অবশ্যম্ভাবী সুস্পষ্ট ছবি মানস নেত্রে ভিজুয়েলাইজ করবার সাধনা ক'রে আসছি আমার দ্বীপান্তরের সুরু হতে।

আমার সেই মেণ্টাল ইমেজারির (মানসপটে প্রতিফলিত) একটা সুপ্রকৃত রিয়ালিস্‌টিক প্রতিকৃতি এই "অনাগত সুদিনের তরে" বইখানাতে রংতুলির বদলে, কালিকলমে এঁকেছি।

জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রী, কমিউনিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট আদি দল নির্ব্বিশেষে জাগরণোন্মুখ জ্ঞান-বিশিষ্ট সবুজ পাঠক পাঠিকার ভাব-প্রবনতাহীন সুদৃঢ় নিপুণ হাতে সস্নেহে এই বইখানা বড় আশা করে তুলে দিলাম।

ভারত এখনও ঐতিহ্য মদে মত্ত অবস্থায় সুষুপ্ত ; অবিলম্বে এ ঘুম না ভাঙ্গালে অখণ্ড বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ভারত মহাআপদ হয়ে দাঁড়াবে। দুনিয়ার প্রায় সকল দেশ ঐ সাম্যের জন্য যে মারাত্মক ভাবে উন্মুখ হয়েছে, ভারত কি তা'হতে রেহাই পাবে ?

পৃথিবীর এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে, কোন দেশ পৃথকভাবে দুর্নীতি-দুর্গতির কবল মুক্ত হতে পারে না। ভারত কি পৃথকভাবে আপন তথাকথিত জাতীয় স্বরাজ বা স্বাধীনতা আদায় করতে পারবে ? করলে তা রক্ষা করতে পারবে ?

তাই পরম ও চরম গন্তব্য স্থান, যার সামাজিক বা বৈষয়িক অবস্থার সর্ব্ব বিষয়ে সার্ব্বজনিন প্রাচুর্য্য ও মাধুর্য্যের একটা অবশ্যম্ভাবী লোভনীয় রূপ, সঙ্গত সুস্পষ্ট ও বোধ্যভাবে মানসচক্ষে আগে প্রত্যক্ষিভূত না করে, ধোঁয়াময় শূণ্যে গন্তব্যের পথ খোঁজা—"মাথা নাই তার মাথা ব্যথার" মত নয় কি ? এরূপ স্থলে খালি স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে

যে কোন ধোঁয়ার পথে দৌড়ন 'বকাণ্ড প্রত্যাশা ন্যায়ের' সামিল বই আর কি!

ন্যাসানেলিজম, সোস্যালিজম, কমউনিজম, ডেমক্রেসী আদি গোলক ধাঁধাময় গন্তব্যের যে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে তার সঙ্গে আমাদের এই অনাগত সুদিনের তরে অঙ্কিত সাম্য মৈত্রী অনধীনতার সুস্পষ্ট রূপটি, পাঠক ভাই-ভগিনীগণ, মিলিয়ে দেখবেন—সার্ব্বজনিন সর্ব্বাঙ্গিন মঙ্গলের ইহাই আপাতত উচ্চতম আদর্শ কিনা?

আর একটা কথা, দেশে বিদেশে এতরকম যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা, সনন্দ, নববিধান আদি অবোধ মনকে প্রবোধ দেবার জন্য, নিত্য এমন রূপায়িত হয়ে বিঘোষিত হচ্ছে যে, তা থেকে সত্যিকার নির্দ্দিষ্ট কোন ধারণায় আসা মুস্কিল। বিশেষ করে এ দেশের পক্ষে কোন রকম একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা যাতে জনগণের মনে ঠিকমত না জাগে, সেজন্য হরেক রকম ঢংএ রূপায়িত অসংগত রহস্য জড়িত ঘোষণা একটার পর একটা নিয়ত প্রচারিত হচ্ছে।

তার মধ্যকার একটা প্রণিধানযোগ্য নমুনা হচ্ছে—ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকার তিনটা রংএর তথাকথিত ব্যাখ্যা, যার নির্গলিতার্থ একটা শ্লোগানে রূপ নিয়েছে, তা হচ্ছে ঐক্য—ঐতিহ্য—স্বাধানতা (যার মানে Self dependence)। এইটা প্রায় সমস্ত দেশের জাতীয় আদর্শের অন্তর্নিহিত সনাতন রূপ। শুধু ভারত নয়, প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের মূল সূত্রই ছিল প্রভুদাস তন্ত্র। এখন সেই তন্ত্রটা নানা দেশে নানাপ্রকার বিভূতি বিলেপিত রূপ নিয়েছে।

কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের বহু বিঘোষিত শান্তি শৃঙ্খলা মানেই হচ্ছে,—প্রভুদের প্রতি অগনিত দাসেদের ভয় ভক্তি-বিজড়িত বাধ্যতা মূলক মুক বশ্যতা। এখনও ঐ 'পায়াস' রীতিনীতি ঐক্যের মূলাধার

রূপে অন্তত ভাবতে কাম্য। অন্য পক্ষে প্রভুকে প্রভুতে প্রতিকার-হীন স্বার্থের মারাত্মক দ্বন্দ্ব সংঘর্ষই ছিল চিরাচরিত 'পাম্পাস' কৃষ্টি বলে পরিগণিত। দাসে দাসে আবার ছিল ক্ষুদ্র স্বার্থের নিরন্তর টানাটানিজনিত দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ। প্রভুদের গালভরা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ছিল ধর্মাধিকরণ, যেখানে ওকালতির কেরামতিতে শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখবার হত ভান।

এখন দেখুন, ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যে প্রজারক্ষণই ছিল রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম (Virtue)। দুষ্কৃতের দমন আর সুকৃতের পালন অবতারের ধর্ম। রাম ছিলেন উভয়ত আদর্শ রাজা ও পূর্ণ অবতার। তাই তার রাজ্য ছিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ রাজ্য, এখনও যা কাম্য। সেই রামরাজ্যে ছিল চিরদাস (শূদ্র) আর ক্রীতদাস প্রথা নিখুঁতভাবে প্রচলিত। দাসেদের উৎপাদিত সম্পদে রাম বশিষ্ঠাদির স্বশ্রেণীস্থ জনকত প্রভুর, প্রভুজনোচিত তথাকথিত চতুর্বর্গের ফল হত লাভ। এদিকে অসংখ্য শূদ্র আর ক্রিতদাসদাসীর প্রত্যেকে, প্রভুর গৃহপালিত পশুর মত সজীব অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে হত গণ্য। তখন আর তৎপরবর্তি কালেও দুনিয়ার কোন্ দেশেই বা তা না হত। যেমন গণতন্ত্র আর মানবতা আদি শব্দের জন্মভূমি এথেন্সে।

রামরাজ্যে শম্বুক ছিল শূদ্র দাসশ্রেণীভুক্ত। মানুষোচিত কোন অধিকারের অভাব বোধ দাসেদের মনে যাতে না গজায়, সেজন্য প্রভুরা চেষ্টার কোন ত্রুটিই করেন নি। তবু শম্বুক প্রভুদের অহিংস ধর্মের ওপর আস্থা স্থাপন করেই, ভয়ে ভয়ে গেছিল নির্জ্জন বনে লুকিয়ে অদাসোচিত তপস্যা করতে। ফলত এই পাপেই নাকি গেল একটা প্রভুপুত্র মারা। এটা অতি-বৈজ্ঞানিক সত্য! তারপর জনগণের মৌন সম্মতিক্রমে বিনা বিচারে, গণতান্ত্রিক আদর্শে রাম জল্লাদরূপে

সহস্তে মুণ্ডপাত করলেন হতভাগ্য শম্বুকের। রামের হাতে মরা হেন পুণ্য বলে, আত্মাহীন শূদ্র শম্বুক, যাই হোক, গেল উর্ব্বসি মেনকা আদি অপসরী কিন্নরী সমাকীর্ণ স্বর্গে।

সেকাল হতে একালতক বিংশ শতাব্দীতেও হিন্দু ভারতে জনগণ (দাস শ্রেণী) অন্তরের সহিত রাম রাজ্যই কামনা করে। ভূত তাড়াতে এখনও লোকে রাম রাম বলে। পণ্ডিত প্রভুরা বলছেন এইত খাঁটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী যা বর্ত্তমান ভারতে প্রযোজ্য! এইত খাঁটি হিটলাবিজম্!

রাম রাজ্যের দুর্ম্মুখ প্যাটার্ণ গণতন্ত্রের কনামাত্র অপ্রির সত্যের নমুনা এখানে দেখাতে বাধ্য হলাম,—উক্ত ঐতিহ্যের আর যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার প্রকৃত স্বরূপের ইঙ্গিত দিতে।

এই "অনাগত সুদিনের তরে" লিখতে গিয়ে, আমাকেও অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করতে হয়েছে। কারণ সে সুদিনে মিথ্যার লেশমাত্র থাকলে তাকে আর সুদিন বলা চলে না। আবার সু-যা তাই সত্য, আর সার্ব্বজনিন সত্য যা তাই সু। কাজেই সার্ব্বজনিন সত্য যা 'ভিজুয়েল আইতে' দেখছি, তাই 'অনাগত সুদিনের তরে' দেখিয়েছি।

কিন্তু সার্ব্বজনিন সত্য, সকল দেশের কায়েমী স্বার্থজীবিদের পক্ষে যে কত অপ্রিয় ইতিহাস তার সাক্ষ দেয়। সক্রেতিস, এরিস্ততল্, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি চার্ব্বাক সম্প্রদায়, শূন্যবাদী পাষণ্ড বুদ্ধ, চণ্ডালাশোক, দেকার্ত, গ্যালিলিও, ডারউইন, ডিরোজিও, কার্লমার্কস, লেনিন, ষ্ট্যালিন, মানবেন্দ্র প্রভৃতি শত শত সত্যবাদী যুগে যুগে ধর্ম্মাধিকরণে, মৃত্যুদণ্ড, কারা, নির্ব্বাসন, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন আদি ভোগ করেছেন, এখনও বহু সত্যবাদী লোকমতে নিন্দিত ঘৃণিত ইত্যাদি। আবার সেই স্বার্থবাদীদের কাছে যে মিথ্যা তাদের স্বার্থের পোষক, তা

তাদের কতপ্রিয় তার একটা ছোট্ট নমুনা হচ্ছে "জগত মিথ্যা"! তার অকাট্য প্রমাণ— "রজ্জুতে সর্পভ্রম"!

তাই বোধ হয় চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—'মাব্রুয়াৎ সত্যমাপ্রিয়ং। সার্ব্বজনিন সত্যই যে প্রকৃত সত্য, তা ব্যক্তি বা শ্রেণী স্বার্থান্বেষীদের পক্ষে অপ্রিয়ত হবেই। তাই হয়ত চাণক্য পণ্ডিত প্রকারান্তরে বলেছেন সত্য কখনও বলবে না! কারণ অপ্রিয় সত্য বললে, সত্য ভাষীরই সমূহ বিপদ। যেমন গ্যালিলিও, ডারউইন, আদির বিপদ ঘটেছিল। কিন্তু তাতে সত্য ভাষণজনিত সার্ব্বজনিন মঙ্গল অথবা সত্য অপ্রিয় হলেও তার প্রভাব বা ক্রিয়া গৌণ হতে পারে, কিন্তু তা কখনও অমঙ্গলজনক হতে পারে না। সত্যভাষীর সঙ্কটে এবং সত্যের মহিমা বাড়ে।

এখানে সঙ্কটটা সত্যভাষীর ব্যক্তিগত। অপ্রিয় সত্যটা কিন্তু সর্ব্বজন মঙ্গলদায়ক। কাজেই যেমন করেই হোক সত্যবক্তার ব্যক্তিগত বিপদ সত্ত্বেও সত্য প্রকাশ করাই সত্য-সুন্দর-নীতি।

কিন্তু আমার ভয়, বিনা বিচারে, সনাতন স্বভাব বা অভ্যাসবশতঃ অপ্রিয় সত্য যদি অপাঠ্য হয়।

সর্ব্বলোক মান্য ঈশপ তাই বলেছেন—"কদাচিৎ মিথ্যা বলিও না, কৌতুকচ্ছলেও না"! অথচ তিনি আবার জানোয়ারের মুখ দিয়ে মানুষের ভাষা ফুটিয়ে মানব-আচরণ-নীতি শিক্ষা দিতে ফেবল (গল্প) রচনা করেছেন। ঐ সকল মিথ্যা গল্পে সত্য বা সত্যের প্রভাব ব্যাহত না হয়ে, হয়েছে সত্যের অপ্রিয়তা কিছুটা বর্জ্জিত। অধিকন্তু সত্যকে গ্রহণযোগ্য করবার জন্যই, মিথ্যা গল্পের পটভূমিকায় তার রূপটি সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। তাঁর নীতির এই অসঙ্গতি জগতে মার্জ্জনীয় আর বরনীয় হয়েছে।

সত্যের অপ্রিয়তা বর্জ্জন জন্য আমিও তাঁর এই অনন্যকরনীয় পন্থার খানিকটা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

পাঠক পাঠিকার আবদার রক্ষা করতে ঈষৎকে যেতে হয়েছে অনেকটা জন্তুজগতে, আর আমাকে যেতে হয়েছে—পৃথিবীর সদৃশ একটি অন্য গ্রহে।

এখন আমার পাঠক পাঠিকাগণের কাছে, নিবেদন এই যে, আমার এই নির্দ্দোষ অসঙ্গতি মার্জ্জনা করে স্ব তার মর্য্যাদা রাখুন।

এও বলতে চাই যে, এই দুনিয়ার দুর্নীতি পূর্ণ আবহাওয়াতে, এই লেখক কোন ছার, কেউ দুর্নীতির মূল যে মিথ্যা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে বা কেঁদে সেই মিথ্যাচরণ না করে এই সনাতন মানব সমাজে টিঁকতে পারে না। কিন্তু অনাগত সুদিনের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন অভিনব মানুষ অতিদায়ে পড়লেও মিথ্যাচরণ করতে পারবে না। অর্থাৎ মিথ্যাচরণের শক্তি কারো থাকবে না।

সত্যের এ অপ্রিয়তা বর্জ্জন ক'রে, অনাগত সুদিনের সত্য রূপটি মানস নেত্রে প্রতিফলিত করবার উপায় খুঁজতে আন্দামানের 'সেলে' বন্দ থেকে আমার কত বিনিদ্র রজনী সানন্দে কেটেছে। তারপর বিগত মহাযুদ্ধের সময় সেখানে আমাদের পাহারায় নিযুক্ত যুবক ব্রিটীশ সৈন্যদের মধ্যে ছিল একজন রবার্ট ওয়েনি প্যাটার্ণ 'ব্রিটীশ' সোস্যালিষ্ট, সে হয়েছিল আমার বন্ধু। ধনতন্ত্রের বৈষম্য বনাম সাম্যতন্ত্র নিয়ে আমাদের সতীর্থ ২।৩টি বাঙ্গালী যুবক বন্ধুর* মধ্যে নিরিবিলিতে চলত আলোচনা। আমাদের বচসার মর্ম্ম তাকে কিছুটা বুঝিয়ে দিতে, সে অতি গোপনে আমায় কয়েকখানা বই লুকিয়ে পড়তে দিয়েছিল। তারমধ্যে একটা বই ছিল এডওয়ার্ড বেলামীর 'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড'। তাতে রেভলিউসনের একশ বছর পরে, বোষ্টন নগরের সাম্যবাদের সমৃদ্ধ রূপটি দেখান হয়েছে একটা কল্পিত গল্পের পটভূমিকায়।

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল শ্রীযুক্ত নাহুফুল চাটার্জ্জি।

দেখাতে দেখাতে নায়কের প্রশ্নের উত্তরে, নায়িকার মুখ দিয়ে, সাম্যতন্ত্রের অনুকূলে বা প্রতিকূলে যত কিছু সমস্যার সমাধান করতে লেখক অতি বিচক্ষণতার সহিত চেষ্টা করেছেন।

তিন চারশ' পৃষ্ঠার ঐ বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮খৃ অব্দে। তার দশ বছর পরে, ঐ বইখানাতে যা বলা উচিত ছিল, অথচ বলা হয় নি, তা লিখে এর সিকোয়েল স্বরূপ চার পাঁচ শ' পৃষ্ঠার 'ইকোয়ালিটি' নামে আর একখানি বই ১৮৯৭ খৃ অ প্রকাশ করেন।

তাঁতে রেভলিউসনের একশ বছর পরে অর্থাৎ তিন চারটি জেনারেসন অতীত হলে, বংশগত কর্মপ্রবৃত্তি বা সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হবার পর, মানুষ সাম্য-মৈত্রী অনধীনতার পূর্ণ আদর্শে আনন্দময় জীবন, কি রকম যাপন করছে, তার সুযুক্তি পূর্ণ বিবরণ পড়তে পড়তে আনন্দ আশায় আর বিস্ময়ে মনকে অভিভূত করে ফ্যালে।

প্রায় আট শ' পৃষ্ঠার ঐ বই দু'খানাতে লেখকের এত বিস্তৃত বিবরণ এবং নানাদিক থেকে তার বহুবিধ সমস্যার এত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমাধান, আমার মত সাধারণ পাঠকের বোধশক্তির পক্ষে ঠিকমত ধারণা করা দুঃসাধ্য। তা হলেও প্রত্যেক তথাকথিত 'স্বাধীনতা' কামীর ঐ বই দু'খানা পড়া অবশ্য কর্তব্য।

যাই হোক, কিন্তু বেলামীর অনেক কিছু আমাদের অনাগত সুদিনের তরে' বইখানাকে সুষমামণ্ডিত করতে লাগিয়েছি, বিশেষ করে গল্পের পটভূমিকায় প্রকৃত সত্যের অপ্রিয়তা সম্যক বর্জন করবার কৌশল, বেলামীর ঐ দু'খানা বই থেকে শিখে না নিলে, আমার অনাগত সুদিনের কথা লেখা হয়ত হত না। বেলামী এবং সেই সোশ্যালিষ্ট সৈন্য বন্ধুর সশ্রদ্ধ স্মৃতি, এই 'অনাগত সুদিনের তরে' চিরকাল বহন করবে।

বেলামীর সাম্য মৈত্রী অনধীনতার আদর্শ কিন্তু ভক্তির সহিত

নিতে পারিনি। তাঁর ঐ গ্রন্থ দু'খানা পড়বার আগে, উরোপে এনাকীষ্ট ও বলসেভিক্ দলভুক্ত হয়ে, অনধীনতার পূর্ণতম পরিণতির পরবর্ত্তি অবস্থা সম্বন্ধে একটা নিখুত যে ধারনা সংগ্রহ করতে সুরু করে ছিলাম, আর যা সুসামঞ্জস্যরূপে ভিজুয়েলাইজ করবার সাধনা এত কাল করে আসছিলাম, তাই পরবর্ত্তি কালের জাগতিক নানাবিধ ইভলিউসনারী আর রেভ লিউসনারী ধারণার ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে, সব দিক থেকে, রীতিমত পার্সপেক্‌টিভ বজায় রেখে, এই অনাগত সুদিনের তরের প্রথম খণ্ডে তার সংক্ষিপ্ত স্বরূপ দেখাতে চেষ্টা করেছি।

বেলামী ছিলেন খাটি আমেরিকান। এই সময়ে আমেরিকার বৈপ্লবিক সমস্যা ছিল ক্যাপিটাল্ বনাম লেবার অর্থাৎ পুঞ্জিপতি বনাম শ্রমিক সংঘর্ষ জাত। সেখানে উপনিবেশ পত্তনের গোড়া থেকে সনাতন সভ্যতা, ঐতিহ্য ভেন্‌-গ্লোরী, ধর্ম্মতন্ত্র, ভূতপ্রীতি, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি রূপ দুরারোগ্য সংক্রামক মানসিক ব্যাধির বিশেষ প্রকোপ ত ছিলই না, বরং ঐ সকল ব্যাধির প্রতি বিভিষিকার ভাব বেহুসে খানিকটা ছিল, তাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উগ্র প্রগতিশীল জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মার্কিন বাসী। তাদের শ্রেণী চেতনা ও মামুলি ভাবে জেগেছিল, অর্থাৎ শ্রমিক আর মজদুর শ্রেণীর সম্যক ঘুম ভেঙ্গে ছিল। তাই তাদের বোধ শক্তি আর হীন স্বার্থজনিত কুযুক্তি প্রবণতা কতকটা ক্রমে উদার হতেছিল।

তাদের অভাব বোধ বৃদ্ধি জনিত দারিদ্র্য দুঃখের অনুভূতি বা তার যাতনা বোধ তীব্রতর হয়ে ছিল বলেই, উরোপ থেকে স্বর্গাদপি গরিয়সী স্বদেশ আর তার ঐতিহ্য আদির মায়া কাটিযে আমেরিকায় পালিয়ে এসে দু'শ বছরের মধ্যে উরোপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নবঐতিহ্যের পত্তন দিতে পেরেছে।

এরূপ আর্থিক বৈষম্য, ক্রিশ্চান মরালিটির প্রেসার বা চাপ দ্বারা

ঘুচিয়ে, ক্রিশ্চেন সাম্য প্রতিষ্ঠা করা বেলামীর পক্ষে সহজ হতে পেরেছিল, তা বলে ওল্‌ড্‌ ওয়ার্লড এর বেলায় ও সেই সাম্যের বিধান প্রয়োজ্য হবার সম্ভাবনা নাই।

প্রত্যুত তাঁর সাম্যের পৃথিবীতে, পৃথক দেশ পৃথক ভাষা, পৃথক ধর্ম পৃথক সংস্কৃতি ইত্যাদি যা বৈষম্য বা দ্বন্দ্বের আর দুর্নীতির মূলাধার তারই কিছুটা মার্জিত সংস্করণ, বেলামী দেখিয়েছেন তাঁর বিচিত্র ভাবিসাম্যের পৃথিবীস্থ বোষ্টন নগরীতে। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ওয়েণের নব উদ্ভাবিত (?) অপরূপ ব্রিটিশ সোস্যালিজম অপেক্ষা বেলামীর সাম্য বাদ কিছুটা মন্দের ভাল।

তাই আমরা মার্কসপন্থি লেলিন আদির প্রবর্ত্তিত সম্ভাব্য সাম্য বাদের আদর্শ, সার্ব্বজনিন বলেই বহুলাংশে নিয়েছি। আরো অনেকের (যেমন প্রিন্স ক্রোপটকিন্‌ আদির) মহান আদর্শের ও কিছু কিছু নিতে হয়েছে, অথচ তাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারি নি।

এখানে আমার বলা উচিত যে অথরটি কোটেসন ও দৃষ্টান্ত আদি দ্বারা প্রভাবিত করলে, লেখকের বক্তব্য-সত্য, বিনা বিচারে মেনে নিতে, পাঠককে বেহুসে বাধ্য করা হত। যাঁরা লেখকের লিখিত সত্য নিজেদের বিচার বুদ্ধির কষ্টি পাথরে কষে নেন বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যাচাই করে নেয়া উচিত মনে করেন,—তাঁদের পক্ষে অথরিটি আদির দ্বারা সত্য প্রমাণ বিরক্তিকর।

তা হলেও আমি কিছুটা অথরিটি আদির আশ্রয় না নিয়ে পারি নি। কিন্তু তা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণের অপকৌশল রূপে নয়।

আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে, আমার লিখিত চিন্তা ধারার মধ্যে মৌলিক বলতে যা বোঝায় প্রায় তা নাই। মানুষোচিত চিন্তা আর তার খোরাক, ইন্দ্রিয়ের মারফত বাহিরে থেকেই মানুষের অন্তরে গৃহীত হয়। মানব সঞ্চিত জ্ঞানের বা সত্যের শাশ্বত ভাণ্ডার হতে তা

বিন্দু বিন্দু সংগ্রহ করেই মানুষ সংস্কার মুক্ত মানবোচিত জ্ঞান বা সত্য আহরণ করে। আবার সেই জ্ঞান, ঘটনা চক্রে কমপ্লেক্সের (অন্ধ সংস্কারের) অবদমন মুক্ত হয়ে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন সংজ্ঞান মনকে সত্যজ্ঞানের বা বিজ্ঞানের পথে চালিত করে। তার ফলে মন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লাভ করে।

আবার কারও বা সেই জ্ঞান তার অবচেতন মনের কমপ্লেকসের (সংস্কারাবদ্ধ ভাব পরনতার) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে, তার সংজ্ঞান মন বৈজ্ঞানিক সত্য সহ্য করতে পারে না। তাই আবহমান কাল বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে, স্বার্থ সর্বস্ব সনাতন অপ-বৈজ্ঞানিক সত্যের এত দ্বন্দ্ব। বৈজ্ঞানিক সত্যই যে সংস্কারের একমাত্র ক্রাইটেরিয়ান, তা পরে ঠেকে ক্রমে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও, ব্যক্তি, জাতি, সম্প্রদায় শ্রেণী আদিগণ স্বার্থের মোহে, সনাতনীদের তা অপ্রিয় হবেই। এই অপ্রিয়তা বশতঃ অসূয়া, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও রাগে সেই অকাট্য সতকে, শব্দ বিন্যাসের কৌশলে যে কোন প্রকারের অপবৈজ্ঞানিক ওকালতি ফন্দির দ্বারা মিথ্যা, ঘৃণ্য, বস্তুতান্ত্রিক, ইউটোপিয়া আদি অসংখ্য প্রকারে নিন্দনীয় বলে জাহির করা, স্বার্থ-সর্বস্বদের বদ্ধমূল স্বভাব।

ফরাসী ভাষায় এই ফন্দির নাম **আভোকেসিউ**, ইংরেজিতে এডভোকেসী শব্দটা ঠিক ঐ অর্থে বোধ হয় ব্যবহার হয় না। যাই হোক আমরা বাংলাতে একে বলতে পারি ওকালতি ফন্দি।

দুনিয়ার অতি উচ্চ ধর্মাধিকরণে বাদী, বিবাদী, আসামী আদির সপক্ষে, সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণ করাই ব্যবহারাজীবের অবধারিত কর্তব্য। একাধিক স্থলে হয়ত তা হয়।

প্রত্যুত স্বার্থের এই সনাতন লীলাভূমিতে প্রায় সকল স্থলে যেখানে, শুধু আইন ব্যবসায়ী নয়, যে কোন ব্যক্তি সত্যকে যত মিথ্যা, আর মিথ্যাকে যত অকাট্য সত্য বলে প্রমাণ করতে পারেন,

সেইখানে হয় ওকালতি ফন্দির চরম সার্থকতা অর্থাৎ হয় চরম অর্থলাভ আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণিন এমন কি সবজান্তা বিদ্যাবাগীশ বলে চরম ও পরম পূজা আদি লাভ।

জগত জোড়া এই মিথ্যা পরিস্থিতির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত থাকা বশতঃ কথায়, কাজে, ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে উক্ত ফন্দি মোতাবেক মিথ্যাচরণ, আবাল বৃদ্ধ বনিতার স্বার্থ সাধনের তথা জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হয়েছে – হতাই সর্ব্ববিধ দুর্নীতির মূ।।

একপ স্থলে ওকালতির স্বাধীনতা শব্দের অর্থ কি, আর সম্পূর্ণ অনধীনতার অবস্থায় সর্ব্বমানবের কি রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব—সজ্ঞান মনে তার একটা ঠিকমত ধারনা না করে আভোকেসিউর সংস্কার বশতঃ ভাবা বেগের (কম প্লেকসের) তাড়নায় ঐতিহ্য, স্বাধীনতা আদি বুলির দাপটে বাসিয়া ছাড়া দুনিয়ার সব দেশকে নতুন নতুন ঢঙ্গে সনাতন প্রভু দাস তন্ত্রের কবলে টেনে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা চলে আসছে। এ সম্বন্ধে কম্প্লেক্সের অবদমন মুক্ত সংজ্ঞান মনে বিজ্ঞান সম্মত স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা দেবার জন্যই "অনাগত সুদিনের তরে" লিখিত।

আমার শেষ নিবেদন এই যে মানব (নরনারী, মনুর অপত্য নয়, বরং হনুর অপত্য-হানব বললে সত্য বলা হত) আর তার অতীতের দুর্গতি দুর্নীতি পূর্ণ ঐতিহ্যের বাধা সম্পূর্ণ মার্জিত ও পরিবর্ত্তিত হয়ে ঐ সদৃশ গ্রহে কি রকম সুসমামণ্ডিত মানব সমাজ সুগঠিত হয়েছে, বর্ত্তমান দুর্গতি দুর্নীতি পূর্ণ এই পৃথিবীর ধারনা ক্ষনিকের তরে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে, আপনার কমপ্লেকসের অবদমন মুক্ত সংজ্ঞান মনের মানস ইন্দ্রিয়ে প্রনিধান করুন,—ঐসদৃশ গ্রহের সর্ব্ব মানবীয় সত্যম্ শিবম সুন্দরমের অপূর্ব্ব শ্রী যদি আপনার সত্যাতঙ্ক বশতঃ অপ্রিয় ছিরি হয়ে ঠেকে, তবে আমায় আপনার আভোকেসিউ

(ওকালতি ফন্দি) মোতাবেক যা খুসী গাল-মন্দ আদি দিয়ে, গায়ের ঝাল ঝেড়ে ফেলুন। তার পরেই কিন্তু, ভাই সবুজ পাঠক পাঠিকা, আপনি জীব জগতের শ্রেষ্ঠ জীব যে মানুষ, তার সমাজের সম্পূর্ণ দুর্গতি দুর্নীতি হীন একটা সম্ভব পর সদৃশ গ্রহের স্থষ্ঠ প্রতিকৃতি এঁকে দেখাতে পারলে তবেই আমার অনাগত দুদিনের তরে লেখা স্যার্থক হবে। এই

রাধানগর, খাকুড়দা পোঃ
মেদিনীপুর
২০শে অকটোবর, ১৯৪৫।

লেখক

অনাগত সুদিনের তরে

আমি দিল্লীর একটা হোটেলে তখন ছিলাম। সে দিন ব্রেকফাস্‌ট্ সবে শেষ হয়েছে, বাইরে—'তার হ্যায়' শুনে ব্যস্ত হ'লাম। বেয়ারা এসে টেলিগ্রাম দিলে, খুলে দেখি, মান্দ্রাজের এক হাসপাতালের সুপরিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ মেজর্ মাঁরে জানিয়েছেন—"মিসেস্ রায় দুদিন অজ্ঞান, এখুনি আসুন"।

ঠিকানা আবার পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, আমারই নামে টেলিগ্রাম বটে। কলকাতা হয়ে ফিরে এসেছে। সমস্যায় পড়লাম।

মিসেস্ রায় বলে পরিচয় দেবার মত অন্য কেউ ত আমার নেই, এইত ছিল আমার মনের ব্যর্থ প্রেমের সম্পদ্; বুঝেছিলাম এ লীনা দেবীরই কাজ; আজ কাল তাঁর চিঠির ভাবে মনে হচ্ছিল, আমাদের মধ্যে যে নিবিড় নির্ম্মল সৌহার্দ্দ্য ছিল, ক্রমে তা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কথা ছিল, দেশে ফিরে, তিনি মিসেস্ দত্ত বলেই পরিচয় দেবেন। বুঝলাম, এখন তিনি তা চান্‌না বলেই,

আমায় না জানিয়ে, অসঙ্কোচে একুশ বছর পরে মিসেস্ রায় হয়ে দেশে ফিরছেন।

রাজীব দত্তের মৃত্যুর পর মিসেস্ রায় হওয়ার বাসনা তাঁর মনে জেগেছে, মনে ক'রে বেশ তৃপ্তি পেতাম; আর তাঁর অনেক কথা আর ব্যবহার তার প্রমাণ ব'লে সন্দেহ করতাম। আবার অনেক সময় তা আমার হ্যংলা মনের নিছক কল্পনা ব'লেও মনে হত। যাই হোক, তাঁর বাসনাকে উস্কে দেবার প্রবৃত্তি কখনও আমার মনে ইচ্ছা ক'রে জাগ্‌তে দিই নি।

কিন্তু দু'বছর পূর্ব্বে যখন দেখলাম ঐ প্রবৃত্তি আর বশে রাখতে পারছিনা, তখন আমাদের পূর্ব্ব সঙ্কল্প কাজে পরিণত করবার অজুহাতে দেশে ফিরে এসেছিলাম। এখন বেশ বুঝলাম, এ মিসেস্ রায়টি লীনা ভিন্ন অন্য কেউ নয়। এসেছেন আমায় 'সার্‌প্রাইজ' দিতে। যাই হোক, আমি পরের ট্রেণে রওনা হলাম মান্দ্রাজে।

ট্রেণে যেতে যেতে লীনাদেবীর সম্বন্ধে অনেক কথা মনে আসতে লাগল। ছ'দিন তিনি অজ্ঞান! সবই যেন রহস্যময় বোধ হল। লীনাদেবীর প্রথম পরিচয়ের সেই অদ্ভুত চিঠি পাওয়ার পর থেকে উনিশ বছর অবিচ্ছেদে অসঙ্কোচ সাহচর্য্যের অতৃপ্ত স্মৃতি আমায় তখন তৃপ্তির নতুন অনুভূতি দিয়েছিল।

দুদিন পরে সকালে মান্দ্রাজে পৌছে, একটা হোটেলে

উঠলাম। ট্রেনের কাপড়-চোপড় ছেড়ে, ব্রেকফাষ্ট সেরে হাসপাতালে গিয়ে মেজর্ মারের সঙ্গে দেখা করলাম। খাতির আদান-প্রদানের পর জানলাম আটদিন আগে, ট্রেনের প্রথম শ্রেণী থেকে মিসেস্ রায়কে অজ্ঞান অবস্থায় আনা হয়েছে। ক'দিন খোঁজাখুজির পর নার্স তাঁর হ্যাণ্ড-ব্যাগে আমার নাম ও ঠিকানা লেখা একখানা চিঠি পায়, আর তাঁর চাবির থোলাতে গাঁথা প্লেটে লেখা ছিল—এল, রায়। তাই আমায় টেলিগ্রাম করতে এত দেরী হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম—অজ্ঞান হওয়ার—

মারে। না, ধরতে পারিনি, সম্ভবত কোন রকমে 'পয়জনিং'[১] হ'য়েছিল।

আমি। মিসেস্ রায় কি বলেন?

মারে। তিনি বলেন মাথায় একটা প্রচণ্ড 'সক্' পেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, আরও অনেক কথা, তা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি মনে ক'রে—খুব সম্ভব তিনি ক্ষুব্ধ হন।

আমি। এখন কেমন—

মারে। গত কাল তাঁর জ্ঞান হ'লে ঐ সব কথা বলেছিলাম। এইমাত্র নার্স বলে গেল, তিনি এখন ভালই আছেন। আপনি যখন ইচ্ছা তাঁকে নিয়ে যাবেন, আমায় অনুগ্রহ ক'রে তাঁকে মাপ করতে বলবেন, আমিও মাপ চেয়েছি তাঁকে। আবার

আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলে সুখী হব।

আমি খুব ক'বে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে মেম নার্সকে বলে দিলেন। নার্স আগে খবর পাঠিয়ে আমায় নিয়ে যেতে যেতে বলেছিল—ওঃ! মিসেস্ রায় একজন অসামান্যা 'গ্র্যাণ্ড লেডী! যেমন স্বাস্থ্যবতী, তেমনি লাবণ্যময়ী আর তেমনি—'

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, একটা ট্যাক্সী তাহলে অনুগ্রহ করে ডাকতে ব'লে দিন।

অমনি নার্স দারোয়ানকে একটা ভাল ট্যাক্সী আনতে ব'লে দিল।

একটা করিডোরে ঢুকে আমার অনুমান সত্য ব'লে বুঝলাম। দেখলাম কেবিন থেকে লীনাদেবী আমায দেখে যে ভাবে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে আসছিলেন, আর মুখের, বিশেষ ক'রে চোখের বিলোল কটাক্ষে আর ওঠ দুটির মাঝ রেখার এমন লীলায়িত সুঠাম ছন্দ আর কখনও কারুর দেখি নি।

একটু দূরে থাকতেই আমি ফরাসী ভাষায় বলেছিলাম, "কেমন আছেন, এখন কোন কষ্ট নাই ত?"

লীনাদেবী বললেন, "না, একটু দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কষ্ট যা ছিল, তোমাকে দেখে উপে গেল। (ইংরেজীতে) সে জন্য নার্সকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমিও দাও! বিশেষ ক'রে ইনি দয়া ক'রে খুঁজে পেতে তোমার ঠিকানা না বের ক'রতে পারলে, তোমায় এত সহজে পেতাম না। (নার্সের প্রতি) সিস্‌টার! আমার এই সামান্য আংটিটা তোমার আঙ্গুলে থাক্, যখন বরের দেখা পাবে তখন বরকে উপহার দিও"।

ধন্যবাদ দিয়ে নার্স আংটির প্রশংসা ক'রে আঙ্গুলে প'রল। হাসপাতালের লোক জনকে পুরস্কার দিয়ে আমরা ট্যাক্‌সীতে উঠলাম।

লীনাদেবীকে বাঙ্গালায় জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের রাউলকে কোথায় রেখে এলেন, মেলবোর্ণে ?

লীনা হুঁা।

আমি। ভিক্‌টোরিয়া খুব স্বাস্থ্যকর দেশ, না ?

লীনা। নিশ্চয়, মনে হয় সব জায়গা থেকে স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর।

আমি। রাউলের শরীরও খুব সুন্দর হয়েছে নিশ্চয়।

লীনা। অনেক সুন্দর হয়েছে। তোমাকে দুবছর আগে যা দেখেছিলাম, তার থেকে এখন খুব ভাল দেখছি না ত!

আমি। মন্দ কি? আপনার স্বাস্থ্যের কিন্তু অনেক উন্নতি হয়েছে, নয় কি?

লীনা। তোমার কি তাই মনে হয়? আমার মনে হয়, এই কয়দিনে মনটার বহুত উন্নতি হয়েছে, আর সেটা বিশেষ ক'রে মুখে ধরা প'ড়ছে হয়ত। যাক্ তুমি বুঝতে পারছ', তোমাকেই আমার বলবার অনেক কিছু আছে। তা বলবার জন্য মনটা এত অস্থির হ'য়েছে যে, আমি নিজকে সামলে নিতে পারছি না, তাই এত দিন পরে আলাপটা তোমার একটু খাপছাড়া ঠেকছে, নয় কি?

আমি। আচ্ছা তা যেন হল, কিন্তু আগে আপনি আমায় 'আপনি' 'আপনার' বলে আলাপ করতেন; এখন 'তুমি' 'তোমার' হল কেন?

লীনা। বেহুঁসে বেরিয়ে আসছে, দুবছর আগে বাংলায় খুব কম কথাই বলেছি। তোমায় 'আপনি' বল্‌তাম কি তুমি বল্‌তাম এখন ভুলে গেছি, সে ভাবটাও যেন বদলেছে, তাই না? সে এমন কিছু নয়, পরে হবে। আমায়ও 'তুমি' বলবে। এখন কথা হচ্ছে—মেজর্ মারে তোমায় যা

বলেছেন তা ঠিক নয়, তিনি আমায় পাগল করতেন, তুমি আজ না এলে।

আমি। ওঃ! তাই তুমি অফেণ্ডেড্ হয়ে ছিলে—না? মেজর্ সেজন্য তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু—

লীনা। চুলোয় যাক্ তোমার মেজরের ক্ষমা। তোমাকে আমার মৃত্যুর পরের সমস্ত ব্যাপার বলবার মোটেই তর সইছে না; আমার কেবলই ভয় করছে—তুমি ঐ সিলি মেজরের মত—

আমি। না না—সমস্ত শোনবার জন্য আমার মনেও—

লীনা। তুমি ত শুনবে নিশ্চয়, আর আমার রাউলকে শোনাবার জন্য আমি চাই—আমি মৃত্যুর পরের কথা যা তোমাকে প্রতিদিন বলব, সহজ বাংলা ভাষায় লিখে প্রতিদিন তা আমায় শোনাবে তুমি, সুসাহিত্যিক বা কবি ব'লে সুনাম না থাকলেও তুমি যে দুনিয়াতে নামকরা সুলেখক তা আমি সব চেয়ে বেশী জানি। এতদিন তা বলিনি কেন—তা হয়ত জান।

আমি। না ত?

লীনা। তুমি জান পরকীয়া সাধন প্রবৃত্তিকে উস্কে দেবার প্রধানতম অস্ত্র হচ্ছে—'য়্যাপ্রিসিয়েসন', তা আমি—

আমি। মনের জমাট্ 'য়্যাপ্রিসিয়েসন' মুখ দিয়ে প্রকাশ করাই তাহ'লে—

লীনা। থাক্ থাক্, সে সব হবে'খন্, এখন বলি কি—বচনের প্যাঁচ, সাহিত্যিক ষ্টাইল, অবোধ্য বা দ্ব্যর্থ করবার বাতিক অথবা সাহিত্যিক কলা-বৈশিষ্ট্যের বিলাস তোমার যে নেই—জানি। সাধারণে নিত্য যে ভাষায় কথা বলে তুমিও ঠিক সেই ভাষায় লিখবে। তবে তোমার বাংলা লেখার অভ্যাস নাই, তাই বলছি আমার বলা কথার ভেতর হয়ত অন্য ভাষায় অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে। যত দূর পার তার ঠিক মত বাংলা ক'রে নিও। যদি নেহাৎ না পার তবে বাংলা অক্ষরে তার ইংরেজী লিখে দিও। তুমি বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক, তার মানে তুমি 'স্কেপটিক্'; তাই তোমাকে বলছি—কোন কথা তোমার বিশ্বাস-যোগ্য না হলেও, তুমি আপাততঃ সন্দেহ প্রকাশ ক'রো না, তা হলে আমি পাগল হয়ে যাব। সমস্ত শুনে তুমি দেখবে, তার মধ্যেও তোমার আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছু প্রকৃত তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছ। আর যা অসঙ্গত মনে হবে, তার ব্যাখ্যা, আমার সব কিছু বলার শেষে দেখ্বে, হয়ত তুমি তাও ঠিক মত পেয়েছ। আমার

কেবলই ভয় হচ্ছে, অনেক কথা যেন ভুলে যাচ্ছি। ঘটনাগুলো এমন ভীড় ক'রে নিয়ত মনে আসছে যে, সব গোলেমালে তাল পাকিয়ে যায়, এই ভয়। তাই শীঘ্র তোমায় বলবার জন্য এত অস্থির হয়েছি। দেরী করলে আবার মরে যাব—এও আমার ধারণা। এখন হোটেলে গিয়েই বলতে আরম্ভ করব। যতদিন না আমার পরপারের বাণী বলা শেষ হয়, ততদিন আমার কাছে তুমি বন্দী হয়ে থাকবে। কেমন? এই কৃপাটুকু তুমি আমার ওপর করবে ত?

আমি। আজকের কথার ভাবে, কৃপা কথাটা বড় খাপছাড়া মনে হচ্ছে—নয় কি?

লীনা। জোর জবরদস্তি, অর্থাৎ আধিপত্যের ভাবটাই আজকের বৈশিষ্ট্য, এই কথা বলছ ত? একুশ বছর ধরে তোমাকে দিয়ে কত দুষ্কর অঘটন যে—

আমি। সেত বন্ধুত্বের ওয়েল উইসিং। যে চিঠির দ্বারা আমায় সেই বন্ধুত্বে বরণ ক'রেছিলে তা এখনও সযত্নে—

লীনা। সেত এক তরফা বন্ধুত্ব।

আমি। এখন কি তবে দোতরফা করবে নাকি?

লীনা। যদি বরণ—না থাক্, হোটেলে এসে পড়েছি যে!

হোটেলে গিয়ে সুবিধামত ঘরদুটো দেখে নিলাম। দু বছর আগে নানা দেশের হোটেলে দু'জনে দুটো পৃথক্ রুমে যেমন থাকতাম, এখানেও তাই হল, লীনা দেবী দুটো বিছানার একটা রুমেই থাকতে চেয়েছিলেন। আমি না বোঝবার ভাণ ক'রে, দুটো রুমই নিলাম। লীনা দেবী কিন্তু বলেছিলেন—"একটা রুমেই কি পৃথক্ দুটো রুমেব কাজ হয় না?"

১২টার সময় খেতে গেলাম; খাবার ঘবে বেশী লোক ছিল। তাই আমরা লীনাদেবীর রুমে, আমাদের খাবার দিতে ব'লেছিলাম। দেখলাম লীনা দেবীর আনন্দ উথলে উঠছে। খাবার মুখে দিতে না দিতেই লীনাদেবীর কথা সুরু হল।

লীনা। মেলবোর্ণে রাউলকে ছেড়ে আসতে প্রাণে একটু ব্যথা লাগছিল। সে জাহাজে তুলে দিয়ে গেল। ন'দিন পরে কলম্বোতে নেমে দুতিন ঘণ্টা পরে তুতিকোবিণের জন্য জাহাজে চড়লাম। তুতিকোরিণে এসে ট্রেণের একটা ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা খালি দেখে কলকাতা যাব মনে করে উঠে পড়লাম।

বহুকাল পরে দেশে ফিরে এলাম—এই ধারণা মনে বেশ তৃপ্তি দিল। এই সঙ্গে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব

বাড়ী, ঘরদোর, ঝোলভাত, সন্দেশ রসগোল্লা, পিঠে পুলি, শাড়ী সিন্দুর আদি সবই মনে ভীড় জমিয়ে দিল। গ্রীষ্মকালের বিকেল, চারিদিকের ছায়া-স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ লাগছিল, দুনিয়ার কত মনোহর বিচিত্র দৃশ্যই না দেখেছি, তার তুলনা হয় না, তবু স্বদেশ ব'লেই শুধু ভাল লাগা নয়, স্বদেশেব মোহ আমায় আচ্ছন্ন ক'রেছিল। আবার একটা ষ্টেসনে গাড়ী থামল। ফেরিওলার চেঁচামেচি শুনে দেশের খাবার কিনবার সাধ হল। তখনও সন্ধ্যের অন্ধকার খুব ঘন হয় নি।

পেস্তার বরফির মত একটা খাবার অনেকখানি কিনলাম, তার একটা কি নাম বলেছিল, ভুলে গেছি। একটু একটু ক'রে সবটাই খেয়ে ফেল্‌লাম! সেই তৃপ্তিতে ডাইনিংকারে আর গেলাম না। বিদেশী বিমুখতা সদ্য তখন জেগে উঠেছিল। শুধু এক পেয়ালা কফি আনিয়ে খেলাম, এটা স্বদেশী মোহ নয়, তাব উল্টো।

তার পর কোথায় কেমন ক'রে তোমার কাছে সশরীরে হাজির হলে 'সারপ্রাইজ'টা হবে ঠিকমত, তাই ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা বিকট শব্দ, কান

ফুটো দিয়ে ঢুকে মাথার মধ্যে জমাট বেঁধে, প্রকাণ্ড মোটা সুচ হয়ে, বাঁই বাঁই শব্দে ঘুরতে ঘুরতে বিদ্যুৎ বেগে ওপরে উঠে গেল। মনে হল ব্যাপারটা বজ্রপাত, আর যেটা বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে বেরিয়ে এল আমার শরীর থেকে প্রাণটা।

পরক্ষণেই অশরীরী আমি দেখলাম গাড়ীর ছাদের ওপর থেকে, কামরার ভেতরের সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি! গাড়ীর অস্বচ্ছ ছাদটা আমার দৃষ্টি একটুও রোধ করেনি। গাড়ীর মেজেতে আমার নির্জীব দেহটা অবিকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তার জামা কাপড় আমার দৃষ্টি রোধ করছে না। কিছু রেখে ঢেকে বলব না বলেই বলছি; অশরীরী আমি, বহুবার আয়নায় দেখা আমার শরীরটা দূর থেকে আজ নতুন করে দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে ছেড়ে যেতে মায়া করছিল। এই শরীরটার সঙ্গে 'আমার' কথাটার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল ব'লেই হয়ত এত ভাল লেগেছিল। সুন্দর কিছুব সঙ্গে 'আমার' এই কথাটার একটু সম্বন্ধ থাকলেই সে সৌন্দর্য্য এনে দেয় মাধুর্য্যের গর্ব্ব; আর 'আমার' কথাটার সম্বন্ধ না থাকলে, তা মনে জাগায় আপশোষ। তাও তখন ভেবেছি। তবুও বলছি—এ আমার প্রকৃত সৌন্দর্য্যের মায়া।

দেহটা ছেড়ে যাওয়াব জন্য ওপব থেকে একটা অদম্য টান অনুভব কবছিলাম। যদিও আমাব স্বর্গে তেমন বিশ্বাস ছিল না, তবুও বহু জন্মের অর্জিত 'ইনস্টিংট্'বশতঃ স্বর্গ না হলেও, মৃত্যুর পব উন্নততর অবস্থার আশা যে নির্জ্জান মনে (বেহুঁসে) ছিল না তা বলতে পারিনা। মৃত্যুব পর মৃতদেহ ছেড়ে আমি যখন বযেছি, তখন মৃত্যুর পর কিছুই নাই বলি কি করে! 'সাইকিক্যাল রিসার্চ্চ সোসাইটির' ভুরি ভুরি প্রত্যক্ষ প্রমাণেব মধ্যে, আর মিসমেবিজম্, হিপ্‌নটিজম্ আদি হরেক বকম ভূতুড়ে তত্ত্বের মধ্যে বিদেহী আত্মাব বা মনের যে 'ফ্যালাসী' আছে তা জানি।

আমি বলেছিলাম, তুমি যে মায়ার্সের 'হিউম্যান পার্শোনালিটি'—

লীনা। তা আমার বিলক্ষণ মনে আছে। শেষ পর্য্যন্ত আমার কথা ত শোন; বলছি কি, হয়ত উন্নততর অবস্থাব টানেই সুন্দরকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'লাম। আজ সেই মহিমাময় অশরীরী অবস্থা থেকে ফিরে এসে এই মব শরীরের দখল নিতে হয়েছে ব'লে, আমাব তাই আপশোষের চাইতে সোয়াস্তি বোধ হচ্ছে।

আমি। শুধু কি—

লীনা। শোন শোন, তার পর আমার অশরীরী মনের গতি এমন দ্রুত হল যে ভাষাতে প্রকাশ করা যায় না। তার ওপর একটা মনমুগ্ধকর অথচ প্রচণ্ড শব্দ আমার পেছন থেকে ক্রমে আরও পেছনে মৃদু মধুর হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে সামনে আর পাশে নিয়ত রূপান্তরিত অথচ সুবিন্যস্ত সব কটি রঙ্গে রঞ্জিত যেন শত শত বিশাল পর্দ্দার মত কিছু, তীব্র বেগে ঘুর পাক খেয়ে চলল। তার চোখ-ঝল্‌সান উজ্জ্বলছটা ক্রমে মোলায়েম হতে হ'তে বিলীন হয়ে গেল। এই রকমে গন্ধ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছুর প্রচণ্ডতা ক্রমে মৃদু-মধুর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শূন্যে লীন হয়ে গেল।

তখন মনে হ'ল—এই বুঝি জ্ঞানবাদী বুদ্ধদেবের 'নির্ব্বাণ'; আর এই শব্দ-বর্ণাদির মহড়া; তা হলে স্বর্গে আমার অভ্যর্থনার জন্যই এই অলৌকিক মঙ্গলাচরণ। তা যেন হল, কিন্তু আমার নির্ব্বাণ হল কৈ? এখনও মন আর জ্ঞান ত অটুট রয়েছে, এখন যাই কোথা? এই মহাশূন্যে অন্ধকারে অনন্ত কাল থাকতে হবে? হয়ত বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিন্ন রকম স্বর্গ হতে পারে; তুমি জান, আমি রকমারি স্বর্গের কোনটাই বিশ্বাস করতে

পারিনি। কিন্তু মৃত্যুর পর নির্ব্বাণ সম্ভব হলেও হতে পারে—বলে মনে হত।

তবুও যখন মৃত্যুর পর একটা কিছুর অস্তিত্ব দেখছি, অর্থাৎ অশরীরী আমি আছি, তখন বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বান, তাও হল কৈ? বহু আত্মা ও বিদেহী মন যে আছে—তার প্রমাণ ত আমিই।

মনে হল তাঁদের কারো সঙ্গে দৈবাৎ দেখাও কি হবে না! কিন্তু তাঁরা সব কোথায়? কেমন করে তাঁদের একটীকে অন্ততঃ ধরি! মিঃ ষ্টেডের জুলিয়া, মিসেস্ বেশান্তের 'কুৎহোমিলাল', অন্য অনেকের 'মানিক' আদি আরও কত আছে। ওরা সব মোড়লী আদিতে অভ্যস্ত। মর্ত্ত্য লোকের কাছে বেশ সহজে পোষ মেনেছিল—এখন ঐরকম একটি আত্মা না ধরতে পারলে—আমার,—এই চিন্তার পরই মনেহল, যেন বেশ একটা সাড়া পাচ্ছি। আমার বিদেহীমনে আমি জিজ্ঞেস করলাম "কে আপনি?" উত্তর হল "যাকে তোমার সত্য চাই।" আমি বলেছিলাম "আমি চেয়েছিলাম এমন এক আত্মা যে, আমি যা জানতে চাইব, তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে"। উত্তর হল "আমি সেই উত্তরদাতা"।

লীনা। কি বলে ডাকব?

উত্তরদাতা। ডাকবার দরকার হবে না, কারণ আমি সব সময় তোমার কাছে আছি।

লীনা। আপনি কি একা ?

উঃ। হ্যাঁ, আমায় 'তুমি' বলবে। এখানে সুপিরিয়রিটী কম্‌প্লেক্‌স্‌ বা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের আবশ্যক হয় না।

লীনা। আচ্ছা! এখন বল আমরা কোথায় ?

উঃ। বিশ্বে।

লীনা। সবই যে শূন্য অন্ধকার!

উঃ। এখন তোমার দৈহিক ইন্দ্রিয় নাই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছু মনের দ্বারা, অর্থাৎ মানস-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, প্রত্যক্ষ করতে হবে, বিশেষ ক'রে দেখবার কাজটা। সে শক্তি স্বভাবতঃ তোমার কিছু আছে। তার ওপর ভিজুয়েলাইজ করবার শক্তি বা মেণ্টাল্ ইমেজারী অনুশীলনের চেষ্টা এক সময়ে পারিতে করেছ। তবুও বল্‌ছি চিত্রশিল্পী, মিকানিসিয়ান, বৈজ্ঞানিক, অন্ধ, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি বহু বুদ্ধিজীবী মানস ইন্দ্রিয়ে দর্শন শ্রবণ আদি শক্তির চর্চ্চা করেন। যেমন কোন দৃশ্য, ব্যক্তি-বিশেষের চেহারা, দরবার, যুদ্ধক্ষেত্রাদি একবার দেখে এসে, ঘরের কোণে বসে হুবহু এঁকে দেন চিত্রশিল্পী। সুমধুর গান বা সুর একবার শুনে এসে মানস-কানে তা শুনতে পান সঙ্গীতজ্ঞ; এবং

যখন খুসী তিনি তা শোনাতে পারেন। এই রূপে সকল শারীরিক ইন্দ্রিয়ের কাজ মানস-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ও সংযত ভাবে এখন প্রত্যক্ষ করতে পারবে। ঐ মানস শক্তি, অশরীরী অবস্থায়, অল্প চেষ্টায় অনায়াসে পূর্ণ ভাবে লাভ করতে পারবে।

আচ্ছা, দেখ! অন্ধকার ম্লান হয়ে আসছে, দিনের আলো ক্রমে বাড়ছে, নয় কি?

লীনা। পৃথিবী থেকে যেমন দেখতাম, তার চেয়ে উজ্জ্বল অসীম নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ দেখছি। দেখছিনা কেবল—পায়ের তলায় শ্যামল মাটির পৃথিবী, তার সূর্য্য, তার তাপ, আর রৌদ্র, আর সেই সঙ্গে গ্যাছে তার চাঁদ—

উঃ। মানস-ইন্দ্রিয়ের শক্তি ছাড়া আরো অনেক রকম শক্তি তুমি এখন পেয়েছ। তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে—মনের গতিশক্তি যা অবাধ, অক্লান্ত, তড়িৎ অপেক্ষা অত্যধিক ক্ষিপ্র, ইচ্ছানুগত আর অনন্ত। লীনাদেবী কথা বন্ধ ক'রে বললেন—আমাদের খেতে খুব দেরী হয়ে গেল, এখন ওঠা যাক্।

আমি। খানিক বিশ্রাম কর।

লীনা। আজকের মত করব, তুমি কি করবে? তুমিও একটু—

আমি। তোমার বাণী যতখানি ব'লেছ তা লিখে ফেলব। তুমি ঘুম থেকে উঠলে তোমাকে শোনাব। তার পর আবার যা বলবে শুনব, রাতের বেলা লিখে তার পরের দিন তোমায় আবার পড়ে শোনাব, কেমন?

লীনা। তা বেশ, ধন্যবাদ দিতে হবে? আমায় কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে জাগিয়ে দিও। কেমন, ভুল্‌বে না ত?

আমি নিজের রুমে লিখছিলাম। লীনাদেবী ঘণ্টাখানিক পরে এসে বললেন, "কেমন, এক কাপ চা না কফি"?

আমি ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম, "তুমি কি পান করবে? আর কিছু?"

লীনা। ধন্যবাদ ছাড়া, তুমি যা—

আমি। তবে তোমার প্রিয় কফি আনাও, আর কিছু ফল।

লীনাদেবী বয়কে ডেকে কফি আর ফল দিতে বলে দিলেন। আমি যা লিখেছিলাম পড়ে শোনালাম। তারপর লীনাদেবী পর-পারের কথা সুরু করলেন।

উত্তরদাতা বললেন—"এখন তুমি কি চাও বল?"

আমি। কি চাই বলতে গিয়ে একটু মুস্কিলে প'ড়লাম। আমায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় দেখে উত্তরদাতা বললেন, "মৃত আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলতে চাও না? যা অনেকে চেয়ে থাকে"—

লীনা। মেলা যায় নাকি?

উঃ। পরলোকে মৃত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার সহিত মিল্‌বার প্রবৃত্তি, অনেক জ্ঞানী-মানী লোকেরও অন্ততঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে জাগে। তাতে ভাবী মিলনের আশায় আসন্ন মৃত্যুর দুঃখ, ভয় একটু সহনীয় হয়।

লীনা। এখন ত আর মৃত্যু-যন্ত্রণার আশঙ্কা নাই। মেলা যায় কিনা পরে দেখলে হবে। এ বিশ্বের মোটা-মুটি রহস্য আগে জান্‌তে চাই।

উঃ। ঐ যে চারি দিকে ছোট বড় উজ্জ্বল বস্তুপিণ্ড, যাদের তোমরা তারা, নক্ষত্র আদি ব'ল্‌তে, তারা নানা আকারের সূর্য্য, তার গ্রহ, উপগ্রহ আদি সমেত নানা আকার প্রকারের সৌরমণ্ডল সদৃশ, অসংখ্য মণ্ডল নিয়ত শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসকল তুমি জান। এখন সোজা একদিকে তীব্র গতিতে চল, দেখা যাক্ সীমা পাই কিনা,—কি দেখছ?

লীনা। দেখছি আর ভাবছি, এ অকারণ চেষ্টা হচ্ছে,

কারণ সীমার ধারণা যে আমি মনেই আনতে পারছি না। তা হলেই বোঝ, বিশ্বসীমার কোন রকম ধারণা বা কল্পনা করা মানব-বুদ্ধির অগম্য, তাই অজ্ঞেয়।

উঃ। আমরা এখন দেখব, পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় সবরকমে সমান অথচ সম্যক্ উন্নত এমন একটি গ্রহ।

বিশ্বে কোন দুটি পদার্থ সর্ব্বতোভাবে সমান হয় না; কাজেই দুটি গ্রহও সর্ব্বতোভাবে সমান নয়। একটু আধটু তফাত থাক্‌লেও আমাদের জ্ঞানানুসন্ধানের কোন বাধা জন্মাবে না। পৃথিবীর মত প্রায় সব বিষয়ে সমান গ্রহ বহুত আছে, যার শ্রেষ্ঠজীব জ্ঞান-বিজ্ঞানে তোমাদের পার্থিব মানুষ অপেক্ষা বহুদূর এগিয়েছে। অথবা অধঃপাতে গিয়ে দ্বিপাদ শয়তানে পরিণত হয়েছে। এরকম গ্রহ আমরা অনেক অতিক্রম করে এসেছি, লক্ষ্য করেছ কি?

লীনা। আমাদের গতিবেগ এত দ্রুত, আর এত অধিক গ্রহ অতিক্রম করে চ'লেছি যে, ঠিক মত দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখন আমাদের পৃথিবীর মত প্রায় সর্ব্ব-বিষয়ে সমান, এমন কোন গ্রহে চল।

উঃ। তার আগে আরও কিছু বলে রাখা আবশ্যক মনে ক'রছি। মানুষের মত জীবের উন্নতি-অবনতির—

কার্য্য-কারণ বিষয়ে তুমি সত্য জানতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র, আমি ত জানি তুমি একুশ বছর—

লীনা। তুমি জান? একুশ বছর—

উঃ। হাঁগো, হাঁ, তা আর জানি না!

লীনা। অর্থাৎ?

উঃ। যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহের পূর্ব্বে সমাজের অন্যায়-অত্যাচার তোমার মর্ম্ম স্পর্শ করেছিল। অনেক চেষ্টার পর, এক অতি সহৃদয় বরের সঙ্গে তোমার আত্মীয়েরা তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির ক'রেছিলেন। তুমি নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে, তোমার হৃদয় যে অন্যের অধিকৃত তা বরকে—

লীনা। ব্যস্, যা বলছিলে বল, ওসবে কাজ কি? আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাও নাকি?

উঃ। এখানে তার আবশ্যক নাই। তোমার সব কিছু যে আমি জানি। তুমি প্রথমে কি দেখতে চাও, তা আমি জানি বলেই, বলে ফেলাতে, তোমার সন্দেহ জেগেছিল, আমি তোমার গুপ্ত প্রেমের কথা জানি। জান্‌লে এখন তোমার দুঃখ কিসের। একুশ বছর ধ'রে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে আর সমাজে অক্লান্ত নিষ্ঠার সহিত, যে সত্য অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছিলে তাতে তোমার মন তৃপ্ত হয়নি।

এখানে সেই সমস্যা-সমাধানের জন্য তাই তুমি বিশেষ কিছু সত্য দেখতে ও জানতে চাও, নয় কি?

লীনা। তা যেন সত্য। তবু একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে—আচ্ছা, 'ফ্যালাসী' বা যুক্তি-তর্কের—ফাঁকি ব'লে একটা ব্যাপার কি নাই?

উঃ। আছে বই কি! 'ফ্যালাসী' সত্য উপলব্ধি বা সত্য নির্ণয়ের বিশেষ অন্তরায়।

ফ্যালাসী বা ফাঁকি সাধারণতঃ দু' রকমের, জ্ঞানকৃত আব অজ্ঞানকৃত। আমার যুক্তির মধ্যে অজ্ঞানকৃত 'ফ্যালাসী' থাকতে পারে। কোন মানুষেব মন সর্ব্ববিধ বিষয়ে পূর্ণ সত্য বা পূর্ণ জ্ঞান উপলব্ধি করেছে এ ধারণা করা ঠিক নয়, যে হেতু সত্য জ্ঞানের সীমা নাই। ফলতঃ আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক, ক্রম-বিকাশমান বা ক্রমবর্দ্ধনশীল; কোথায় এর শেষ তা ধারণাতীত, কিন্তু পার্থিব মানুষ তবু বিশেষ কোন কোন মানুষকে চরম জ্ঞানের আধার ব'লে ভক্তি করে; আবার ভক্তির দায়ে সেই বিশেষ মানুষগুলি নিজদিগকে সব কিছু পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ব'লে জারী করে। তারাই জ্ঞানকৃত আর অজ্ঞানকৃত, উভয় 'ফ্যালাসী'তে সিদ্ধ। তারাই

মানুষের ছদ্মবেশী শত্রু। পৃথিবীর মত কোন গ্রহের শ্রেষ্ঠজীব, যারা পার্থিব মানুষ অপেক্ষা উন্নততর জ্ঞানের অধিকারী, তাদের জ্ঞানেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে যাচাই ক'রে, আমার কথাব ফাঁকি থাকলে সহজে ধরতে পাববে। যদি পার তবে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তোমায় ধন্যবাদ দেব।

লীনা। মনে মনে চটবে না ত ?

উঃ। নিশ্চয় না। আমি ভদ্র, তার মানে আমি যুক্তি-বিলাসী। যুক্তিটা অবিশ্যি সুযুক্তি।

লীনা। আর তর্ক করব না, এখন যা বলতে চেয়েছিলে বল।

উঃ। তর্কের জন্য তর্ক না ক'রে, জ্ঞানের খোঁজে তর্ক অবশ্য কর্ত্তব্য, যাই হ'ক, বিশ্বজ্ঞানের কথা বলবার আগে, দুএকটা বিষয়ে তোমাকে অনুরোধ করব, তার মানে তোমাকে সাবধান ক'রে দেব।

'আমার' পৃথিবী 'আমার' দেশ 'আমাদের' সভ্যতা, 'আমাদের' ধর্ম্ম, 'আমাদের' সত্য ; এই 'আমি', 'আমার', 'আমাদের' জ্ঞানটা একেবারে ভুলে যেতে হবে। তুমি এখন মনোময় ; তোমার সঙ্গে তোমার শরীরের সম্বন্ধ, অর্থাৎ তোমার শরীর বা জীবন রক্ষার জন্য তোমার দেশের, সমাজের, সভ্যতার, ধর্ম্মের আর তোমাদের স্বার্থ-সর্ব্বস্ব সত্যের সাহিত এখন এখানে এই অশরীরী তোমার

আর কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এখন তুমি বিশ্বের, আর বিশ্ব এখন তোমার। 'আমি' 'আমার' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নিজেকে জাহির করবার উপায় এখানে যে কাজেই তার নাই! দরকারও নাই। তাই ওটা এখন ত্যাগ করতে বা ভুলে যেতে কোন বাধা নাই।

লীনা। পূর্ব্ব স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না যে?

উঃ। আমি তা বলছি না ত। নিজের আশৈশব-পোষিত প্রিয় ধারণা, ধ্রুব সত্য ব'লে ভক্তিভরে বা অন্ধভাবে বিশ্বাস অল্পাধিক প্রায় সকলে ক'রে থাকে। এই বিশ্বাসই সত্যদর্শনের পরিপন্থী। এই বিশ্বাসই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের অন্তরায়।

তোমার বিবাহ সম্বন্ধেই ভেবে দেখ, তোমার আত্মীয়-স্বজনের ও সমাজের স্বার্থের কাছে, স্বজাতে বিবাহই সত্য। অপর পক্ষে অন্য জাতের ব্যক্তি-বিশেষকে তোমার এত ভাল লেগেছিল যে, অন্য জাতে বিয়ে করাই তোমার স্বার্থের কাছে সত্য। তোমার সমাজ ও আত্মীয়েরা বলেন, বিজাতে বিয়ে করা অন্যায়, পাপ, অধর্ম্ম আর সমাজদ্রোহিতা; এ তাঁদের আশৈশব-পোষিত দৃঢ় ধারণা। তোমার যুক্তিসিদ্ধ ভালমন্দ জ্ঞান বলে, সমাজ আর ধর্ম্মের বিধানকর্ত্তারা স্বজাত বেজাতের যে কোন সুন্দরী

বা তরুণীকে নিজেরা নির্ব্বিচারে কিছু করলে কোন দোষ হয় না। নারী খালি স্বজাতে বে' না করলে সমাজদ্রোহিতা পাপে পতিতা হয়, এর কোন্‌টা সত্য সে বিচার এখানে করছি না; তোমায় দেখাতে চাই পার্থিব সত্যের মূল্য কতটুকু! তাই স্বার্থজনিত সত্য-মিথ্যার সমস্যা সমাধানই তোমার একুশ বছরব্যাপী অনুসন্ধানের বিষয় ছিল। এখানে বৈজ্ঞানিকভাবে সে অনুসন্ধান সুরু করতে হলে নিরপেক্ষ হতে হবে।

অন্যের ধারণার সত্যমিথ্যা খোঁজবার আগে, নিজের সমস্ত ধারণা সত্যমিথ্যার কষ্টিপাথরে কষতে হবে। এই কষ্টিপাথর হচ্ছে—চিন্তা, মনন, যুক্তিতর্কের বিচার দ্বারা সত্যানুসন্ধান, তা যত নিরপেক্ষ হবে, বিচারের ফলও ততোধিক বিশ্বজনীন হবে। পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া মানুষের পক্ষে—

লীনা। পৃথিবীতে কি কেউ পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্য—

উঃ। কতকটা পেয়েছে বই কি, নইলে এত বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে কি ক'রে। আমি বলছি কি—আশৈশব অভ্যস্ত প্রিয় সংস্কারগুলি (যা ধ্রুব সত্য ব'লে ঘরে বাইরে সর্ব্বসাধারণ 'বিশ্বাস' করে তা) মনে এত বদ্ধমূল যে তা জাগ্রত চেতনা হতে অবচেতন মনে অসাড়ে ইন্‌স্টিংটে পরিণত হয়ে

জীবনের সঙ্গে পাতিয়েছে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই সকল সংস্কারকে কেউ মিথ্যা বলে জাহির করলে তার গ্যালিলিও প্রভৃতি বহু সত্যব্রতের দশা ঘটে। এখনও দেখ, লোকে বলে "সূর্য্য উদয়" "সূর্য্য অস্ত"। সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করে, এই ভুল ধারণা লোকের অজ্ঞান মনে 'ইন্‌ষ্টিংটে' পরিণত হয়েছে। একেই বলে সংস্কার।

তুমি এখন অশরীরী; তোমার 'সু' বা 'কু' সংস্কার, অর্থাৎ শিশুকাল হতে যে সকল ধারণা মনে বদ্ধমূল, এখন তা মিথ্যা ব'লে ধ'রে নিলে এখানে তোমার সমাজ তোমাকে 'একঘরে' করবে না, কিম্বা কেউ মারবে না ধরবে না, বা তোমার নিন্দারও ভয় নাই।

আর এক কথা, স্বতঃসিদ্ধ বা সর্ব্বজন-স্বীকার্য্য নিত্যপ্রত্যক্ষ সত্য ছাড়া অন্য যে সকল সত্য যুক্তি তর্কের দ্বারা বিচার্য্য অথবা স্বীকার্য্য তা দেশকাল পাত্র ভেদে নানা প্রকার হয়। এই রকম সত্যকে 'টেম্পারামেণ্টাল্' বা মেজাজী অথবা খেয়ালী সত্য বলা যেতে পারে। প্রতিপাদ্য সত্যের এমন কিছু 'ষ্ট্যানডার্ড' পৃথিবীতে নাই যা নাকি বিশ্বজন স্বীকার্য্য সত্য বলা যেতে পারে।

একটা কথা মনে রেখো, Universe,

University আর বিশ্ব, বিশ্বমানব, বিশ্ববিত্থালয় আদির Universe বা বিশ্ব বলতে সমস্ত পৃথিবীকেও বোঝায় না। আরও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। .বিশ্ব বা Universe অসীম অনন্ত 'স্পেস্' বা স্থান জুড়ে যা কিছু। এ বিষয় পরে প্রত্যক্ষ করাব।

এই বিশ্বের ভাল মন্দ জ্ঞান অর্থাৎ সার্ব্বজনীন বিশ্ব জ্ঞান দ্বারা তোমার পৃথিবীর, দেশের, সমাজের, জাতির, বা ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কিছু, যা তুমি ধ্রুব সত্য বলে সগর্ব্বে জেনে রেখেছ, তা যদি এখানে অসত্য বলে তোমার কাছে প্রমাণিত হয় তবে তোমার মন এমন বিষিয়ে উঠবে যে, তখন সত্যানুসন্ধান তোমার পক্ষে কষ্টদায়ক হবেই। তোমার পার্থিব মন এখন অশরীরী হয়েও একদেশদর্শী সংকীর্ণ হয়েই এখানে থাকবে। কোন সত্যই গ্রহণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন তোমাদের স্বার্থপ্রণোদিত শৈশবের সযত্ন-পালিত সংস্কার অর্থাৎ বিশ্বাসকেই পরম সত্য ব'লে জাহির ক'রে বৃথা গৌরবে গৌরবান্বিত হতে একটুও লজ্জা বোধ করবে না। তাই বলছি তোমার পূর্ব্বের যে-কোন ধারণা সম্বন্ধে তোমার মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার রাখতে হবে। তার মানে পূর্ব্ব ধারণার সত্যাসত্য

নিয়ে কোন রকম তর্ক করবে না, অথবা তুলনা-মূলক প্রশ্ন উত্থাপন করবে না।

দ্বিতীয়ত তুমি 'জুলিয়া' 'কুতহোমিলাল' প্রভৃতি মৃতাত্মাদের পৃথিবীতে গিয়ে বিশেষ কোন ব্যক্তির স্কন্ধে চেপে মোড়লী করবার কথা বলেছিলে না ?

লীনা। না, তখন আমি বলেছিলাম শুধু—

উঃ। হয়ত কোন দিন তোমার ঐ রকম মোড়লী করবার প্রবৃত্তি গজিয়ে উঠতে পারে, তখন ? যার ঘাড়ে তুমি চাপবে, সে যদি তোমার শুভেচ্ছা জনিত তোমার বিশ্বজ্ঞানের বাণী প্রচারের চেষ্টা করে, তবে সে বেচারীর দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না। তাছাড়া আরও অনেক রকম বিড়ম্বনা ভোগও করতে হবে। অধিকন্তু তোমার এত সাধ্য সাধনার সত্যানু-সন্ধানের ফল বৃথা নষ্ট হবে, তাই তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আমরা অতঃপর পৃথিবীর কোন কিছুর নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত করব না।

লীনা। আচ্ছা তাই হবে, এখন কৃপা করে দেখাও।

উঃ। এখন ঐ প্রকার গ্রহের উৎপত্তি অথবা কোন সদৃশ গ্রহে মানবজাতির উৎপত্তি থেকে দেখতে শুরু করবে, না পার্থিব মানব অপেক্ষা অন্য কোন সদৃশ গ্রহে মানব-জাতির প্রকৃষ্টতর উন্নতির অবস্থা দেখতে চাও ?

লীনা। আগে কোন মানবজাতির চরম উন্নতি দেখতে চাই।

উঃ। আমার মনে হয়, চরম উন্নতির কার্য্য-কারণ-জনিত বিসদৃশ অবস্থাকে সত্য-শিব-সুন্দর ব'লে ধারণা করা তোমার সংস্কারাবদ্ধ মনের পক্ষে এখন সম্ভব নাও হতে পারে। সত্যের নগ্নরূপে তুমি এখনও অভ্যস্ত নও। মিথ্যাপ্রবণতা, তোমাদের বহু-পুরুষ অর্জিত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। যেখানে সবই সত্য, মিথ্যা বা মিথ্যা সংস্কারের লেশ মাত্র নাই, সেখানকার সব কিছু অতীব বিসদৃশ বা বিকট বোধ হবে। তাছাড়া এ অনন্ত অসীমের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত বেছে নেওয়া অসম্ভব। সব বলতে অসীমই বুঝায়। আগেই ত বলেছি বিশ্ব অসীম।

লীনা। আচ্ছা, যার কার্য্য কারণ সহজে ধারণা করতে পারি এমন একটি উন্নততর সদৃশ গ্রহ দেখাও।

উঃ। পৃথিবীর অবস্থার সহিত সকল রকমে প্রায় সমান, কেবল মানবজাতির অবস্থা সম্যক উন্নত—এরকম একটা গ্রহ এখন দেখাব। মানবজাতির অবস্থা বা ব্যবস্থা ছাড়া প্রায় সকল রকমে পৃথিবীর সমান গ্রহগুলির প্রত্যেকটিকে আমরা "সদৃশ গ্রহ" ব'লে অতঃপর উল্লেখ করব।

উন্নততর সদৃশ গ্রহ

দূরে থেকে ঐ গ্রহটাতে তোমার মনঃসংযোগ কর। দেখ, পাঁচটা মহাদেশ আর একটা মহাদেশের মতই মহাদ্বীপ। গ্রহটার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ ঢেকেছে পাঁচটা মহাসাগর।

লীনা। তাইত! সদৃশ গ্রহই বটে।

উঃ। ঐ দেখ, বরফে ঢাকা উত্তর আর দক্ষিণ মেরু অঞ্চল সাদা ধপ ধপ করছে। এদিকে তুষার-ধবল উত্তুঙ্গ পর্ব্বত সকল, ওদিকে শ্যামল তৃণ আভরণে ঢাকা বিরাট প্রান্তর সকল। বালি আর কাঁকর বিছান কত বিস্তীর্ণ মরু প্রদেশ, আর কত শত নিবিড় বিশাল জঙ্গল, সমস্ত ভূভাগে ছড়িয়ে রয়েছে। তার মাঝে মাঝে সুবিন্যস্ত শ্যামল সুষমা-মণ্ডিত ছোটবড় অসংখ্য সহর, ছোটবড় কত লক্ষ লক্ষ লোকালয় ও মানুষের গড়া আরও কত কি! আরও নিকটে চল,—কেমন দেখ্‌ছ?

লীনা। দেখে মনে হচ্ছে, যেন পূর্ব্ব-পরিচিত সুবৃহৎ রঙ্গিন রিলিফ্‌ মানচিত্র। তার জলে স্থলে সর্ব্বত্রই যেন আমার পরিচিত বহু স্থান দেখতে পাচ্ছি। আধখানা গ্রহ রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা হলেও, মানস-চোখে গ্রহটির সব যেন দেখতে পাচ্ছি।

যে স্থানটা অন্ধকার সেখানে জলে স্থলে চোখ-জুড়ানো অত উজ্জ্বল আলো কিসের ?

উঃ। এই গ্রহের সর্ব্বত্র আবশ্যক মত রেডিয়াম আদি বহু প্রকারের নতুন আবিষ্কৃত তেজী আলো নিয়ত আপনা থেকে জ্বলছে, জ্বালাতেও হয় না, নেবাতেও হয় না। আর তা জ্বালিয়ে রাখতে খরচও কিছু নাই।

গত এক'শ বছরে কত অদ্ভুত আবিষ্কারই না হয়েছে! তুমি খুব বেশী এক'শটা মৌলিক বস্তুর কথা শুনেছ, এখানে এখন প্রায় পাঁচ শ'র ওপর মৌলিক বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং নিয়ত হচ্ছে। তাতে করে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সত্য আর তথ্য, নতুন নতুন খাদ্য, যন্ত্রাদি আর ঔষধ, শিল্পের উদ্ভাবন সম্ভব হচ্ছে।

লীনা। গ্রহের অন্ধকার ভাগটা, দূর হতে মনে হ'চ্ছে যেন নক্ষত্র-খচিত অপরূপ এক আকাশ-মণ্ডল। নক্ষত্রের আলো কিন্তু এত মনোহর হয় না। এদিকে দিবালোকে আলোকিত অংশটা যেন একটা অতীব বিশাল পার্ক। একটু অপেক্ষা কর, আমি প্রাণভরে একবার দেখে নি। এমন একটাও স্থান খুঁজে পাচ্ছি না, যে দিকে তাকালে প্রাণ জুড়োয় না। যেরকম দেখছি তাতে মনে হচ্ছে,

এই গ্রহের এমন কোন স্থান নাই যা মানুষের অজানিত, অগম্য, বা যা মানুষের সুনিপুণ হস্ত স্পর্শ করে নি। সবটাই মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে।

উঃ। তুমি বরং বল, কাজে লাগান হয়েছে। আর ক্রমে কাজ বেড়েই চলেছে। মানুষের তত ভীষণতা, বীভৎসতা, কুৎসিতাচরণ আদি কোথাও দেখতে পাচ্ছ কি ?

ঐ মরুভূমিটার নিকটে চল। দূর হতে বিকট, রুক্ষ, জনশূন্য, অতি ভীষণ বলেই তোমাব মনে হয়েছিল। কয়েক বছর আগে সত্যই তাই ছিল। এখন দেখ, এর সর্ব্বত্রই, কত রকমে করছে মানবের কীর্ত্তি ঘোষণা। তারপর দেখ, এর একধার হতে অন্যধার পর্য্যন্ত কত রেল রাস্তা, মোটার রাস্তা, কেনেল আদি; তার মাঝে মাঝে নানাপ্রকার তেল, কয়লা, পারা, গন্ধক, প্লাটিনাম আদি বহুবিধ নতুন নতুন নামের খনিজাত দ্রব্যের উত্তোলন-কারখানা। তার ভিতর-বাহির চারিদিকে নানাবিধ ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষ-লতাগুল্ম আদির প্রাচীর বা উঁচু বেড়া, উত্তপ্ত উড়ন্ত বালুঝড়ের গতি রোধ করেছে ; তার সুশীতল ছায়ায় শত শত কর্ম্মী আর পথিককে আরাম দিচ্ছে। পথের পাশে স্থানে স্থানে মোটা

মোটা নলকূপ, তার পাশে স্নানাগার আর খেজুর ডুমুর প্রভৃতি মরু-সুলভ সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ-লতা-গুল্মপরিবেষ্টিত প্রশস্ত বিশ্রামাগার। তার মাঝের ঘরগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ত ঠাণ্ডা করে রাখা হয়েছে। সেখানে অটোমেটিক্ রেস্তঁরায় পানীয়, মিষ্টান্ন আদি তাজা সুখাদ্য সামগ্রী বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরম অথবা ঠাণ্ডা করে রাখা হয়েছে এমন ভাবে যে, বোতাম টিপলেই আবশ্যক খাদ্য বা পানীয় বেরিয়ে আসে। কোন কোন বিশ্রামাগারে ব্রডকাষ্টইং, খবরের কাগজ, টেলিফোন আদির ব্যবস্থা আছে। বিমানপোত, মোটার, লরি, বাস প্রভৃতির যাত্রী ওখানে বিশ্রাম করছে।

ঐ রকম দুপাশে ঘন হরিৎ প্রাচীরে ঘেরা রেল লাইন, তার ষ্টেশন, রেস্তরাঁ, বিশ্রামাগার আদি আছে; তাতেও টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ব্রডকাষ্টইং, খবরের কাগজ প্রভৃতি মানুষের সাময়িক আবশ্যকে লাগে যত কিছু সবই সুন্দর ভাবে রয়েছে। নিকটেই অসমিয়াম, ট্যাণ্টানাম, টাংষ্টেন প্রভৃতি খনিজ পদার্থ তোলবার বিরাট কারখানা সকল রয়েছে। তাতে বহুপ্রকার বিজ্ঞানবিদ আর শত শত কর্মী দিন রাত কাজ করছে। প্রত্যেককে চার ঘণ্টার অধিক কাজ করতে হয় না।

কর্মী বদলের জন্য এরোপ্লেন যাতায়াত করছে। যারা এখানে থাকে তাদের দিনের বেলা বাসের জন্য মাটির নীচে বিশ্রামাগার আছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কারখানার মধ্যে আর বিশ্রামাগার আদিতে ৮০° ডিগ্রি থেকে ৮৬° ডিগ্রির মধ্যেই তাপ রক্ষা করা হয়।

আর আছে সুবৃহৎ ওয়াটার ওয়ার্কস্ যাতে প্রকাণ্ড যন্ত্রচালিত টিউবওয়েল থেকে নিয়ত ঠাণ্ডা জল নানা দিকে সরবরাহ করা হচ্ছে। উঁচু প্রাচীর ঘেরা ঐ সকল কারখানার ভিতরে বাহিরে ফল, ফুল, লতা, গুল্ম আদি সজীব বাগানে এবং পার্কে দিনের বেলা অনবরত ফোয়ারার সাহায্যে জল দেওয়া হচ্ছে। দূরের নদী ও হ্রদ হতে কাটা, প্রশস্ত ক্যানাল বা খাল আর তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে প্রবাহিত জলে, এই সমস্ত মরুর স্থানে স্থানে কারখানাগুলির চারি দিকে বহুবিস্তৃত জমিতে উপরের বালি সরিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রয়োজনীয় নানা প্রকার শস্য, ফল, মুল আদির চাষ হচ্ছে। স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর লু'র প্রতাপ অনেক কমান হয়েছে। এক প্রকার বিমানযান হতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে স্থানে স্থানে বৃষ্টির পশলা নামান হচ্ছে। এইরূপে ঝড়ের বেগও কমান

হয়েছে। বিমান-পোতে এসে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারী মরুর যেখানে সেখানে নানাপ্রকার খনিজ পদার্থের, ভূতত্ত্বের, আরও কত কি তত্ত্বের অনুসন্ধানে রত।

ওদিকে চল, দেখ, ঘাসে ঢাকা সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরগুলি যা দূর হতে জনহীন মনে হয়েছিল, এখন অপেক্ষাকৃত নিকটে এসে দেখ। আগে মরুভূমিগুলিতে যা দেখলে এখানেও প্রায় তাই, তবে অপেক্ষাকৃত জনবহুল, আর ছোট বড় অনেক যান্ত্রিক কৃষি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে একএকটা ছোট সহর গড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার আবহাওয়া খুব আরামদায়ক করা হয়েছে।

এই প্রান্তরে নানা রকম গৃহপালিত পশুর উন্নতির জন্য কিরকম বিরাট পশুশালা, দেখ। তাদের খাবার ঘাস, দানা, সব্জি, গুল্ম আদি ঐখানেই জন্মান হচ্ছে। আরও এগিয়ে চল—

লীনা। ওদিকে পশুশালাতে ওগুলো কি?

উঃ। ওগুলো শুওর। হাতীর বাচ্চা বলে মনে করে ছিলে ত?

লীনা। ঠিক তা মনে না হলেও শুওর ব'লে মনে করতে পারি নি। হঠাৎ ওপর থেকে মনে হয়েছিল যেন

ক্ষুদে বেলুমগুলো জমির ওপর শুয়ে শুয়ে বুকে হাঁটছে। সব রকম গৃহপালিত পশু কম বেশী এত বড় আর পুষ্ট হয়েছে যে আমার পক্ষে চেনা মুস্কিল।

উঃ। ঐ দেখ ওখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাইগুলি প্রায় ত্রিশ চল্লিশ সের দুধ দেয়। তা ছাড়া, ছাগল, মেষ, মহিষ, উট প্রভৃতি অনেক জন্তুর দুধ সংগ্রহ করা হয়। দোহার যন্ত্র দেখ্‌ছ?

লীনা। গাই দোহার যন্ত্র দেখে একটুও আশ্চর্য্য হতে পারিনি। বুঝতেই পেরেছি যে, মানুষের হাতে কাজ করতে একটুও কষ্ট বা বিরক্তি হয় অথবা সময় লাগে, এমন সব কাজের জন্যই যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্য প্রান্তরেও ত পশুশালা আছে সেখানেও ত দোহা হয়। এত দুধ খায় কে? যায়ই বা কোথায়?

উঃ। বাছুর যা'তে সুপুষ্ট হয়, সে জন্য বাঁটে যথেষ্ট দুধ রেখে দেওয়া হয়। সমগ্র গ্রহের যেখানে যত দুধ দরকার সেইখানে বিমানপোতে, তত দুধ পাঠান হয়। তা থেকে মাখন, মিষ্টান্ন, পনির, চিনি, কেসিন্‌ প্রভৃতি মানুষের বহুপ্রকারের খাদ্য মানুষের ব্যবহারী বহুপ্রকারের শিল্পদ্রব্য আর ঔষধ তৈয়ী হয়। এটা লক্ষ্য করবে—মানুষের

আবশ্যকের একটু বেশী কোন জিনিষ এই গ্রহে প্রস্তুত বা উৎপন্ন করা হয় না। এ ছাড়া গাছ আর ফল থেকেও দুধ সংগ্রহ করা হয়। মানুষ যত কিছু খায়, তার প্রায় সিকি ভাগেরও বেশী দুধ থেকে তৈরী।

লীনা। পশুশালার মধ্যে যে বড় বড় বাড়ী, কল কারখানা আদি দেখ্‌লাম তার ভিতরে বাইরে ফল ফুলের গাছ আর লতাগুল্মে সুন্দররূপে সাজান, ওগুলো কি ? দেখা যায় না ?

উঃ। ওসবের কতক দুধ আর দুগ্ধবতী পশু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, পশু চিকিৎসালয়, শিল্পে লাগে এমন বহুদ্রব্য তৈরীর পরীক্ষাগার, দুধ ও দুধ থেকে তৈরী খাদ্য বিশুদ্ধি করণ বা 'ষ্টেরিলাইজ' করবার কারখানা, প্যাক করবার আর পাঠাবার জন্য পাত্র আদি জীবানুশূন্য করবার বৃহৎ বৃহৎ কারখানা,—আরও কত কি ! কারখানার ভিতরে গিয়ে দেখ, কি বিরাট ব্যাপার ! কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কত আরামদায়ক ! আচ্ছা ! এখন ঐ বরফে ঢাকা দেশ দেখিগে চল।

লীনা। বাঃ ! এ যে সব সদার দেশ, কি চমৎকার ! এখানেও ছোট বড় অনেক সহর, তার এরোড্রোম, হরেক রকম কল, কারখানা, বিশ্রামাগার সবই

সাদা রং দেয়া—মানুষও সাদা, কিন্তু পোষাক ত সাদা নয়! তবু কৃত্রিম উপায়ে অনেক রকম গাছ সহরে লাগান হয়েছে। খনিজ বস্তু তোলবার অনেক কারখানা দেখ্ছি।

উঃ। ওপর দিকে চেয়ে দেখ, মালবাহী, যাত্রীবাহী আবহাওয়া গবেষণাকারী, নানারকম মেরুতত্ত্ব সন্ধানকারীদের ছোট বড়, অনেক রকম বিমান-পোত নিয়ত যাতায়াত করছে। সহরের জোট বড় ঘরগুলির দেয়া'ল লোহার ডবল পাত দিয়ে তৈরী। দু'টী পাতের মাঝখানটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ু-শূন্য করে রাখা হয়েছে। বহুদূর থেকে সুরঙ্গ দিয়ে ঢোকার পথ তা'তে আছে। ঘরের মধ্যে বায়ু সঞ্চালনের সুব্যবস্থা আছে। ঘরগুলি তাই আরামদায়ক।

লীনা। আচ্ছা বলত, এখানকার আদিম নিবাসীরা কোথায়?

উঃ। এখানকার আদিম নিবাসীরা নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের লোকের সম্মিলনে শিক্ষা দীক্ষায় এমন উন্নত হয়েছে যে, এখন দেখে মনে হয় না—তারা এককালে অসভ্য ছিল। তারা সর্ব্ববিষয়ে গ্রহের অন্য লোকের সমান। দক্ষিণ মেরু মণ্ডলে দেখ—আদিম মানুষ খুবই কম। এই গ্রহের

অন্য লোকের মতই এদেরও সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত ও উন্নত করা হয়েছে। কিন্তু এদের কর্মশক্তি অনেক বেশী।

এই রকম গ্রহের উন্নতি বা অবনতি ঐ গ্রহের বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের 'সু' বা 'কু' ইচ্ছা আর প্রয়াস প্রণোদিত বুদ্ধির জোরে হয়েছে। কখনও কখনও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে উন্নতি বা অধঃপতনের পথ উন্মুখ হয়েছে ও হচ্ছে। আবার নতুন ক'রে, ধ্বংসাবশিষ্ট মানুষের, বিশেষ ব্যক্তিদের দ্বারা ভাগ্য 'সু' বা 'কু' পথে চালিত হচ্ছে।

আবার অনেক স্থলে গ্রহ সহ সূর্য্যমণ্ডল ধ্বংস হয়ে নীহারিকাতে পরিণত হচ্ছে। ইচ্ছা করলে এ সমস্তই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। উন্নতি অবনতির কারণও তখনি উৎপন্ন হয়েছে যখন গ্রহটী তার সূর্য্যের কোল ছাড়িয়ে গ্রহরূপ নিয়েছে; অথবা এও বলা যেতে পারে, যখন গ্রহটীতে পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর প্রভাব জনিত প্রবৃত্তি নিয়ে প্রাথমিক মানুষ জন্মেছে।

পরে আমরা অন্য সদৃশ গ্রহ যখন দেখব, তখন তোমাকে এ'র কার্য্য কারণ তাৎপর্য্য দেখাব। এখন এই গ্রহে আমরা উন্নততর

মানুষের সমাজ দেখব। তুমি আগে কি দেখতে চাও, বড় সহর না গ্রাম? বলে রাখি গ্রাম বলতে যা বোঝাত তা আর এখানে দেখতে পাবে না; সবই সহরে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সব গ্রাম সহরের প্রায় সকল সুবিধা পেয়েছে। যে সকল গ্রাম সহরে পরিণত হয়েছে, এরূপ এক একটি ছোট সহরে কম সে কম পাঁচ হাজার লোকের বাস। আর চারটী সহর বাদে পনের লক্ষের বেশী লোক কোন সহরে বাস করে না। উক্ত চারটী সহরের প্রত্যেকটীতে লোক সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ।

এই গ্রহের সমস্ত অধিবাসীর সংখ্যা মোট প্রায় চারশ' কোটী। স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান; শিল্প প্রতিষ্ঠান, খনি আদির কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী নিয়ে ছোট বড় যে একএকটা কলোনী (পূর্ব্বে যে স্থান জনশূন্য ছিল সেখানে) গড়ে উঠেছে; তার লোক সংখ্যা পাঁচশ' হ'তে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত। সর্ব্ব সমেত সহরের সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ।

লীনা প্রথমে একটি দশ হাজারের সহর দেখলে কেমন হয়।

উঃ। এই দেখ দশ হাজার অধিবাসীর একটি ছোট্ট সহর। এ'র মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড লেক্। তার মাঝখানে একটী বেশ বড় দ্বীপ; তা'তে ফল-ফুলের বাগানে ঘেরা উঁচু কয়েকটী বাড়ী। চারিদিক হ'তে মোটর, ওম্নিবাস, মোটর-বোট, চেনবোট আরও অনেক প্রকারে লোক সমাগম নিয়ত লেগে আছে। লেকের চারিদিকের সমতল উঁচু পাড়ে লোকালয়। ইলেক্‌ট্রিক রেল ষ্টেশন ও এরোড্রোম, কন্‌ক্রিটের প্রসস্ত ফুট্‌পাত সহ রাস্তা, শিক্ষা-ভবন, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা, মিল্‌স্‌, কৃষি বিদ্যালয়, মিউজিয়াম, জিম্‌নেসিয়াম, অনেক প্রকার বিজ্ঞানাগার, ল্যাবরেটারী, হাসপাতাল, কৃষিশিক্ষা-ক্ষেত্র, ইত্যাদি। আর আছে বহু প্রকার স্থানীয় আর বহুদূর হতে আনীত ফল ও ফুলের বাগান, ক্যানিংএর কারখানা। এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফলের যেমন ওজন বাড়ান হয়েছে, তেমনি সুগন্ধ, সুস্বাদু আর অম্লহীন করা হয়েছে। আবার দু'তিন রকম ফলের মিলনে নতুন রকম সুমিষ্ট ও সুন্দর ফল উৎপন্ন করা হচ্ছে। আরও কত কি।

এ দিকে সমবায় সমিতি আর স্থানে স্থানে কমিসারিয়েট, অটোমেটিক রেস্তোর্‌াঁ, রেষ্ট-হাউস বা আগন্তুকদের জন্য বিশ্রামাগার সিনেমা, থিয়েটার, টাউনহল, লাইব্রেরী, ব্যাঙ্ক, ক্লাব ইত্যাদি। বাকী সব নাগরিকদের বাসের বাড়ী। সবই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায়, ভূমিকম্প, ঝড়, ঘুর্ণী, বজ্র প্রভৃতির প্রকোপ হতে মুক্ত। চার পাঁচ তলা বাড়ীগুলি পাথরের মত শক্ত ইট্, পাথর, জমানপাথর, কন্‌ক্রিট, ব্লক, ইস্পাত ফ্রেম ও ইস্পাত আর পাথর অপেক্ষা নানাগুণে শ্রেষ্ঠতর নতুন আবিস্কৃত ধাতু ও মিশ্র ধাতুর মাল মশলায় প্রস্তুত, এবং স্থায়ী আস্‌মানী রংএ রঞ্জিত।

লীনা। বাড়ীগুলির কোথাও ডেকোরেশন্ বা চারুশিল্প-কলার ছিটে ফোঁটাও দেখছি না! নানারকম কার্নিশ, কার্ভ, গম্বুজ, মিনারেট, ষ্ট্যাচু, বাসারিলিফ, এমন কি সাদাসিধে বিট্ আদিও নাই কেন?

উঃ। সায়েন্‌টিফিক্ টার্ন-অফ-মাইণ্ডে (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে) আর্টের ধারণা সম্পুর্ণ বদ্‌লে গ্যাছে; কিন্তু সুসংযত গঠনের মর্য্যাদা আছে যথেষ্ট,—বরং আরও মার্জ্জিত হচ্ছে। এখানে মানুষের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কিছুর

সম্পূর্ণতা সম্পাদন জন্য যেখানে যা কিছুর আবশ্যক, সেখানে ঠিক তাই লাগান হয়, আব লাগাবার ভাবটা এমন গ্রেস্‌ফুল যে, তা দেখলে মনে পীড়া জন্মে না, অধিকন্তু সেই নির্ম্মাণ নৈপুণ্য দেখে মন তৃপ্ত হয়।

তুমি যেরূপ ডেকরেটিভ আর্টের কথা বলছ, সে হচ্ছে অন্যের অপেক্ষা একের আর্থিক প্রাধান্যের নিদর্শন মাত্র। আরামই বাড়ী তৈরীর সার্থকতা। স্থায়ী করবায় জন্য বাড়ী মজবুত করা উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে যে বিদ্যার আবশ্যক, তাকে এখানে স্থপতিবিজ্ঞান বলা হয়। এরকম কোন কিছুতে শ্রমব্যয়ে অকাবণ সৌন্দর্য্য বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হত সেইখানে, যেখানে ঐ রকম আর্টের প্রতিযোগী-তায় জয়লাভই জীবনের প্রধানতম আনন্দেব বিষয় ছিল। যে যত মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য, অসাধারণ, অনাবশ্যক শ্রমসাধ্য শিল্পে সমৃদ্ধ ও শোভিত পোষাক পরিচ্ছদ, গহনাগাঁটি, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ী ইত্যাদির প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসিত হত, তার জীবন তত সার্থক বলে মনে করা হত। এ বিষয় পরে অনেক কিছু দেখবে ও জানবে।

এখন দেখ, ঐ সকল বাড়ীর প্রত্যেকটার চারিধারে প্রচুর জায়গা আছে; তাতে কয়েকটি ফলের গাছ, লতাকুঞ্জ, ফুলের গাছ বা বাগানে সব সময়ে কোন না কোন ফল বা ফুল ধরে আছে, কত সুন্দর সুন্দর পাখী তাতে বাসা করে আছে. আরও কতকগুলি গাছ আর গুল্ম আছে যার গন্ধে রোগের বীজাণু জন্মাতে পারে না। বাড়ীগুলির সর্ব্বত্র ঐ সকল ফল ফুলের সুগন্ধে সর্ব্বদা ভরপূর। এই সহরের চারিদিকে প্রায় দু'মাইল বিস্তৃত সমতল মাঠ; তা'তে এক প্রকার প্রচুর ঘাস জন্মে। মাঝে মাঝে যন্ত্র সাহায্যে কেটে নানা প্রকার শিল্প আর খাদ্য আদির উপকরণ জন্য যথাস্থানে চালান দে'য়া হয়। সমিতির সীমার মধ্যে যেখানে ত্রিশ, চল্লিশটী গ্রাম পূর্ব্বে ছিল, সেখানে উত্তম ধান, গম, ভূট্টা আদি শস্য, নানাপ্রকার দরকারী দ্বিদল ডাল জাতীয় দানা এবং নানা প্রকার ফল, উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন হচ্ছে। বর্ষার জল, মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়ে আটকান আছে। ঐ রকম দু'টী বাঁধের মাঝের জমি সমতল করা হয়েছে। ঐ বাঁধে মাটী

দেওয়াতে গভীর জলা তৈরী হয়ে গ্যাছে, তা থেকে জমিতে আবশ্যক মত জল সেচা হয়, আর তাতে প্রচুর মাছও জন্মান হয়েছে। ঐ দূরে দেখ অনেকখানি জায়গা জুড়ে মুরগী, হাঁস আদির পোলট্রি ইয়াড়। আরও দূরে অপরদিকে একটা জঙ্গল, তা'তে হরিণ, খরগোস আদি শিকারের জন্তু রয়েছে। বলাই বাহুল্য এখানে কোন হিংস্র জন্তু নাই। কোন কোন বাঁধের ওপর দিয়ে মোটর, বাস আদি যাতায়াতের জন্য কনক্রিটের রাস্তা আর চারিদিকের অন্য সমবায় সমিতির সহরে যা'বার রাস্তাও আছে। তাদের বাঁধ, রাস্তা, জল নিকাশী নালা বা খালের সঙ্গে এদের ঐ সকলের যোগ আছে।

একটু ওপর থেকে দেখ, ঐ সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত স্থানটা যেন একটা সযত্নে সাজান সুন্দর বাগান। ঐ দেখ রোগ বীজাণু নষ্ট করবার জন্য, আর যা'তে তা জন্মাতে না পারে সে জন্য একরকম বড় বিমানপোত থেকে সুগন্ধি য়্যান্টিসেপটিক্ লোসনের ও গ্যাসের স্প্রে ছাড়া হচ্ছে। এর দ্বারা মশা, মাছি, বিষাক্ত পোকা, সাপ, বিছা, রোগ জীবাণুবাহী কীট-পতঙ্গ, আর মানুষের অনিষ্টকারী বহু প্রকার জীব জন্তু ধ্বংস করা হচ্ছে। নানাপ্রকার রোগ

উৎপত্তির কারণ বলে গৃহপালিত পশু, পক্ষী প্রায় রাখা হয় না। জমিতে আর বায়ুতে বিষাক্ত কোন কিছু যাতে না জন্মাতে পারে, সেজন্য স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ হ'তে নিয়ত তার উপায় অনুসন্ধান ও তা কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে। কৃষিজাত উদ্ভিদ্, শস্য ফল-মূল প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু কীট, পতঙ্গ, পোকা বা জন্তুর আক্রমণ হ'তে রক্ষার জন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হয়েছে।

লীনা। এখন চল সহরে কোথায কি হচ্ছে দেখি।

উঃ। কোথা হ'তে দেখতে আরম্ভ করলে ঠিকমত বুঝতে তোমার সুবিধা হবে বলত ?

লীনা। আতুড়ঘর থেকে সুরু করলে হয়না ?

উঃ। তার আগে সু-মাতা কেমন করে তৈরী করা হচ্ছে তা দেখা আবশ্যক।

ইউজিনিক্স্।

(Viriculture—Cultivation of race.)

সে এক বিরাট ব্যাপার! বৈজ্ঞানিক শিক্ষার এই বিভাগটীর নাম হচ্ছে 'ইউজিনিক্স্', এর মানে—মানুষের পূর্ব্বপুরুষ-লব্ধ শারিরীক মানসিক যত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, বর্ত্তমান জেনারেসনে বংশানুক্রমিক বিবর্ত্তন নিরাকরণের

এবং পরবর্ত্তি জেনারেশনে সর্ববিধ সদগুনের সম্ভাবনা সম্পন্ন সুসন্তান উৎপাদনের বিজ্ঞান। এই প্রকার উন্নতির চেষ্টা এই গ্রহের সমস্ত মানুষের মধ্যে অক্লান্ত ভাবে চলেছে। বিশেষ ক'রে যারা কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত আদিম অবস্থায় ছিল, তা'দিগকে তিন চার পুরুষের মধ্যে উক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে এতদূর উন্নত করা হয়েছে যে, এখন তা'দিগকে অবজ্ঞা করবার প্রবৃত্তি একটুও কারো হয় না। অনেক ময়লা বং বিশিষ্ট মানুষের মুখেব আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব এমন মনোরম হয়েছে, যে অনেক উন্নত গোরালোক তাদের অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দ করে! এইরূপে সাদা কালোর মিলন সহজ হয়েছে। উন্নত নতুন নতুন রক্ত মিশ্রনের ফলে মানুষের রং আর গঠন যেমন সুন্দর হচ্ছে, বুদ্ধি শক্তিও তেমনি বাড়ছে। ফলে রং বিদ্বেষ বা 'কলার প্রেজুডিস' ঘুচে গে'ছে; তার স্থানে অকৃত্রিম মৈত্রীভাব জেগে উঠেছে। এখানকার সমস্ত মানবজাতিকে সকল রকমে এমন উন্নত করা হয়েছে এবং হচ্ছে যে, না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। যে সকল মানুষকে সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শ মানুষ বলে গণ্য করা হ'ত তা'দের পূর্ব্বপুরুষও কয়েক হাজার বছর আগে কিম্ভূত

কিম্ভূতকিমাকার আদিম জাতির মানুষ ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমোন্নতির ফলে এখন এত উন্নত দেখছ।

এই প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির মূলে যে প্রক্রিয়া অন্তর্নিহিত, তারই উপর ভিত্তি করে 'ইউজিনিক্‌স্‌' উদ্ভাবিত হয়েছে। আদিম জাতিদের মধ্যে সবাই কুৎসিত অসভ্য ছিল না। অনেক জাতি প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে সর্ব্ববিষয়ে প্রাকৃতিক কারণে সম্যক্‌ উন্নত হয়ে এসেছে, কিন্তু অত্যন্ত বিলম্বে। সেই প্রক্রিয়াটী তাড়াতাড়ি সাফল্য-মণ্ডিত করাই হচ্ছে 'ইউজিনিক্‌সের' (Eugenics) কৃতিত্ব। এখানে এদের অনেক করে বুঝিয়ে সুজিয়ে আদিম নিবাস ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতির অনুকূল স্থানে ও সহৃদয় সহানুভূতি সম্পন্ন উন্নত মানুষের পরিবেষ্টনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। এখন আর ভিন্ন ভিন্ন জাতি নাই; সবাই এক মানবজাতিতে পরিণত হয়েছে। এখন উন্নতির প্রকৃত ধারণা, উন্নতির প্রয়োজনীয়তা, উন্নত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অথবা এক কথায় উন্নতির অভাব বোধশক্তি নানাপ্রকার উপায়ে এদের মনে জাগান হয়েছে। এখন এরা নিজেদের সব রকম উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

বল্‌তে যা' বোঝায়, মিলিত ভাবে তা নিজেরাই করছে ; এখন 'ইউজিনিক্‌স্‌ বিদ বৈজ্ঞানিকের দল এদের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে তিন চার পুরুষ পরে এদের যে রকম ক'রে তুলেছেন, তা' দেখলে যাদু মন্ত্রের শক্তিতে তা হয়েছে বলেই মনে হয়। অবশ্য যে সকল আদিম নিবাসী শিক্ষিত, সভ্য অর্থাৎ উন্নত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা এমন বিকৃত অঙ্গ বা বিকৃত মস্তিষ্ক যে, তাদের সন্তান সন্ততির ও সেইরূপ বিকৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের প্রজনন শক্তি নানা উপায়ে রহিত করা হয়। আর যারা ক্রমোন্নতিব থিওরী অনুযায়ী বহুকাল হ'তে সভ্য ভব্য হ'য়ে এসেছে,— তাদের মধ্যেও ক্বচিৎ যারা বিকলাঙ্গ ও বিকৃতবুদ্ধি হয়, তাদেরও প্রজনন শক্তি নষ্ট করা হয়। আবার কৃত্রিম উপায়ে মায়ের ইচ্ছানুয়ায়ী জরায়ুতে উন্নত 'প্রটোজোয়া' প্রবেশ করিয়েও বাঞ্ছিত সন্তান জন্মান হয়।

ক্রমশঃ উন্নত সন্তান য'াতে জন্মায় সেজন্য আরও অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবনের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ নিয়ত মিলিতভাবে চেষ্টাও এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌ করছেন ; এদের মধ্যে প্রধানতঃ ইউজিনিক্‌স্‌বিদ, মনোবিজ্ঞানবিদ, মনঃসমীক্ষক,

ফিজিওগ্নমিষ্ট, ফিজিওলজিষ্ট, বাইওলজিষ্ট, আর্টিষ্ট আদি আছেন—আর আছেন অনেক শিক্ষানবীশ।

কন্‌সেপসন্‌
(Conception)

যৌন সম্মিলনের আগে শৈশব হ'তে বালক বালিকার মনে সুন্দর শিশু, বালক, যুবক প্রভৃতি যে কোন সুন্দর মানুষের মূর্ত্তি, প্রতিকৃতি বা রূপ যদি একান্তভাবে জাগরুক থাকে, এবং যৌন মিলন কালে এবং গর্ভাবস্থায় সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তি যদি মানসনেত্রে বা 'ভিসুয়্যাল-আই'তে (Visual eye) সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে তাদের সন্তান যে, বাপ, মা থেকে বিশেষ সুন্দর হয় তা' বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে।

সেই হেতু শিক্ষার একটী প্রধানতম অঙ্গ হচ্ছে ভিসুয়েল আই (Visual eye) অর্থাৎ মানস-চক্ষুতে দেখবার শক্তির অনুশীলন, তা আগে বলেছি। শিশু, বালক, যুবক, যুবতী সকলকে এই শক্তির অনুশীলন করতে হয়। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিশু, বালক বালিকা, যুবক-যুবতী প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার প্রতিমূর্ত্তি ঠিক মত ধারণা করাবার জন্য, সকল বয়সের মানব সৌন্দর্য্যের

শ্রেষ্ঠ প্রতীক স্বরূপ বহুবিধ প্রস্তর মূর্ত্তি, ওয়াক্‌স্‌-মডেল, অইলপেন্টিং আদি, পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত বা অর্দ্ধনগ্ন অথবা নগ্নভাবে বহুবিধ 'পোজে' শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানের 'ইউজিনিক্‌স্‌' বিভাগে ভিস্যুয়েল কন্‌সেপসনের' অনুশীলন জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

লীনা। ঐ রক্ষিত প্রতিমূর্ত্তিগুলি কি চিরকালের জন্য আদর্শ হয়ে আছে বা থাকবে? এ থেকে কি আরও উন্নত বা সুন্দর হ'তে পারে না?

উঃ। পারে বৈ কি! এই গ্রহের কোন একটী বড় সহরে প্রত্যেক দশ বছর অন্তর সুন্দর সুন্দরীদের, একটী বিরাট প্রদর্শনী হয়। তা'তে সমগ্র গ্রহের সকল বয়সের সুন্দর সুন্দরীকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সেই সঙ্গে সমস্ত 'আর্টিষ্ট'দেরও সেখানে যেতে হয়। সমস্ত গ্রহের লোক কাজের অসুবিধা না করে এই প্রদর্শনী দেখতে অনেকদিন ছুটী পায়। এই প্রদর্শনী তিন মাসকাল স্থায়ী হয়। গ্রহের যে কোন স্থান থেকে এসে, ফিরে যেতে তিন দিনের বেশী লাগে না। বিমানপোত ঘণ্টায় তিন শত মাইলের অনেক বেশী পথ অতিক্রম কর্‌তে পারে। আবশ্যক মত গ্রহের সর্ব্বত্র অনেক 'এরোড্রোম' আর 'সিড্রোম' তৈরী করা হয়েছে। এক একটী

'সিড্রোম' যেন ধাতু নির্ম্মিত ভাসমান দ্বীপ। সেখানে বিমানপোতের জন্য নানাবিধ তেলের গুদাম আব যন্ত্র মেরামতের কারখানা, বিশ্রামাগার, রেস্তোঁরা, ডাক্তারখানা আদি রয়েছে। কাজেই সুন্দর সুন্দরীব প্রদর্শনী দেখবার সাধ প্রায় অপূর্ণ থাকে না। যারা দেখ্‌তে যায়, তাবা প্রত্যেকে চার জনকে শ্রেষ্ঠ সুন্দবী বা সুন্দর বলে ভোট দিয়ে আসে। এইরূপে বেশী ভোট যারা পায়, তাদের প্রথম একশত জনকে, সৌন্দর্য্যের আধার বলে ঘোষণা করা হয়। তাদের ফটো এবং নানা-বিধ ছবি বিতরণ করা হয়। ভোটারদের মধ্যে প্রায় সমস্ত আর্টিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক থাকেন। তারপর সর্ব্বসাধারণের নির্ব্বাচিত হাজাবখানেক শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টের ওপর পেন্টিং, ওয়াক্‌স্‌ মডেল, ষ্ট্যাচু আদি গড়বার ভাব এরূপভাবে দেওয়া হয, যেন ঠিক একশত জনের অঙ্গবিশেষ, যা' সুন্দরতম বলে স্বীকৃত হয়েছে, তার ভাব নিয়ে অনেক রকম আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি, মডেল বা প্রতিকৃতি গড়া হয়। তা'র মধ্যে থাকে শিশু, বালক বালিকা আদি প্রায় সকল বয়সের সুন্দর সুন্দরী এবং তাদের সর্ব্বাঙ্গে থাকে নানা সুন্দর, সুন্দর ভাবের অভিব্যক্তি আর চিত্তাকর্ষক মাধুর্য্য। এ গেল

বাহ্যিক মাধুরী। এই সকল আর্টে আন্তরিক অর্থাৎ মানসিক মাধুরী দেখানই আর্টিষ্টদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। এই সকল শিল্পকলা নিদর্শনের সুন্দর সুন্দর নকল, সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানের, 'ইউজিনিক্স্' মিউজিয়ামে রাখা হয়। আর আসল পেন্টিং, মডেল, ষ্ট্যাচু আদি গ্রহের কেন্দ্র সমবায় প্রতিষ্ঠানের বিশাল মিউজিয়ামে থাকে। তা আবার ছোট বড় অন্য সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানে 'ইলেক্‌ট্রোস্কোপের' (Electro-scope) সাহায্যে সপ্তাহে সপ্তাহে দেখান হয়। সেই সঙ্গে এই সকল চারুশিল্প কি করে 'এ্যাপ্রি-সিয়েট' করতে হয় তা'ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বক্তৃতা দিয়ে শোনান হয়।

ঐ দেখ; ইলেক্‌ট্রোস্কোপের সাহায্যে কেন্দ্রীয় মিউজিয়ামে পাঁচ বছর আগেকার শেষ প্রদর্শনীর পর যে সকল শ্রেষ্ঠতম ষ্ট্যাচু, মডেল, পেন্টিং আদি গৃহীত হয়েছে তার সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেখানকার কত দর্শক গ্যালারীতে বসে দেখছেন ও শুনছেন। এখানকার গ্যালারীও—

লীনা। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—সমস্ত দর্শক ও বক্তা এইখানকার, আর আসল প্রতিমূর্ত্তি আদিও

যেন আমাদের সামনেই রয়েছে—সকল দর্শকই নড়ছে !

উঃ। ঐ লাইনের ওদিকের দে'য়ালে 'ইলেকট্রোস্কোপের' গ্যালারী সমেত ছবি প্রতিফলিত হয়েছে; লাইনের এধারে গ্যালারীতে সবই এখানকার সত্যিকারের লোক। ইলেক্‌ট্রোস্কোপের ছবি দেখ্‌তে এমন সজীব মনে হয়, যে স্বাভাবিক দৃশ্য হ'তে তার প্রায় কোনও প্রভেদ নাই। এখানে দু'জায়গায় ইলেক্‌ট্রোস্কোপে গ্রহের সব কিছু দেখান হয়। একটী থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যা' আমরা দেখছি; তার প্রোগ্রাম আগে ব্রড্‌কাষ্টে প্রচার করা হয়। অন্যটী আছে 'লেকে' যে দ্বীপ আছে তা'তে, গ্রহের যা' কিছু ঘট্‌ছে তাই দেখান হয়। কিছু পূর্ব্বে বা সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ দেওয়া হয়। অনেকে উভয় স্থানে তা'র ফোটো তোলে, শব্দ এবং কথা ফনো-গ্রাফে রেকর্ড করে নেয়। প্রত্যেকের থাক্‌বার ব্লকে বা ঘরে ফোন আর ব্রড্‌কাষ্টিং মেসিন আছে, তা দিয়ে দরকার হ'লে কোন কথা বা বিষয়, যা' ফোনে বা ব্রড্‌কাষ্টিংএ শোনা যায় তা ফোনে রেকর্ড করা হয়। ফনোগ্রাফে দু'টী সাউণ্ড বক্স থাকে। একটী 'রেকর্ডার' অন্যটী প্রোডিউসার'; যে ফোন করে, আর যে উত্তর দেয়—তা'দের

দু'জনেরই চেহারা 'টেলিভিজনে' দু'জনে দু'জনকে মুখোমুখী ভাবে দেখ্‌তে পায়। আবশ্যক হ'লে, সঙ্গে সঙ্গে ফোটো ও তুলে নেওয়া হয়। এতে চিঠি বা আবশ্যক কোন কিছু লেখার দরকার হয় না। যদি কোন কিছু ছেপে প্রচার কর্‌বার দরকার হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত ফনোগ্রাফের রেকর্ড-গুলি প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রেসের এক রকম মেসিনের কাছে, সেগুলি গ্রামোফোনে চড়িয়ে, চালিয়ে দিলে, গলিত ধাতুতে সঙ্গে সঙ্গে ব্লক তৈরী আর ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। বইএর আকারে বা যে কোন সুবিধামত আকারে অন্য মেসিনে বাঁধাই হয়।

লীনা। সব রকম ভাষাতেই কি ঐ রকমে লেখালেখি বা ছাপার কাজ চলে?

উঃ। সে কথা আমি বলতে ভুলেছি। সমস্ত গ্রহবাসীর এক রকম ভাষা হয়ে গ্যাছে। পূর্ব্বে বহু ভাষা ছিল। প্রায় সকল ভাষাই বালক বা বালিকার পক্ষে শেখা কম বেশী কষ্ট সাধ্য ছিল। এখানে যে ভাষা চলেছে, তা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত অর্থাৎ সুসঙ্গত, সত্য, যুক্তিসিদ্ধ, সুললিত, শ্রুতিমধুর এবং অতি সহজে শেখা যায়। অধিকাংশ গুন বা বস্তুর একটী মাত্র ছোট সুশ্রাব্য নাম রাখা হয়েছে।

আগেকার সব ভাষা থেকে কিছু কিছু সুন্দর সহজ অক্ষর আর শব্দ বেছে নেওয়া হয়েছে, বাকী সব নতুন ক'রে উদ্ভাবিত। এই নতুন ভাষাতে ক্রিয়া রূপের ঝঞ্ঝাট কম। যুক্ত অক্ষর নাই, কথিত ভাষা আর লিখিত ভাষায় পার্থক্য নাই, আর আর সুবিধা প্রায় সব কিছু আছে। নতুন নতুন ভাব প্রকাশক বহু শব্দ ও বাক্য বা বাক্যাংশ যোগে এই ভাষা নিয়ত সমৃদ্ধ ও উন্নত হচ্ছে। এতে মিথ্যার লেশ মাত্র নাই।

লীনা। আচ্ছা, তুমিত বললে, বস্তুর আর অনেক গুন বাচক বিশেষ্যের একটী মাত্র নাম, নতুন ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তা'হলে কবিতার ছন্দ মেলাবার অসুবিধা কি হয় না?

উঃ। খুব বেশী অসুবিধা হয় না। এমন অনেক ভাষা পূর্ব্বে ছিল, যা'র প্রায় প্রত্যেক বস্তু বা গুনের একটী মাত্র নাম চলিত ছিল। তাদের কবিতাও খুব উন্নত ছিল। তা'ছাড়া পূর্ব্বের তুলনায় কবিতার প্রচলন কমে এসেছে। ছন্দ শ্রবন-মন-তৃপ্তি দায়ক। মুখস্থ সহজে হয়। আর সহজে স্মরনেও থাকে বলেই যত কিছু স্মরন যোগ্য তা কবিতাতেই রচিত হত। পরবর্ত্তি কালে লেখন প্রণালী উদ্ভাবিত হলেও প্রায় সবই কবিতাতে

লেখা হত। তার বহুকাল পরে মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যের প্রচলন ক্রমে খুবই বেড়ে আসছিল।

লীনা। হাতে লেখা 'বা হাতের লেখা পড়ার চলন এখন আর নাই বল্‌তে চাও?

উঃ। এত কমে গেছে যে নাই বল্‌লে হয়। তবে বাল্য শিক্ষায় হাতে লেখার তালিম এখনও দেওয়া হয়। পরে অভ্যাস অভাবে ঠিক্ মত লেখবার ক্ষমতা আর থাকে না। এই সঙ্গে আর কয়েকটী অভ্যাসও প্রায় গ্যাছে, সর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং ইত্যাদি।

লীনা। মানুষ স্বভাবতই 'কন্‌জারভেটিভ' বা রক্ষণশীল, কি করে হঠাৎ এত প্রগ্রেসিভ্ বা উন্নতিশীল হয়েছে বলত?

উঃ। এ বিষয় পরে আলোচনা ক'রব মনে করেছিলাম; কিন্তু তোমার মনে যখন এ প্রশ্ন এসেছে—তখন উত্তরদাতারূপে কিছু বল্‌তে আমি বাধ্য। তাছাড়া বলার প্রয়োজন আছে। এ রকম বিস্ময় জড়িত সন্দেহ যদি এখন তোমার মনে জেগে থাকে, তা'হলে তুমি যা দেখ্‌ছ আর শুন্‌ছ, তার অন্তর্নিহিত সত্যে তোমার ঠিক্ মত শ্রদ্ধা জাগ্‌বে না! তা'তে করে আমার দেখান

ও তোমার দেখা কতকটা অকারণ কষ্টে পরিণত হ'তে পারে। আপাততঃ সংক্ষেপে কিছু বল্‌ছি, পরে বিশেষভাবে দেখাব। এ একটী গুরুতর সমস্যা।

মানুষ স্বভাবত 'কন্‌জারভেটিভ' নয়, 'প্রোগ্রেসিভ'। শুধু মানুষ কেন—বিশ্ববস্তু সবই পরিবর্ত্তনশীল। চেতন অচেতন ব'লে বস্তুর ভেদ করা আর চলে না। বস্তু মাত্রেরই চেতনা আছে। সেই চেতনা বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ 'এনার্জ্জি'—শক্তি বা গুণ অথবা ধর্ম্ম; তা পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়ে যে অবস্থায় ক্রমে পরিণত হয় তা'কেই আমরা ক্রমোন্নতি বলি। বস্তুর ক্রম-বিকাশের চরম ফলে কোটী কোটী বছর ধরে দৃশ্যত নির্জীব বস্তুই মানুষে পরিণত হয়েছে। মানুষ হ'য়ে আমাদের হুঁস্ হয়েছে যে মানুষই এই বিকাশের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেছে। অন্য বিবর্ত্তিত জীবন্ত বস্তু বা জীবের সে হুঁস্ বা ফললাভ ঘটেনি। যে হেতু মানুষ এই হুঁস্ লাভ করে ধন্য হয়েছে, সেই হেতু এই পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশকে 'ক্রমোন্নতি' ব'লে ধ'রে নিয়েছে।

যাই উন্নতির হুঁস্ হয়েছে অমনি প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতি অত্যন্ত বিলম্বিত জেনে, নিজেরাই উন্নতির চেষ্টায় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেছে। এই

হুঁস্ই হচ্ছে জ্ঞান, এই জ্ঞান নিত্য ক্রমবর্দ্ধনশীল অর্থাৎ 'য়্যাক্সিলারেটারী'। এই রকম সজ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি মানুষেই অভিব্যক্ত হয়েছে বলেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়েছে।

অন্য কোনও জীবে এই জ্ঞানের এত অধিক স্ফূর্ত্তি হয়েছে ব'লে প্রমাণ হয়নি। তবে অন্য কোন গ্রহে মানুষ হ'তে ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ঠ জীব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে কিনা, তা' আমরা পরে খুঁজে দেখব। উই, পিপড়ে, মৌমাছি প্রভৃতি জীব যদিও অনেকখানি জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় দেয় সত্য, তবুও তাদের জ্ঞান মানব অপেক্ষা হীন-জীব সুলভ সীমাবদ্ধ।

যাই হোক্ আদিম অবস্থায়-মানুষের মধ্যে সবাই একই রকম জ্ঞানের অধিকারী হয়নি। যে কয়েকটী মানুষ পারিপার্শ্বিক ঘঠনাচক্রে অন্যের অপেক্ষা আদিতে একটু বেশী চালাক হয়েছিল, তাদের সংখ্যা মনেকর হাজার করা একজন। এই একজন চালাকই চালাকীর জোরে বাকী নয়শত নিরানব্বই জন অপেক্ষাকৃত ভাল মানুষের ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সব রকমে আধিপত্য করতে চেয়েছিল। আধিপত্য করবার প্রধানতম উপায়

ছিল, ঐ নয়শত নিরানব্বই জনের মানুষোচিত বাস্তব জ্ঞানের ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক পথ চিরতরে রুদ্ধ করা আর এই আধিপত্য লাভের পর সর্ব্ববিধ উন্নতি বিমুখতার পথে নিরন্তর তাদের নিয়ে যেতে চালাক মানুষটির সমস্ত মস্তিষ্কশক্তি নিয়োজিত করা।

এই ভাবে হাজার হাজাব বছর ধ'রে সংখ্যা গরিষ্ঠদের অনুন্নত ক'রে রাখবার চেষ্টার ফলে 'উন্নতির অভাব বোধ' অথবা উন্নতির চেষ্টা করাই যে মানুষের একচেটে ধর্ম্ম, তা সংখ্যা লঘিষ্ঠ উচ্চ সম্প্রদায়ও ভুলে গেছল। এইরূপে উন্নতি বিমুখতা উভয় সম্প্রদায়ের কৃত্রিম স্বভাবে (instinctএ) পরিণত হয়েছিল। অথচ উন্নতি-শীলতাই মানুষের অকৃত্রিম স্বভাব বলে, কোন রকম উন্নতির আশা ব্যতীত মানুষ বাঁচ্‌তে পারে না। তাই মৃত্যুর পর এক প্রকার লোভনীয়, কাল্পনিক ব্যক্তিগত উন্নতির আশায় প্রায় সমস্ত গ্রহের উভয় সম্প্রদায়কে মোহাবিষ্ট করা হয়েছিল। এই শেষোক্ত উন্নতির নাম আধ্যাত্মিক, স্পিরিচুয়েল বা এই রকম কিছু বলা হ'ত। মানুষের এই অবস্থাকে ইহলোকে চরম উন্নতির অবস্থা বলে সকলের যা'তে দৃঢ় ধারণা হয়, সেই

রকম বহুবিধ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাজেই এই অবস্থায় মানুষ অতীতে যেমনটি ছিল, ঠিক সেই রকম থাক্‌বার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করত। এরই নাম রক্ষণশীলতা বা কন্‌জারভেটীজম্‌।

"পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাত্‌লে নাকি নিজেকেও সেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে হয়"। রক্ষণশীলতাকে চিরস্থায়ী করবার ফাঁদে সংখ্যা-গরিষ্ঠদের জড়িয়ে রাখতে গিয়ে, সংখ্যালঘিষ্ঠরাও সেই ফাঁদে জড়িত হয়েছিল। এই ফাঁদে জড়িত অবস্থার নামই অধীনতা বা পরাধীনতা'। সেই ফাঁদ হঠাৎ তেড়ে ফুড়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ার নামই 'রেভলিউশন'। এর পরে বন্ধনমুক্ত অবস্থায়, বাস্তব উন্নতির ঠিক্‌ পথে এগোতে পারলে, সেই অবস্থার নামই, 'লিবার্টি।'

এখন দেখ কয়েকজন মানুষই অগণিত মানুষকে রক্ষণশীল করে রেখেছিল। এখন এরা ক্রমোন্নতি বা লিবার্টিব পথে সম্যক্‌ প্রগতিশীল। সম্যক্‌ বল্‌ছি এই জন্য যে লিবার্টি বা উন্নতির অন্ত নাই ব'লে।

এই পর্য্যন্ত পড়ে শোনাবার পর, লীনাদেবী আমায় বললেন, "লেখাটা ঠিকই হচ্ছে, তবে,— 'ডীটেল্‌স্‌' কিছু"—

আমি বললাম্—"কিছু বেশী হচ্ছে সত্যি, আমায় সুলেখক বলে, য়্যাপ্রিসিয়েট্"—

লীনা। অর্থাৎ, 'য়্যাপ্রিসিয়েট্' যাতে আর না করি তার—

আমি। না, তা নয়, আমি বড় মুস্কিলে—

লীনা। তোমার ন্যাকামী বুঝেছি, এখন তুমি যেমনই লিখ্‌বে, তাতে আমার 'য়্যাপ্রিসিয়েশন বৃদ্ধি ভিন্ন এক বিন্দু হ্রাস পাবে না।

আমি। আমার কি মুস্কিল তা একবারটি শোন, তার পর যা খুসী বলো। না হয়, আর একজন—

লীনা। আচ্ছা! তোমার ভাব আর বোঝাতে হবে না। আমার ইচ্ছা পূর্ণ করাই তোমার ব্রত হয়েছে, সেইক্ষণ থেকে যখন—

আমি। থাক্, থাক্। এখন আমার কথা শোন। তুমিত জান আমি বাংলাতে লিখ্‌তে অভ্যস্ত নই, বহুকাল ভাল বাংলায় আলাপও প্রায় কর্‌তে পাই নি, বাংলা লেখার বর্ত্তমান ঢং ও আমার জানা নাই। তা ছাড়া লিখ্‌তে গিয়ে আরও এক মুস্কিলে পড়ি! অন্য ভাষায় প্রচলিত বিশেষ কোন কোন শব্দের ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে বে'র করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করলেও সেই শব্দের দ্বারা অভিপ্রেত বক্তব্য সহজ বোধ্য হ'বে বলে নিঃসন্দেহ হ'তে পারছি না;

তাই 'ডীটেল্‌স্‌' দিলে বক্তব্য কতকটা সহজবোধ্য হবে ব'লে মনে করি। এই যেমন 'রেভলিউশনের' ঠিক বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে 'বিপ্লবকে' প্রতিশব্দ ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে, অথচ অভিধানে বিপ্লব মানে বিপদ, বিনাশ, ভয়প্রাপ্তি, ভয়প্রদর্শন, উপদ্রব, বিদ্রোহ, দেশলুণ্ঠন। 'রেভলিউশন্‌' শব্দের বদলে বিপ্লব শব্দ রাষ্ট্রনৈতিক গুরুগম্ভীর অর্থে ব্যবহার কর্‌লে, লোকে কিন্তু ঐ লঘু হীন অর্থই নেবে। আরও দেখ, 'লিবার্টি' শব্দের প্রতিশব্দ স্বাধীনতা কর্‌লে 'লিবার্টির' ভাবও ক্ষুণ্ণ হয়। 'ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের' সময় ব্যবহৃত, 'ইকালিতে', 'ফ্রেতার্‌নিতে', 'লিবার্তের' বাংলা করা হয়েছিল,—"সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা।" স্বাধীনতার মানে, আত্মবশ্যতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্ত-শাসন, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বরাজ ইত্যাদি। স্বরাজের আভিধানিক মানে—বিজিত জাতির, জেতার অধীনে স্বহস্তে রাজ্য শাসন। আর এখন লোকে স্বাধীন শব্দের মানে করে, স্ব=নিজের—অধীন বা স্বদেশের লোক বা লোকদের অধীন; সে লোকটী বা লোকগুলি যেমনই হো'ক্‌। সেকালে এই গ্রহের যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতেন, তাঁরা সকলেই প্রায়

নিজেদের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ব'লে, আর উচ্চশ্রেণীর স্বাধীনতাই তাঁদের দেশের স্বাধীনতা ব'লে মনে কর্‌তেন। তাঁদের ঘনীভুত দেশাত্মবোধের দাবীতে দেশ আর নিজেদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলে জাহির করতেন, যেমন, "এতাৎ সেতা মোয়া" "ষ্টেট্ দ্যাট ইজ্‌মি", এইভাব কেউ মুখ ফুটে প্রচার করতেন, আর বাকী সব মনে মনে অনুভব করতেন। যাই হো'ক্ তবু সাধ্য মত চেষ্টা করব 'ডীটেলস্' বাদ দিতে।

লীনা। সব জায়গায় দিলে চল্‌বে না। আনাবশ্যক 'ডীটেলস্' বাদ দেবে। তার মানে একটু সংক্ষেপ কর্‌লে চেষ্টা করবে, তাহলেই হবে।

আমি। সে চেষ্টা আমি কর্‌ছি, কিন্তু অনেক স্থলে তা কর্‌তে বিষয় বস্তু খেলো হয়ে যাবে ব'লে ভয় হয়।

লীনা। আমি তোমায় অভয় দিলাম। এখন একটা কথা বলতে চাই, দু'জনে একঘরে থাকলে, দু'ঘরে থাক্‌বার উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হয় না? তোমার সুরুচিতে, তার মানে, সংস্কারে যে বাধা বা আঘাত দোব না, তা তুমি বিশ্বাস করতে পার। তবুও কেন ন্যাকামী করছ?

আমি। ন্যাকামী!

লীনা। নয়ত আর কি? সে কি শুধু আজ? যাই হো'ক্ এখন আর ন্যাকামীর দরকার আছে কি? তোমার মনের কথা আমি জানি, আমার মনের কথাও তুমি জান। তবে মিছে লুকোচুরি করে দর বাড়াচ্ছ কেন?

আমি। ন্যাকামী কি রকম, শুনি।

লীনা। মনে এক আর কথায় অন্যভাব প্রকাশ করাকে, তুমি কি বলবে? এর আগে এই রকম লুকোচুরি করাকে মনে করতাম সেন্টিমেন্টকে সম্মান করা, যাকে বলা হয় সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রতা। এখন পুনর্জীবন পেয়ে দেখ্‌ছি এটা কপটতা, মিথ্যা আর প্রতারণার খিচুড়ী অর্থাৎ ন্যাকাম, বুঝলেত?

এক ঘরে থাক্‌তে চাই কেন? তোমার সান্নিধ্য, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে, তোমাকে দেখতে আমার ভাল লাগে, এক কথায় তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলে ভালওবাসি। তুমিও আমাকে তাই কর। তোমার মুখের ভাবে দেখ্‌ছি, এ-কথা স্বীকার করতে তোমার মন চাচ্ছে না। তোমার মনকে বুঝিয়ে দেও, আমি মুখের ভাব দেখে মনের কথা হুবহু বুঝতে পারি। এ-শক্তি আমি সদ্য লাভ করেছি। তোমার মনের কথা বলব, শুন্‌বে?

আমি। আজ থাক্, আর একদিন শুনব। তোমার

ইচ্ছা মতই একটা রুমে দু'জনে থাকব। কিন্তু অন্যঃহোটেলে যাব, কেমন ?

লীনা। কেন, এ-হোটেলের লোকেরা পাছে কিছু মনে করে ? হায় রে লোকলজ্জা আর তোমার সমাজ-সংস্কার ব্রত ! একজন মহিলা কবির এক টুক্‌রো কবিতার অংশ শুন্‌বে ?

"পারি না করিতে কাজ সদা ভয় সদা লাজ ;
পাছে লোকে কিছু বলে !"

এই ত তোমার মনের কথা, নয় কি ? হোটেলওয়ালারা মনে করতে পারে—স্বামী-স্ত্রীতে দাম্পত্য কলহ করে দু'টো রুম নিয়েছিল, ঝগড়া মিটে গ্যাছে, তাই—এক রুমে এসেছে। এতে আর ভয় লাজের কি আছে ? না হয়, যদি চাও তবে আমি ওদের সত্যি কথা সম্‌ঝিয়ে দিতে পারি। উনি আমার বিবাহিত স্বামী ; কিন্তু—

আমি। থাক্ থাক্, মাদ্রাজে স্বামী শব্দের অর্থ অন্য রকম, যাক্, আর সম্‌ঝাতে হবে না, আমি 'বয়কে' বলে দিচ্ছি, ঐ ধারের ডবল রুমে আমাদের সব কিছু সরিয়ে দিতে। চল আমরা বাইরে যাই।

সন্ধ্যের পর লীনা দেবীর কথা আরম্ভ হল।

লীনা। ওখানে, ওকি হচ্ছে দেখিগে চল।

উঃ। এখানে অঙ্গচালনা বা 'ম্যাসাজ' (Massage), তার মানে অনেক প্রকার রোগ আরোগ্য আর শরীরের গঠন সুন্দর করা হচ্ছে। আর হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি বিচ্যুতি, মুদ্রাদোষ আদি নানা বিকৃতি সংশোধন করা। কি করে সব সময় মুখের ভাব সুপ্রসন্ন, অমায়িক (amiable) রাখতে হয়, আর সুন্দরভাবে উঠতে, বস্‌তে, দাঁড়াতে, চলতে হয়, তা শিক্ষা দে'য়া হচ্ছে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় গর্ভবতীদের, শরীর চর্চ্চা, ব্যায়াম অনুশীলন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে।

লীনা। কোন্ দেশ কত উন্নত বা সভ্য, তা জানতে হলে, সেই দেশের আঁতুড়, শিশুশিক্ষা, আর শিশু লালন পালন ব্যবস্থা দেখতে হয়, নয় কি?

উঃ। ঠিক্ তাই। সমস্ত গ্রহে এখন একরকম শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত। তবু একে বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত করা হয়নি। যেহেতু এই গ্রহটী যে বিশ্ব নয়; অসীম অনন্ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র, তা এরা জেনেছে। যাই হো'ক, সুসন্তান বা উপযুক্ত নাগরিক তৈরী করবার উপায় উদ্ভাবন জন্য এই গ্রহের বহু শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ গবেষণা ও পরীক্ষা নিয়ত করেছেন এবং পরীক্ষার সুফল কাজে লাগাচ্ছেন। তাই সমস্ত গ্রহ প্রতি নিয়ত উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অন্য উন্নত গ্রহের সঙ্গে

ভাব আদান প্রদান এখনও সুসম্পন্ন হয়নি, হলেও বিশ্ব-বিদ্যালয় বলা সঙ্গত নয়।

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে এক এক মাস পোয়াতিকে প্রসূতি আগারে থাকতে হয়। এই দু'মাস অন্য পোয়াতিদের সাহচর্য্যে নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের আনন্দদায়ক আলোচনায় অতিবাহিত করছে। পোয়াতি অবস্থার পাঠ্য পুস্তকের একটি লাইব্রেরী প্রত্যেক সহরের পোয়াতি আগারে আছে।

লীনা। রূপকথা আর ঐতিহাসিক সাহিত্যও এরা পড়ে নাকি ?

উঃ। না, রূপকথার গল্প প'ড়ে মানুষের মন মিথ্যা অসঙ্গত, অলৌকিক কল্পনা প্রবণ হয়। এরা এই পোয়াতি অবস্থায় যা পড়ে বা আলোচনা করে, তা গর্ভস্থ সন্তানের ওপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তাব করে। সেকালে যেখানে রূপ-কথার বা রূপকথার মত কোন প্রকার অসঙ্গতি এবং মিথ্যার আদর ছিল, আর পাঠ্য পুস্তকে যেখানে রূপকথার বা রূপ-কথার মত মিথ্যা আজগুবি অলৌকিক কথা থাকত, সেখানে লোকের সত্যে আগ্রহ কিছুতে জন্মাত না, বরং মিথ্যা অলৌকিককেই সত্য বলে মেনে নে'য়া ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। গ্রেট্ রেভলিউশনের পর নতুন সার্ব্বজনীন ভাষায় সর্ব্ববিধ, মিথ্যা বাদ দিয়ে সকল রকমের সমস্ত পুস্তকাদি, অনুদিত, নতুন করে লিখিত বা প্রণীত হয়েছে বা হচ্ছে।

যে সকল পুস্তকের মিথ্যা বাদ দিলে যে একটু আধটু সত্য থাকলেও তাতে মানুষের কোন কাজে আসে না সে সকল পুস্তক অগ্নিস্যাৎ করা হয়েছে। সে কালের প্রায় সমস্ত পুস্তকের বৈজ্ঞানিক বিশদ সমালোচনা সহিত একখানা ছাপা পুস্তক আব পাণ্ডুলিপি আদি এই গ্রহের পাঁচটি সুবৃহৎ 'পুবাতনের', মিউজিয়ামে রয়েছে। কলেজের পাঠ সমাপন ক'রে কেউ ইচ্ছা করলে তা পড়তে পাবে। এক্স্‌রে যন্ত্রের এত উন্নতি হয়েছে যে, তার দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান সুস্পষ্ট দেখা যায়, তাই প্রায় সকল স্থলে সুপ্রসব হয়। প্রত্যেক পোয়াতি ধাত্রী-বিদ্যায় সম্যক্ শিক্ষিতা। তবু প্রসবের পর হ'তে বিশেষভাবে শিক্ষিতা কতকগুলি ধাত্রী বা নার্সের ওপর সন্তান আর প্রসূতির মিলিতভাবে শুশ্রূষার ভার দেওয়া হয়েছে।

ঐ দেখ, শিশু পালনাগাব বা শিশুদের খেলাঘর। এইটি এ-সহরের (প্রত্যেক সহবের) বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। এতে সব রকম বৈজ্ঞানিক তথ্য আর মানুষেব ব্যবহারে লাগে এমন যন্ত্রপাতি (বৃহৎ যন্ত্রের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতব নমুনা) ছেলেদের খেলবার জন্য এমন ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, শিশুরা বিশেষজ্ঞদের সহিত মিলিতভাবে হাতে কাজে তার ব্যবহার ও নির্ম্মাণ কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হয়, আর অনেক কিছু তৈরীও কবে এবং কৃষিশিল্প আদির উৎপাদন রহস্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে প্রাণে এমন স্থায়ী আনন্দ পায় যে, ফুটবল, ক্রিকেট,

বিলিয়ার্ড, তাস প্রভৃতি হরেক রকম সেকেলে খেলাতে মোটেই আকৃষ্ট হয় না; যদিও সে রকম খেলার ব্যবস্থার ত্রুটী নাই।

এছাড়া বিরাট মিউজিয়াম আছে, তা'তে নাই এমন কিছু এই গ্রহে নাই, আর দু' একটা বিভাগ তোমায় দেখাই। এতে 'বাইওলজী' বা জীবতত্ত্বের যাবতীয় বিষয় ছেলেদের বোঝবার মত করে রাখা হয়েছে। প্রটোজোয়ার উৎপত্তি হ'তে উন্নততম মানুষে পরিণতির ছবি, ওয়াক্স্ মডেল, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রক্ষিত মৃত ও জীবিত জীব-জন্তু বা তাদের অঙ্গ বিশেষ, আরও কত শিক্ষণীয় বস্তু ও বিষয় এমনভাবে প্রদর্শিত রয়েছে, যাতে ক'রে শিশুরাও অনায়াসে তার রহস্য সহজে বুঝতে পারে।

ঐ দেখ, শিল্প ও বস্তু (Arts aud matters) বিভাগে আদিম অবস্থায় কি করে' আগুন জ্বালান হ'ত, আর তা কেমন করে রক্ষা করা হ'ত। তারপর হাজার হাজার বছর হতে এখন পর্য্যন্ত আগুন বা আলোর প্রয়োগ কি রকম ক্রমউন্নত হয়েছে, তা ধারাবাহিক রূপে দেখান হয়েছে। এই রকমে আদিম নৌকা, কাপড় বা পোষাক, খাদ্য, বাসস্থান বা ঘর, চিকিৎসা বিদ্যা, বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যান-বাহন ইত্যাদির ক্রমউন্নত অবস্থা ও স্বরূপ, শিক্ষার সুবিধা জনক ভাবে সাজান রয়েছে। এক এক দল শিশুর সঙ্গে দু' চারজন বিশেষজ্ঞ আছেন। এই সকল

দেখে দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা যতটুকু শিক্ষা পেতে পারে তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। এইভাবে দশ বছর বয়সের মধ্যেই শিশুরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য মোটামুটি আয়ত্ত্ব ক'রে খুব আনন্দ পায়, আর তাদের আরও জানবার প্রবৃত্তি বেড়ে যায়। ছেলেদের আগ্রহ ও আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে তোমার কেমন লাগছে।

লীনা। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। শিশুদের এত সহজে ও এত অল্প সময়ে মানুষের জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ে এমন সুন্দরভাবে অভিজ্ঞ করা যায় তা ধারণা করতে পারিনি। আচ্ছা! ঐ ছেলের দল কি করছে?

উ। ওরা শিক্ষা বিভাগের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র। এখানে ওদের চিন্তাশক্তি বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আদিম কাল হতে এখন পর্য্যন্ত মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান মানসিক উন্নতির ধারা বিশ্লেষণ করছে, আরও অনেক জটিল ও কঠিন বিষয়ের জ্ঞানান্বেষণ করছে, মনঃসমীক্ষণ বিদ্যারও অনুশীলন করছে।

লীনা। শিশুরা দশ বছর বয়েসের মধ্যে এত জ্ঞান কি ঠিক মত আয়ত্ত্ব করতে পারে?

উ। একশ বছর আগে কোন কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ ও মহিলা দশ বছর বয়সেই (কেউ ১২ বছর, কেউ বা ১৫ বছরের মধ্যে) তখনকার দিনের উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় প্রায় বহু বিষয়ে অনন্যসাধারণ জ্ঞান যে লাভ

করতে পেরেছিলেন, তা' মহৎ লোকের জীবনীতে তুমি পেয়েছ। ঐরকম কোন কোন স্থলে তাঁদের মা বাপ বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টা আর সেই সঙ্গে বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক ঘটনা পরম্পরার, আকস্মিক সুযোগ-লব্ধ জ্ঞানের বা শিক্ষার প্রেরণাই তাঁহাদের অসাধারণত্বের কারণ ব'লে বিবেচিত হত। ঐ সব ক্ষণজন্মারা যে কারণের যোগাযোগে তখন এত অল্প বয়েসে এমন অসাধারণ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন বৈজ্ঞানিক-ভাবে সেই সকল কারণ অনুসন্ধান করে এখন সকল শিশু বালক বালিকাকে ব্যাপকভাবে সেই যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

স্বভাবত 'কি', 'কে', 'কেন' ইত্যাদি অনুসন্ধিৎসা-ব্যঞ্জক প্রশ্নের দ্বারা নিয়ত সত্য জানবার প্রবৃত্তি নিয়েই শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয়। এই প্রবৃত্তি শিশুদের তৃতীয় ইনষ্টিংট বলা যেতে পারে। সেকালে তাদের এই প্রবৃত্তিকে চিরতরে ঘুচিয়ে দেবাব জন্য, কৌতূহল নিবারক শত শত নিরেট মিথ্যা দিয়ে শিশুদের কচি মনেই মিথ্যা অন্ধ-সংস্কার বদ্ধমূল করার কাজ সুরু হত। বড়দের মনেও ঐরকম মিথ্যা বহু অসাধ্য সাধনার দ্বারা বদ্ধমূল করাই তখনকার সর্ব্ববিধ শিক্ষা বা সাহিত্যের অন্তরনিহিত লক্ষ ছিল।

এই প্রকারে হাজার হাজার বছর ধ'রে শত শত

পুরুষ-পরম্পরা উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষের মনে এই বদ্ধমূল মিথ্যা সংস্কার সত্যের বেশে ইনিষ্টিংটে পরিণত হয়েছিল। এই মিথ্যা কুসংসস্কার মানব মনের মগ্ন আর সুপ্ত চেতনার গোপন স্তরে ইনষ্টিংট রূপে এত অধিক আধিপত্য বিস্তার করত যে তাদের প্রভাবে, জাগ্রত মন বৈজ্ঞানিক সত্য (যা উক্ত কুসংস্কারের বিপরীত) ঠিকমত গ্রহণ করতে না পেরে বিক্ষিপ্ত (disassociated) করে দিত। এইভাবে মনের একত্ব নষ্ট করত। অবিশ্যি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বা অন্য কোন স্বার্থ জন্য যা মুখস্থ করত, সাধারণত তা ঠিক মত জীবনের বা সমাজের কাজে লাগাতে পারত না।

গত আন্তর্জাতিক মহান রেভলিউসনের পর তিন চার পুরুষ অক্লান্ত অদম্য বৈজ্ঞানিক চেষ্টা আর বিশেষ করে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার ফলে, এখন সমস্ত গ্রহবাসীর জাগ্রত মনের সঙ্গে সুপ্ত আর মগ্ন চেতনার এই ভাবগ্রন্থি (complex) দুটির বিরোধ (confliect) একেবারে ঘুচে গিয়েছে। তার মানে মনের তিনটি স্তর একত্ব লাভ করেছে। Complex-এর প্রভাব আর নাই। প্রত্যেকের মন মানব সমাজের শুভেচ্ছায় যত মগ্ন হ'তে সুরু করেছিল, মানব সমাজের বিরোধী ভাব-গ্রন্থি সুপ্ত আর মগ্ন চৈতন্য তত অবদমিত হয়েছিল।

তা হলেই দেখ, মানব সমাজের বিরোধী এই মিথ্যা কুসংস্কার দ্বারা অধিকৃত সুপ্ত চৈতন্য আর মগ্ন চৈতন্যকে দমন ক'রে, জাগ্রত চেতনাকে (চিন্তাকে) সম্পূর্ণ অনধীন করবার একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায় হচ্ছে সমাজের শুভেচ্ছায় মনকে সর্ব্বতোভাবে মগ্ন করা। দল বা সমাজবদ্ধ হয়ে থাকাই মানুষের চতুর্থ ইনিষ্টীংট (Herd instinct)। তাহলেই দেখ, সমাজের শুভেচ্ছা করাই মানুষের অলঙ্ঘনীয় স্বভাব।

লীনা। আরও সহজ করে বল।

উঃ। বেশ কথা, সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই সত্যানুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জন্মের সঙ্গে ইনিষ্টীংট-রূপে পেয়েছে। ইহাই অন্য জীব-জন্তু হতে মানুষের বৈশিষ্ট। ইহাই মানবত্বার প্রকৃত লক্ষণ। আর ইহাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম। ইহার দ্বারাই মানুষ মানবোচিত জ্ঞান লাভ করে। জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই প্রবৃত্তি মানুষের মনে সমানভাবে কাজ করবে—ইহাই প্রকৃতির অভ্রান্ত বিধান।

কিন্তু শ্রেণী স্বার্থ জনিত সত্যরূপী মিথ্যার পথি-প্রদর্শক প্রভুরা পুরুষানুক্রমে ভূরি ভূরি মিথ্যা, শাস্ত্র, গল্প আদি বানিয়ে বানিয়ে সেকালে প্রায় সকল মানব মস্তিষ্ককে এমন আচ্ছন্ন বা যাদু করে ছিল যে, মানুষের সহজাত সত্যানুসন্ধিৎসার বদলে মিথ্যা প্রবণতা ও

অন্ধ সংস্কার ইনিষ্টিংটরূপে সুপ্ত আর মগ্ন চেতনায় বদ্ধমূল হয়েছিল।

তার ফলে সেকালে শৈশব হতে ছাত্র ছাত্রীরা বিদ্যালয় বা যে কোন স্থানে যে বৈজ্ঞানিক-সত্য শিক্ষা পেত, তার যা কিছু সুপ্ত আর মগ্ন চেতন মনের বিরোধী, তা পারিপার্শ্বিক চাপে প্রকৃত সত্য বলে ঠিক মত ধারণা করা কখনও সম্ভব হত না তাদের পক্ষে।

তা ছাড়া এত অবান্তর বিষয়, বস্তু, ভাব, ধারণা আদি জন্মের পর হইতে মানুষের মনে চিরাচরিতভাবে এমন আনন্দদায়ক করা হয়েছিল যে, প্রকৃত শিক্ষনীয় সত্যবিষয় হতে মন বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হত।

এখন সুপ্ত আর মগ্ন-চেতন মনের বদ্ধমূল কুসংস্কার অর্থাৎ মিথ্যাকে সত্যরূপে বিশ্বাস করাবার প্রচেষ্টা এখানে জাগ্রত মনে প্রভাব বিস্তার করে না। এখন সকলের জাগ্রত মন পূর্ণ অনধীন। তাই এখন সর্ব্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সত্য উপলব্ধি দ্বারা সকলে সর্ব্বক্ষণ প্রভূত আনন্দ আর তৃপ্তি উপভোগ করে। শিশু এবং বালকদের নিত্য নতুন কিছু সত্য দেখা, শোনা, চিন্তা করা একরকম নেশাতে পরিণত হয়েছে। এখন বুঝলে, দশ বছরে ছেলেরা এত বিষয়ে জ্ঞান আর এত রকম কাজ কিরূপে আয়ত্ত করে। সত্যানন্দই যে চরম আনন্দ

তা এরা সকলে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। সত্য আর মিথ্যার প্রভেদ 'ইনিষ্টিংটিভলি' ধরতে পারে। এইটি এদের শিক্ষা প্রণালীব সার্থকতা। ছেলে মেয়েরা দশ বছর বয়েসের মধ্যেই যাতে ঐরকম শিক্ষা অক্লেশে আয়ত্ত্ব করতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাব উন্নতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। রেভলিউশনের পর প্রথমে বিশ বছর বয়েসের মধ্যেও ঐরূপ শিক্ষা দে'য়া কষ্টসাধ্য ছিল। বোধশক্তি বৃদ্ধি আব সত্য উপলব্ধিতেই যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ ছেলেদের তা'তে আসক্তি বাড়াবার উপায় যেমন উদ্ভাবিত হ'তে লাগল, তেমনি শিক্ষার বয়েসও ক্রমে কমান হয়েছিল। এইভাবে বিশ বছর হ'তে ক্রমে ষোল, চৌদ্দ, বার, এখন দশ বছবে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাপকভাবে সমস্ত গ্রহবাসীদেব এত অল্প বয়েসে বোধশক্তি বাড়বার আর একটি কারণ, সমস্ত গ্রহে সর্ব্ববিষয়ে হঠাৎ রেভলিউশন সাধিত হওয়াতে, তার মঙ্গলময় অব্যর্থ প্রভাবে মিথ্যা অতীত গৌরবের নেশা, আর সেই নেশার আওতায় উদ্ভূত বহুকালের বংশ পরম্পরা অর্জ্জিত শারীরিক আর মানসিক আলস্যের বিলাস এবং অতীতের কলুষ কষায়িত দৃষ্টি ভঙ্গি আদি, এক কথায় 'কন্সারভেটিসম্' রূপ ব্যাধি হঠাৎ একেবারে ওধাও হয়ে গেছল। তার পরিবর্ত্তে হঠাৎ গজিয়েছিল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, আর তাতে সত্যান্বেষণের আনন্দময় অদমনীয় আবহাওয়া; কাজেই

এত অল্প বয়েসের মধ্যে এত জ্ঞান আয়ত্ত করা এত সহজ হয়েছে।

লীনা। ঐ বড় ছেলেরা ওখানে কি করছে?

উঃ। দশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত এরা যে শিক্ষা পেয়েছে, সতের বছব বয়েস অবধি সেই সকল ও অন্য নানা বিষয়িনী শিক্ষার উচ্চাঙ্গের অধ্যয়ণ গবেষণাদি করছে।

সতের বছরের পরে সকল ছাত্রকে তিন বছর যাবৎ এই গ্রহের আবশ্যক যাবতীয় শ্রমসাধ্য কাজ, প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কবিয়ে 'ডিগনিটি অব লেবারের' সার্থকতা উপলব্ধি কবান হচ্ছে। ছুটিব পর অবসর বিনোদন রূপে, পরবর্ত্তীকালে যে, যে-কাজ করতে চায় বা যার যে-কাজ প্রিয় সে সেই বিষয়ে শিক্ষানবিসের কাজ কবে। এইরূপে এক এক জন বহু প্রকাব কাজে বিশেষজ্ঞ হয়েছে। সমস্ত গ্রহে সার্ব্বজনীন সত্যকে ভিত্তি করে আর বিজ্ঞানকে সেই সত্য আবিষ্কারেব একমাত্র উপায় করেই শিক্ষা প্রণালাব প্রবর্ত্তন কবা হয়েছে। তাতে প্রত্যেকের চিন্তা যেমন সুদূর-প্রসাবী হয়েছে মনও তেমনি অনন্তের দিকে উন্মুক্ত হয়েছে।

শত বছর পূর্ব্বের তথাকথিত স্বদেশ প্রেমের দেশাত্ম বোধ, সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে এখন সমস্ত গ্রহের মানব প্রেমের একাত্ম বোধে পরিণত হয়েছে। আর প্রত্যেককে

তাতে অনুপ্রাণিত করছে। এখন এই গ্রহের সব দেশই প্রত্যেকের, প্রত্যেক দেশই সবার, প্রত্যেক দেশ প্রত্যেক সহর এখন প্রত্যেকের নিজ দেশ বা "হোম"।

লীনা। সেকালের সকল দেশের শিক্ষা-দীক্ষা বা শিক্ষা প্রণালী একরকম ছিল না কেন?

উঃ। সেকালে এই গ্রহ বহুদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দেশের স্বার্থও বিভিন্ন ছিল। রাষ্ট্রিক, সামাজিক আর্থিক, পুঞ্জী-তান্ত্রিক, আধ্যাত্মিক, ধর্ম্মতান্ত্রিক, শিল্প বাণিজ্যিক, সামরিক—এইরকম নানাবিধ স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনা বা উচ্চাকাঙ্খার মোতাবেক শিক্ষাই বিভিন্ন দেশে দেয়া হত। পরাধীন দেশের ত কথাই নাই।

প্রত্যেক দেশের প্রভু শ্রেণীর হাতেই সেই দেশের সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ন্ত্রণের এক চেটিয়া অধিকার ছিল। কাজেই জনগণ দাসত্বকে যাতে ভগবৎ বিধান বলে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে অথবা দাসত্ব ছাড়া অন্য পথ নাই বলে বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে সেইরূপ শিক্ষাই দেয়া হত।

যে দেশের দাসগণ দাস শব্দের মানে জানত না সেখানে শ্রেণীভেদ খুবই ছিল, কিন্তু শ্রেণী চেতনা বা শ্রেণী বিরোধ কি তা জানত না। শিক্ষা-দীক্ষার মতলব সেজন্য সকল দেশে সমান ছিল না। তাই শিক্ষার বিষয় আর প্রণালী বিভিন্নমুখী না হয়ে পারত না।

এখন এখানে শ্রেণীভেদ নাই, সবাই মিলে এক মানব জাতি। সকলের সকল রকম শিক্ষায় সমান অধিকার শুধু নয়, সকলে সকল রকম শিক্ষা লাভ করতে সেচ্ছায় বাধ্য। এ শিক্ষার মধ্যে কারো কোন কু-মতলব নাই। শিক্ষার বিষয় আর প্রণালী নিত্য উন্নততর হচ্ছে। আর এতে হচ্ছে মানব প্রেমের নিত্য শ্রীবৃদ্ধি।

দেশভেদে, জাতিভেদে আর শ্রেণী-স্বার্থ ভেদে, সেকালে উচিত অনুচিত বিচার শক্তি বা ন্যায় অন্যায় জ্ঞান হরেক রকম ছিল। সত্য মিথ্যার বিচারও বিভিন্ন রকমের ছিল, কাজেই কমনসেন্স বলে যে জোরাল একটা কথা প্রচলিত ছিল, অনেক স্থলে তা অতি মারাত্মক হ'ত। আত্মপ্রসাদ আর আত্মগ্লানি—এই দুটি কথারও বহু প্রচলন ছিল, কিন্তু কার্য্যত তার প্রভাব কিছুই ছিল না।

সেকালে মানুষকে দুষ্কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত করবার আর প্রবলের সুখ সুবিধার জন্য দুর্ব্বলের ওপর অন্যায় অত্যাচার করবার আইন কানুন বা বিধি ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে চালু রাখবার প্রধান উপায় ছিল ধর্ম্মের ভয় দেখান; আর দেখান পুলিশের, লোকলজ্জার বা নিন্দার ভয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ জন্য উক্ত ব্যবস্থাগুলি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। এখন শুধু মন্দ কাজ করে নয়, মানুষের হিতকর কাজ সাধ্যমত না

করতে পারলেও তীব্র আত্মগ্লানি, আর মানুষের হিত কায়-মনোবাক্যে সাধন ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য বিবেক বুদ্ধি, শিক্ষার প্রভাবে এমন নিখুঁতভাবে সমগ্র গ্রহবাসীর মনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যে, পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, পুলিশ বা লোক-নিন্দা আদির বিড়ম্বনা এখন আর এখানে নাই।

লীনা। একটা প্রশ্ন মনে জাগছে, বলব ?

উঃ। আনন্দের সহিত উত্তর দোব, বল।

লীনা। আচ্ছা, সেকালে উন্নত দেশগুলির বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দেয়া হত, এখানেও মূলত প্রায় সেই সকল বিষয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তবে এখানে এখন শিক্ষার বিষয় বস্তু অনেক উন্নত আর অভিনব হয়েছে; আর তা ক্রমে অনেক উন্নতভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে মাত্র। এক'শ বছরের পূর্ব্বের শ্রেষ্ঠ ইউনিভারসিটিগুলি, সমস্ত গ্রহ জুড়ে রেভলিউশন্ না সংঘটিত হ'লেও, ক্রমে উন্নতভাবে শিক্ষা দেবার ফলে ক্রমোন্নত হয়ে, এক'শ বছরে হয়ত এই রকম উন্নত হতে পারত। নয় কি ?

উঃ। যুক্তির খাতিরেই ব'লতে হচ্ছে, হয়ত হ'তে পারত যদি শ্রেণী-সংগ্রাম না থাকত। কিন্তু কার্য্য কারণ বিচার করে দেখ। বিশ্বে এরকম অসংখ্য গ্রহ আছে, যেখানে মানুষের চারিত্রিক অবস্থানুযায়ী উন্নতির ববস্থা বা ধারা বিভিন্নমুখী। কোন কোন গ্রহে বিশেষ কোন কার্য্য কারণ পরম্পরা ইভলিউশন্ থিওরী অনুযায়ী এ-রকম বা এ-থেকে অনেক

বেশী উন্নত হয়েছে। এখন দেখ, ঠিক এই গ্রহবাসীর সে কালের মত চারিত্রিক অবস্থাপন্ন একটি গ্রহ বিনা রেভলিউ-শনে একশ বছরে ঠিক এই গ্রহের এখনকার মত উন্নত হয়েছে, এমনত কল্পনা করতে পারছি না। এদের চরিত্র যে হীন স্বার্থসর্ব্বস্ব ছিল!

যাই হোক, ইভলিউশন প্রণালীর ক্রিয়া অন্য গ্রহে পরে প্রত্যক্ষ করতে হবে। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য এখানে এখন দু' একটা কথা বলে নিচ্ছি।

'রেভলিউশন' আর 'ইভলিউশন' তত্ত্বের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রেভলিউশন হঠাৎ সাধিত হয় বলে জনসাধারণের অলস, অব্যক্ত বা সুপ্ত আত্মশক্তি মিথ্যার বন্ধন মুক্ত হয়ে হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠে, তা' পরে দেখবে।

এই গ্রহের মানুষ-উৎপত্তির গোড়া হ'তে ইভলিউশন বা ক্রমোন্নতি বিকাশেব পথে, হাজার হাজার বছর ধ'রে, যুগে যুগে নানা প্রকারে (কখনও কখনও ব্যক্তি বিশেষের অনু-প্রেরণায়) দেশে দেশে কোন না কোন বিষয়ে (বিশেষ করে ধর্ম্মতন্ত্রের) আমূল কিংবা অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন দ্বারা খণ্ড রেভলিউশন সাধিত হয়ে আসছিল। তার ফলেই ইভলিউশনের কাজ কিছু দ্রুত সম্ভব হতে পেরেছিল; কিন্তু তা অনেকটা মন্দের দিকে।

যেখানে কোন কারণে মানব-সমাজে আকস্মিক, নৈসর্গিক ঘটনা বা মনুষ্যকৃত কার্য্য-কারণে উক্ত প্রকার

রেভলিউশন কখনও সংঘটিত হত না, সেখানে ক্রমোন্নতির গতি দ্রুত হয়নি বা আদৌ সম্ভব হয় নি। সেখানে ইভলিউশন অতি মন্থরগতি। শত বছর পূর্ব্বে এই গ্রহের অনেক আদিম জাতি এই কারণেই অতি আদিম অবস্থায়, অর্থাৎ 'দিন আনা দিন খাওয়া' উলঙ্গ অবস্থায় ছিল।

এই রেভলিউশনের কার্য্য বিশ্ববস্তু বা বিশ্ব জীবনের ক্রমোন্নতি, অর্থাৎ দ্রুত ইভলিউশনের কারণ। প্রথমটি শেষোক্তটির পরিপোষক বা পরিবর্দ্ধক।

কিন্তু এই গ্রহে সেকালে এইরূপ ক্রমোন্নতিব ফলে যত কিছু গড়ে উঠেছিল—যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, রাজ-নীতি, রাষ্ট্রতন্ত্র, ধর্ম্ম, ধর্ম্মতন্ত্র, দর্শন-সাহিত্য, শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি সমস্ত জনসাধারণকে ঠাকুরমার (ভেন গ্লোরির) কোলে তুলে দিয়ে কখনও বুকে থাবড়া মেরে, কখনও ঘুম পাড়ান ছড়া, রূপকথা আদি আওড়ে, আবার কখনও বা জোর জবরদস্তি করে, এমন কি চোখ টিপে ধ'রে ঘুম পাড়াবার কাজে লাগান হত। তার মানে উক্ত ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ করবার জন্য·সর্ব্বসাধারণকে কন্‌জারভেটিজম্ রূপ ব্যাধির কবলে তুলে দেয়া হয়েছিল। এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ কোন দেশে বেশী, কোন দেশে একটু কম ছিল। এ বিষয় অনেক কিছু পূর্ব্বে দেখিয়েছি, পরেও আবার দেখাব।

এখন দেখ, শত বছর পূর্ব্বে শিক্ষার প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যাপক উদ্দেশ্য কি ছিল, আর এখনকার শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তার তুলনা করলেই এই শিক্ষার নতুনত্ব কি তা ধরতে পারবে।

সেকালে ছিল উচ্চ নীচ শ্রেণী-সংগ্রাম বা সংঘর্ষ। বলতে পার শ্রেণী-সংগ্রাম কি নিয়ে? উচ্চ শ্রেণীর শ্রেণী-গত বা ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে! এই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যত রকম কুপ্রবৃত্তি মানুষের থাকতে পারে, সবই গজাত ভীষণ ভাবে। ইউনিভারসিটিতেও 'সু' এর খোলস পরে, কত 'কু' 'সু' বলে চলত। এইরূপ শিক্ষাতে মনুষ্যবিদ্বেষই ক্রমে প্রবল হচ্ছিল, আর হীন স্বার্থপরতা বাড়ছিল, (এই স্বার্থ-পরতার ব্যাখ্যা পরে দোব)।

রেভলিউশনের পরবর্ত্তীকালে শ্রেণীভেদের ধারণা সমস্ত গ্রহবাসীর মন হতে মুছে গিয়েছিল। এখন সাম্য আর প্রেমই এদের চিন্তার ভিৎ হয়েছে। এদের শিক্ষার প্রধান-তম লক্ষ্য হয়েছে সকল মানুষকে সত্যজ্ঞান আর জ্ঞানানন্দ দিয়ে মানব-জাতির দুঃখ-দৈন্যের অবসান করা। এই তুলনা-মূলক সত্যের ঠিকমত ধারণা করতে পারলেই সেকালের মানব-সভ্যতার রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে।

লীনা। পেরেছি বলেই ত এখন মনে হচ্ছে। সেকালে শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, চিন্তা, ধারণা আদি মানুষের যত কিছু সবই, উচ্চ শ্রেণীর হীন স্বার্থকে ভিত্তি করে গড়ে

উঠেছিল। আর এখনকার শিক্ষা আদি যত কিছু গড়ে উঠেছে, পরার্থপরতা ও সার্ব্বজনীন প্রেমকে ভিত্তি করে। এখনকার শিক্ষার আদর্শ রেভলিউশনের আগেকার শিক্ষার আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই গ্রহের সার্ব্বজনীন রেভলিউশন ব্যতীত এখনকার মত আদর্শে শিক্ষা, একশ বছর কেন, হাজার বছরেও যে গড়ে উঠত না, তা এখন বুঝলাম। আর দেখ, সন্দেহসূচক প্রশ্ন করেছিলাম—

উঃ। হাঁ। তা করেছিলে ব'লেই অপ্রিয় সত্যের ঘোমটা একটু বেশী ক'রে খুলে ফেলেছি। আবার তোমার সেন্টিমেণ্টে—

লীনা। না, তা লাগেনি। এখন ক্রমে ঘোমটা খোলা সত্যই আমার আনন্দদায়ক হচ্ছে। এই গ্রহ অপেক্ষা আরও উন্নততর গ্রহ দেখবার বাসনা হচ্ছে।

আচ্ছা, যা বলছিলে বল।

উঃ। এ রকম মহান্ রেভলিউশনের ঠিক পূর্ব্বেকার আনুষ্ঠানিক অবস্থায় এসেছে, এমন একটি সদৃশ গ্রহে, গ্রহবাসীদের কর্ম্মপন্থা দেখবার আগ্রহ তোমার জাগছে না?

লীনা। খুবই ত জাগছে। কিন্তু তার আগে অনেক সদৃশ গ্রহে অনেক কিছু দেখাবে বলে যে কথা দিয়েছ।

উঃ। তা ঠিক, এখানে এখনও অনেক কিছু দেখাবার আছে। তোমাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে।

লীনা। এখন বল।

উঃ। জনসাধারণ উন্নতির পথে আবার না ঘুমিয়ে পড়ে—চির জাগ্রত থেকে স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট মানবতার অনন্ত উন্নতি, তথা ইভলিউশনের পথে বাধা-বিমুক্ত হয়ে মিলিত ভাবে এগিয়ে যাবার মত জ্ঞান অর্জ্জনও বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য।

এই সকল লক্ষ্যে পৌঁচবার জন্য বিশেষভাবে যে সকল শিক্ষা দেয়া হয়, তার প্রধান হচ্ছে সন্দেহবাদ বা স্কেপটিসিজম যা সেকালের ভক্তিবাদের বিপরীত। সন্দেহ অনুসন্ধানের প্রেরণা মনে জাগায়। রীতিমত অনুসন্ধানের ফলেই সত্যের আবিষ্কার, যা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয়। ভক্তিবাদ অন্য সদৃশগ্রহে দেখাব। তখন দেখবে সেকালে বিজ্ঞান শিক্ষা ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেয়া হত না ব'লে, শতকরা দু'দশ জন ছাড়া ভক্তিবাদের সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত বৈজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যাপক-ভাবে যে গড়ে উঠত না, তার কারণ ভক্তিবাদের আওতায় বোধশক্তি বা চিন্তাশক্তির সুদূর প্রসার বা বিস্তার সম্ভব হত না।

এখন এখানে বোধশক্তি আর চিন্তাশক্তি বাড়াবার প্রণালী (Method of understanding and thinking) শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, দেখ। এই গ্রহের সমস্ত বালক-বালিকাকে আশৈশব, প্রত্যেক বিষয় আর বস্তু সম্বন্ধে

প্রচলিত যে কোন ধারণার প্রতি সন্দেহ করতে, স্বাধীন চিন্তা দ্বারা তা যথারীতি অনুসন্ধান করতে, অনুসন্ধানের ফলে সত্য আবিষ্কার করতে, (এমন কি, শিশুদিগকেও নার্স আর শিক্ষয়িত্রীরা) কেমন সুন্দরভাবে শেখাচ্ছে দেখ। এতে প্রত্যেকের বিচার-বুদ্ধি, ভালমন্দ জ্ঞান, আর দৃষ্টিভঙ্গী কেমন বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য দর্শনোপযোগী হচ্ছে দেখছ ত!

গত মহান্ রেভলিউশনের আগে এই গ্রহটী কেমন ছিল! তার নানা জাতিব হরেক রকম সনাতন আর অপবৈজ্ঞানিক সভ্যতা, তার সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যের রূপ দেবার বহুবিধ কৌশল, তার প্রতিক্রিয়া-জনিত খণ্ড-রেভলিউশন, আবার তার প্রতিক্রিয়া. শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের সংঘর্ষ, এক ক্ষুদ্র শ্রেণীর প্রাচুর্য্য বনাম অন্য সুবৃহৎ শ্রেণীর দারিদ্র্য, এক শ্রেণীর প্রভুত্ব বনাম অন্য শ্রেণীর দাসত্ব ইত্যাদির প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই মিউজিয়ামে কেমন সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রদর্শিত রয়েছে একবার প্রণিধান করে দেখ।

লীনা। সেকালেও নানা দেশে বহুবিধ বিশাল মিউজিয়াম আর লাইব্রেরী ছিল নাকি—

উঃ। ঐ যে! সেই রকম বিশেষ বিশেষ মিউজিয়াম, লাইব্রেরী আদিও এখানে এনে রাখা হয়েছে। এর প্রত্যেকটীতে আরও বহু নিদর্শন সংযোগ করা হয়েছে।

যে সকল প্রদর্শনীয় বিষয়বস্তু, স্থান, ঘটনা আদি এনে রাখা সম্ভব হয়নি, এমন সবকিছুর ভাব বা প্রভাব আদি ব্যক্ত করবার মত নিখুঁত চিত্র, প্রতিকৃতি, প্রতিরূপ আদি, নিদর্শন রূপে প্রদর্শিত হয়েছে। এইটীর নাম 'ভেন গ্লোরী মিউজিয়াম'; অন্য একটি বড় সহরে আছে 'শ্রেণী-সংগ্রাম মিউজিয়াম'। এই রকম রয়েছে স্বার্থ-সংঘর্ষের মিউজিয়াম, আধ্যাত্মিকতার মিউজিয়াম ইত্যাদি।

ঐ প্রকারের প্রত্যেক মিউজিয়ামের অন্তর্গত লাইব্রেরীগুলিরও এই রকম নামকরণ করা হয়েছে। লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামের প্রত্যেক বিভাগে অনেকগুলি 'সিসিরোন' বা বিশেষজ্ঞ প্রদর্শক আছে, তবুও প্রত্যেক বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞানসঙ্গত বিবরণ দে'য়া রয়েছে। প্রত্যেক বিভাগে আবার সিনেমা, টকি, স্পেক্‌ট্রোস্কোপ আদির সাহায্যে আরও সুন্দর মনোরম করে সেকালের অনেক কিছু দেখান হচ্ছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সমাপ্তির পর আঠার বছর বয়স হ'তে মাঝে মাঝে এই সকল সনাতন মিউজিয়াম, তীর্থ স্বরূপ অনেকে পর্য্যবেক্ষণ করে থাকে। আঠার বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্তির পর সত্যমিথ্যার প্যাঁচ বোঝবার উপযুক্ত শক্তি জন্মে।

লীনা। এই সব দেখে শুনে সে কালের সনাতন সভ্যতার রহস্য বুঝলাম। আর বুঝলাম সেকালে মানুষ

চলত, শতকরা নব্বই ভাগ অন্যের সাজেশ্চান (suggestion) মত। আবার এই অন্যেরা তাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যের সাজেশ্চানে চালিত হত। এইরূপে সনাতন সভ্যতার পথে চলে আসছিল গড্ডলিকা প্রবাহ। ঠিক মত বৈজ্ঞানিক যুগ যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে মানুষ ঐ সাজেশ্চানকে যাচাই করতে শিখ্‌ছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সত্য জ্ঞান লাভ ক'রে, সেই সত্যের প্রেরণায় ক্রমে প্রকৃত সভ্যতার পথে চলতে শিখছে। আচ্ছা, এখন অন্য কিছু দেখাও।

উঃ। আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু এই বিশাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অল্পই দেখা হয়েছে। সমস্ত দেখলে, আর যাই হো'ক, এই গ্রহে সার্ব্বজনীন সাম্যবাদ সাফল্যের পথে কেমন করে এত এগিয়েছে তা বুঝতে সহজ হত।

লীনা। সে এখন পরে হবে। আগে অন্য সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা মোটামুটি ধারণা করতে চাই। তারপর আবার প্রথম থেকে বিশেষভাবে দেখতে সুরু করব।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

উঃ। আচ্ছা! রাজ্য, রাষ্ট্র, দেশ বা ষ্টেট্ বলতে যে ধারণা তোমার মনে জাগছে, সে রকম কিছু আর এখন নাই। এখন এই গ্রহটীর বড় ছোট ভৌগোলিক অংশ-বিশেষকে নতুন নতুন নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সমস্ত গ্রহবাসীর মধ্যে যখন এক ভাষা, এক ভাবধারা গড়ে উঠেছে, তখন দেশ, রাষ্ট্র বা পাত্রিয়া (Patria- পিতৃভূমি) আদির ধারণা আর নাই। দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, শ্রেণী আদির স্বার্থের বিরোধও আর নাই! সমস্ত গ্রহ জুড়ে এক বিবাট মানব জাতি। যে মহাপুরুষের অভূতপূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই রেভলিউশনের কাজ সুরু হয়েছিল, তাঁরই নামে এই গ্রহটীর নামকরণ করা হয়েছে; সেই রেভলিউশনকে যাঁরা সাফল্য-মণ্ডিত করেছিলেন, তাঁদের নামে কবা হয়েছে অন্য অনেক স্থানের নামকরণ। এখন মানুষ আদি শব্দের পরিবর্ত্তে যে মহান্ শব্দ ব্যবহৃত হয় তাব মানে শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ, মানব-মানবতা প্রভৃতি বহু শব্দের মত প্রপাগ্যাণ্ডা-সুলভ শব্দ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা-সূচক বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। (মনুর অপত্য—মানব ?)

সেকালে এই গ্রহের ছোট বড় সব দেশে নানা প্রকার শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। তার বাহ্য স্বরূপে ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলার বহু বিঘোষিত চটকদার ছাপ, কিন্তু অন্তর্নিহিত রূপ ছিল জাতিতে জাতিতে, জাতির মধ্যে ; সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, সম্প্রদায়েব মধ্যে ; শ্রেণীতে শ্রেণীতে, শ্রেণীর মধ্যে; ঘরে ঘরে, ভাইতে ভাইতেও হিংসা, বিদ্বেষ, মিথ্যা, প্রতারণা, শোষণ, পীড়ন, মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় বলা যেতে পারে শ্রেণীগত স্বার্থের বিরোধ। হাজার হাজার বছর যাবৎ কতশত

মহাপুরুষের কতশত রকমে প্রচারিত ভ্রাতৃপ্রেম, ভ্রাতৃভাব, বিশ্বপ্রেম, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', আরও কত কি বচনের দ্বারা মানুষের মধ্যে সাম্যভাব আনবার চেষ্টা যে জন্য ব্যর্থ হয়েছিল, তা হচ্ছে আর্থিক স্বার্থের অসাম্য-উদ্ভূত প্রতিযোগিতা বা শ্রেণীসংগ্রাম।

লীনা। আধিপত্যেরও প্রতিযোগিতা ছিল নাকি?

উঃ। ঠিকই বলেছ, আধিপত্যও মানুষেব অন্যতম প্রধান কাম্য। আধিপত্য বা ক্ষমতালাভের প্রধানতম উপায় ছিল অন্যের অপেক্ষা অধিকতর আর্থিক সম্পদ্ লাভ করা—তা যেমন করেই হোক্। আবার আধিপত্য বিস্তার করতে পারলেই ধনাগম সহজ হ'ত। ধনাগম যেমন হ'তে থাকত, আধিপত্যও তেমনি বাড়ত। সেকালের এই দু'টী কাম্য পরস্পর আপেক্ষিক হলেও মূলে ছিল অর্থজনিত স্বার্থেরই প্রাধান্য। এখানে এখন অর্থের ব্যবহার নাই, আধিপত্যেরও প্রতিযোগিতা নাই শ্রমসম্ভূত সম্পদ্ বিপুলভাবে আছে, কিন্তু তা সার্ব্বজনীন, তার প্রতিযোগিতা নাই; সমান বা যথেচ্ছভাবে সকলে সর্ব্বসম্পদ্ ভোগ করে। সহজে সুন্দররূপে এই ভোগের ব্যবস্থা করে সমবায়-সমিতি। অন্য কোন শাসনতন্ত্র বা গভর্ণমেণ্ট এখানে নাই। এইরূপে এই গ্রহের অখণ্ড সমাজ-বদ্ধ মানবজাতি সাম্য, মৈত্রী, লিবার্টির পথে নির্ব্বিরোধে এগিয়ে চলেছে—সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার

ফলে। (জীব উৎপত্তির প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে 'সাতের' সম্বন্ধ রহস্য-জড়িত)।

প্রত্যেক সহরে এক একটি শাখা-সমবায়-সমিতি। কতকগুলি শাখা-সমিতি মিলে এক একটি বৃহত্তর সমিতি। সমস্ত বৃহত্তর সমিতির ওপর কেন্দ্রীয় সমিতি, সকল বিষয়ে সকল সমিতির যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রত্যেক সমিতির অনেকগুলি বিভাগ আছে; যেমন শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, ষ্টোর, শ্রম, বণ্টন ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমস্ত সমর্থ স্ত্রী-পুরুষকে 'কর্ম্মী' বা শ্রমিক বলা হয়। এখানে আছে পরার্থে কর্ম্মকুশলতা এবং জ্ঞানের নির্ব্বিরোধ প্রতিযোগিতা, কিন্তু এ'তে নাই অন্যকে ছোট ক'রে, অক্ষম মূর্খ ক'রে রাখবার উপায়। কাজেই এরকম প্রতিযোগিতায় অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ-আদির স্থান নাই। প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী হতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এইরূপে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে। এই প্রকারে জ্ঞানের ভাণ্ডার ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে। সকলের পক্ষে জ্ঞানের পথ যেমন উন্মুক্ত তেমনি সুগম হয়েছে।

সকল কর্ম্মীর কর্ম্ম ও কর্ম্মস্থান এমন আরামদায়ক করা হয়েছে যে, কর্ম্মিগণ কর্ম্মে আসবার জন্য অন্তরে আগ্রহ অনুভব করে। এসব তোমাকে আগে দেখিয়েছি।

সেকালের সব দেশের উচ্চশ্রেণীর আদৃত উৎকৃষ্ট খাদ্য, পোষাক, বাসগৃহ, আসবাব আদি যাবতীয় ভোগ্য সামগ্রী অপেক্ষা এখন এই গ্রহবাসী সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্নততর অথচ বিজ্ঞান-সম্মত খাদ্য ও আরামদায়ক ব্যবহার্য্য বস্তু প্রচলিত হয়েছে। অনেক জিনিষ, কাজ ও কার্য্য-সাধন-উপায় বা 'পলিসি' অনাবশ্যক ব'লে প্রচলন বন্ধ হয়ে গ্যাছে।

এখন সমস্ত গ্রহের যা কিছু যেখানে আবশ্যক তার জন্য বছরে যত শ্রম লাগে, তা গ্রহের সকলকে ভাগ করে দিলে, যে কয়ঘণ্টা প্র্যত্যেককে প্রত্যহ কাজ করতে হয়, 'রেভলিউসনের' ঠিক পরে তার পরিমাণ ছিল দিনে 'আট' থেকে 'দশ' ঘণ্টা। ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়ছে, আর শ্রম লাঘব ও শ্রম আরামদায়ক করবার জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও যন্ত্রশক্তি দ্রুত ক্রমবর্দ্ধিত হচ্ছে। তাই এখন দৈনিক সব রকম শ্রমের ব্যবস্থা ৪ ঘণ্টা হয়েছে।

কিন্তু অনেক কর্ম্মী স্বেচ্ছায় অনেক বেশীক্ষণ কাজ করে। বছরে তিন মাস ছুটির ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছা করলে বা আবশ্যক হলে আরও বেশী ছুটি পায়। কর্ম্মী বা শ্রমিক শব্দ সম্মানসূচক বলে পরিগণিত হয়। সকলে স্বেচ্ছায় আনন্দে কাজ করে।

লীনা। শ্রম কেন করে? ক'রতে আদিষ্ট হয় ব'লে

করে, না এর কোন 'মরেল' (Moral) বা বৈজ্ঞানিক 'ওব্লিগেশন' (obligation) আছে?

উঃ। আছে বৈকি! এই গ্রহবাসী প্রত্যেক নরনারী জানে, তাদের খাদ্যের বা অন্য কোন কিছুব কণামাত্র প্রস্তুত বা উৎপন্ন করতে মানুষের উৎপত্তি হ'তে এখন পর্য্যন্ত, মৃত জীবিত যত মানুষ জন্মেছিল বা জন্মেছে, কোন না কোন ভাবে তাদের কিছু না কিছু মানসিক বা শারীরিক শ্রমশক্তি তা'তে নিয়োজিত হয়েছে। হঠাৎ বছর কতকের জন্য এই গ্রহে এসে বহু হাজার বছরের মানব সঞ্চিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের সাহায্যে মানুষ, মানুষোচিত জ্ঞান ও জীবনোপাদান লাভের ফলে সেকালে শুধু সভ্যতার গর্ব্বই করত। এখন এরা কিন্তু সেই সাহায্যকে ঋণ বলেই স্বীকার করে।

মানবজাতির এই ঋণ শোধ করা প্রত্যেক মানুষ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করে। ইহাই এদের অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম। এই ঋণ শোধের প্রধানতম করণীয় হচ্ছে মানব-জ্ঞান-ভাণ্ডারে যথাসাধ্য নতুন কিছু জ্ঞান যোগান দে'য়া অথবা মানুষের স্থায়ী হিতের জন্য বিশেষ কিছু করা। এ ছাড়া এই ঋণ প্রতিদানের অমল অনন্দই এখানে মানুষের চরম আনন্দে পরিণত হয়েছে। এই আনন্দানুভূতির সাড়া পেয়েছে বলেই অপরের কাজে প্রত্যেকের এত আগ্রহ। এও সেই আত্মপ্রসাদ যা আগে

তোমায় বলেছি। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করতে পারে এই গ্রহের প্রায় চারশত কোটি লোকের মধ্যে সে ছাড়া, বাকী এক কম চারশত কোটি লোক, তার হিত-সাধনে কৃতনিশ্চয়। কাজেই দেখছ, এই ধরনের 'মরেল ওব্লিগেশন' এর মধ্যে 'ডগমা' নাই, প্রতারণা নাই, আছে সত্য সহজবোধ্য নৈতিক বা বৈজ্ঞানিক যুক্তি। এই ঋণ যে না শোধ করে সে লোক-মতে অশ্রদ্ধেয় হয় আর বিবেকের দংশন জ্বালা অনুভব করে। কাজেই ঋণ শোধের জন্য স্বেচ্ছায় সকলে প্রাণপণ করে।

এখানে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর সম্ভব নয় ব'লে টাকা পয়সার চলন, হীরা জহরত, সোনা দানা, গয়নাগাটি প্রভৃতি অহেতুকী সকল বস্তুর ব্যবহার কয়েক বছর আগে একেবারে বন্ধ হয়েছে।

এখন পোষাক-পরিচ্ছদ আদির ফ্যাসান কোন কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে চালাবার চেষ্টা করে। অনেকের মতে তা সঙ্গত বিবেচিত হলে গৃহীত হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ সেলাই ছাটা কাটা হয়ে না। পোষাক, কাপড়ের কোন কিছু, চাদর, পর্দ্দা, ওয়াড়, টুপি আদি যন্ত্র সাহায্যে ছাঁচে ঢেলে জমান হয়। কোন কিছু ধোপার বাড়ী দিতে হয় না বা সারাতে হয় না। একটু ময়লা হলেই কারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাঠিয়ে দে'য়া হয়, দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে নতুন তৈরী পোষাক ফিরে

আ'সে। বালিশ, তোষক, গদি আদি হাওয়া পোরা হয়।

লীনা। ছাতা, জুতো আদিও কি ছাঁচে তৈরী হয়?

উঃ। ছাতার দরকার প্রায় হয় না। সকল রকম বর্ষাতি বা মৌস্‌মী পোষাক তৈরী হয়। টুপির দ্বারা রোদ নিবারণ হয়। জুতোও ছাঁচে ঢালা হয়। জুতো খুব হাল্‌কা, নরম, সহজে নোংরা লাগে না, ভিজে না, সহজে পরা খোলা যায় এবং পায়ের আয়ামদায়ক ক'রে ছাঁচে ঢালা হয়। গরম আবহাওয়াতে পোষাক, জুতো, টুপি আদি সব সাদা, আর যত অধিক ঠাণ্ডা আবহাওয়া, তত অধিক, ঐ'সব গাঢ় রং-এর হয়। সেই রকম আবহাওয়া অনুযায়ী তূলোর মত বহুবিধ আঁসে বৈজ্ঞানিক রেশমে ও পশমে তৈরী পাতলা মোটা গরম ঠাণ্ডা নানা বকমের পোষাক, চাদব আদি ছাঁচে ঢালা হয়। পুরুষ আর স্ত্রীলোকের পোষাকে পার্থক্য অতি সামান্য মাত্র।

বাসন-কুশন, রান্নার হাঁড়ি-কুঁড়ি ধুতে মাজতে হয় না। কারখানায় পাঠালে নতুন হয়ে আসে। টেবিল, চেয়ার, খাট, পালঙ্ক, আলমারা আদি সমস্ত যা আগে কাঠে তৈরী হ'ত, তা এখন অনেক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত হয়; এত মসৃণ ও শক্ত যে, তা'তে ময়লা ধরে না, সহজে ভাঙ্গে না, অথচ হাল্‌কা এবং সুন্দর, মশারি আবশ্যক হয় না।

এখন বাড়ী ঘর, বিছানা আসবাব, যানবাহন, আলো, ফোন, জল, শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসা, শিশুপালন, টেলিগ্রাফ টেলিভিজন, ইলেক্‌ট্রোস্কোপ, বেতার, রেডিও, টকী, ফোনোগ্রাফ, গ্রামোফোন আদির নানাবিধ সুব্যবস্থা বিনা মূল্যে সর্ব্বসাধারণের অনায়াসলভ্য। খাওয়া পরা আর অন্যান্য ব্যক্তিগত খরচ জন্য বছরে একখানা টিকিটের বই প্রত্যেককে দেওয়া হয়। সমবায় সমিতির ষ্টোর হতে আবশ্যকবস্তু ঐ টিকিটের বিনিময়ে সহজে সকলে পায়। টিকেট হস্তান্তর করা যায় না বা করে না। বছরের শেষে উদ্বৃত্ত টিকেট ফেরৎ দিয়ে বছরের প্রথমে আবার নতুন টিকেটের বই আনে। কারো অতিরিক্ত টিকেট, সঙ্গত কোন বিশেষ কাজের জন্য আবশ্যক হলেই পায়। প্রেম নিবেদন জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় না। প্রত্যেকে যা করে তা সর্ব্বসাধারণের কাজে লাগবে বলেই করে। কোন কিছুর নেশা কারো নাই। কয়েক প্রকারের স্বাস্থ্যকর সুমিষ্ট সুগন্ধ অতি মৃদু উত্তেজক মদের প্রচলন বিশেষ করে শীত-প্রধান দেশে হয়েছে; বিনা টিকেটেই মিলে। নানা প্রকারে ব্যবহৃত সেকালের তামাক, পান, সুপারী, আদির বদলে কয়েক রকম লজেঞ্জের চলন হয়েছে। কফি, চা, সোডা ও অন্যান্য নতুন পানীয় অনেকে পান করে।

নতুন নতুন কাজ ও ব্যবহার্য্য বস্তু যেমন বাড়্‌ছে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি কলকারখানাও তেমনি নিত্য বাড়্‌ছে।

সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের মান, সেই দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য শ্রমের অনুপাতে নির্দ্ধারিত হয়। দ্রব্য সরববাহ, সংগ্রহ, বণ্টন-টিকেট আদি নিয়ন্ত্রণ জন্য প্রত্যেক সহরের শাখা সমবায়-সমিতির 'কমিসারিয়েট' ষ্টোর আর সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। যত কিছু উৎপন্ন বস্তু ও শ্রমের হিসাব, এ সকল ব্যাঙ্কে প্রকাশ্য ভাবে রাখা হয়। ব্যাঙ্ক, ষ্টোর প্রভৃতির হিসাবপত্র রাখা যেমন সহজ তেমনি সহজবোধ্য এবং সর্ব্বসাধারণের দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বসাধারণ, ভোটের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞ, কারণ এরা জানে প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য কি ?, সেকালে গ্রহের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ইউনিভারসিটির সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিতদের অপেক্ষা এখনকার সর্ব্ব-সাধারণের প্রায় প্রত্যেকে, সর্ব্ব বিষয়ে অনেক অধিক জ্ঞান লাভ করেছে। আর লাভ করেছে সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। সুতরাং সমবায় আদি সমিতির অন্তর্গত সমস্ত বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাগণ প্রত্যেক সমবায় সমিতির এলাকায় সকলের ভোটে আগে সঙ্গতভাবে নির্ব্বাচিত হত। এতে প্রার্থী মনোনয়ন প্রভৃতির চালাকী বা দলাদলির হাঙ্গাম ছিল না। ভোট কেনা বেচা, প্রার্থীদের হ্যাংলামী, ঘুষ, প্রতারণা আদির যে দরকার হত না তা বুঝতেই পারছ!

এখন আর ভোটেরও দরকার হয় না। পূর্ব্বেই দেখেছ এক এক জন অনেক বিষয়ে কি রকম অভিজ্ঞ হচ্ছে।

কাজেই কোন কাজে উপযুক্ত লোকের এখন আর মোটেই অভাব হয় না। এখন বিশেষ আর সাধারণ সকল কাজে অভিজ্ঞ কর্ম্মী, অবসর বা ছুটী নিলে, তার সেই কাজেরই সহকর্ম্মী, সেই কাজ সমান নিপুণতার সহিত চালায়। আসল কথা, কেউ কোন কাজকে উঁচু নীচু বা ভাল মন্দ মনে করে না। তুমি দেখেছ ডিগনিটি অব লেবার কেমন সুন্দরভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এখানে কম বেশী মাইনের ল্যাঠা নেই সকলের কাজের মর্য্যাদা সমান।

কোন কোন কাজে হেড্‌ম্যান এখনও আছে। তার আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব করবার সুযোগ সুবিধা জুটেনা, সকলে সমান অভিজ্ঞ। তাই হেড্‌ম্যান সকলকে সমান মর্য্যাদা দিতে বাধ্য হয়, সকলে বন্ধু ভাবে পরামর্শ ক'রে সকল কাজ করে। ফলত এখানে কোথাও 'সুপিরিয়রিটী' বা 'ইনফিরিয়রিটী' 'কম্‌প্লেক্স'-এর ধারণা নাই, আর নাই কোন রকম শ্রেণী সঙ্ঘর্ষ।

সেকালে যেখানে সদস্য, সম্পাদক, কর্ম্মকর্ত্তা, সভাপতি আদি নির্ব্বাচন জন্য ভোটের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে দলাদলি গালাগালি, মারামারি, মিথ্যা, প্রতারণা, শত্রুতা, হার্ট বার্নিং, হার্ট ফেলিং আদিও ঘটত। এই রকম আরও কত কি! সেকালে এই গ্রহবাসী প্রায় সকল ভোটার, ভোটের মূল্য কি তা জানত না অথবা অনেকে তা জানলেও তার অপব্যবহার করত।

সেকালে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রেণী-সংগ্রামে নিম্নশ্রেণী ভোটারগণের সংখ্যা উচ্চ-শ্রেণী অপেক্ষা বহুগুণ অধিক ছিল। সংখ্যা-গরিষ্ঠ নিম্নশ্রেণী ভোটের সদ্ব্যবহার ক'রে, সংখ্যা-লঘিষ্ঠ উচ্চশ্রেণীর তাবেদারী বা দাসত্ব-মুক্ত হবার কল্পনাটুকুও করতে পারত না। অবশ্য ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করতে নিম্নশ্রেণী যা'তে না পারে, তার বহুবিধ বিধিব্যবস্থা বা 'সেফ্‌গার্ড' রেখে তবে তথাকথিত ডেমক্রেসী বা ভোটাধিকার দিয়ে বাধিত করা হত।

এখন এখানে কোন কাজে কর্ম্মী নির্ব্বাচন জন্য ভোট্‌ গ্রহণের আর আবশ্যক হয় না। সকলেই অভিজ্ঞ কর্ম্মী। এক কাজ হতে অন্য কাজে বদলি অথবা নিয়োগ নির্ব্বিবাদে স্বেচ্ছায় হয়ে থাকে। কোথায় কি রকম কর্ম্মী আবশ্যক বা কোন কর্ম্মী বদলী চায় তা নিত্য গেজেটে ঘোষণা করা হয়।

মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা জন্ম-সংখ্যা এখন অধিক, তাই লোকসংখ্যা বাড়ছে। নিত্য নতুন কাজের বিভাগ আর কারখানা আদি খোলা হচ্ছে। ছুটীর দিন বাড়ছে, আর কোন কোন কাজের সময় কমছে।

প্রত্যেক সমবায়-সমিতি হ'তে বিধিব্যবস্থাদির একখানা গেজেট, এবং সমস্ত গেজেটের সার সংগ্রহ ক'রে, কেন্দ্র সমিতি হতে একখানা বৃহৎ গেজেট বাহির হয়, এছাড়া

নানা বিষয়ে অনেক সাময়িক পত্রিকা আছে। তা'তে বাদ প্রতিবাদ, আলোচনাদির ত্রুটি হয় না। সমস্ত গ্রহবাসীর ভাব আদান-প্রদানের জন্য, যে সকল সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে, তা আগে তোমায় দেখিয়েছি।

বিরাট সমর আয়োজন, পুলিশ, বিচার, ব্যাঙ্ক, বিমা, কাষ্টমস্, ট্যাক্স, শিল্প-বাণিজ্য আদি হরেক রকম বিভাগ, শাখা অফিস আদি, যা সেকালে মানুষের গলগ্রহ ছিল, তার আবশ্যক এখন আর নাই। মিথ্যা চুরি, প্রতারণা, ডাকাতি, নরহত্যা, ব্যভিচার, রাজদ্রোহ, রাজ্য আক্রমণ, নগর লুণ্ঠন আদি নিত্য কত শত রকমের অন্যায় অত্যাচার ইত্যাদি মানুষের প্রতি মানুষের অপরাধ সংঘটনের আবশ্যকতা, সুযোগ অথবা কুপ্রবৃত্তি জাগবার মত হেতু আর এখন নাই। চৌদ্দটা সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ার পর জনমত সম্পূর্ণ কুসংস্কার বর্জ্জিত আর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে।

এই এক শ' বছর যাবৎ মনঃসমীক্ষণ বিদ্যার কল্যাণে পরার্থপরতার অনুশীলন দ্বারা, মিথ্যাকে সত্য, আর সত্যকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস আর ভক্তি করবার বৃত্তি বা ব্যাধি মনের সুপ্ত আর মগ্নচেতন স্তরে সম্পূর্ণ ভাবে অবদমিত (repressed) হয়েছে।

তবু এখনও প্রত্যেক সমবায় সমিতির এলাকায় একটা ক'রে বিচারালয়, ধর্ম্মাধিকরণ নামের সার্থকতা

সম্পাদন করছে। মনঃসমীক্ষণ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ তিনজন বিচারক সেখানে থাকেন; উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার আদির হাঙ্গামা নাই। আসামী অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাদের চিকিৎসালয়ের মনঃসমীক্ষণাগারে পাঠান হয়। সেখানে অপরাধীর অপরাধ-প্রবণতার উৎস বা কারণ খুঁজে বার করা হয়। তখন তাদের কুমতিকে সুমতিতে পরিণত করা সহজ হয়। লোকে ঐ সকল অপরাধীদের প্রতি করুণার ভাব দেখায়। ইহাই দণ্ডের কাজ করে। অন্ধ, কালা, বোবা আদি বিকলাঙ্গদের জন্য ঐ মনঃসমীক্ষণাগারে একটা বিশিষ্ট বিভাগ আছে।

রেভলিউশনের পর প্রথম প্রথম যতগুলি অপরাধ বছরে সংঘটিত হত, তার অধিকাংশই কর্ম্মকুশলতার প্রতিযোগিতাজনিত। অন্যের চেষ্টা বা গবেষণার সাফল্য আর এক জন কোন রকমে নিজের ব'লে দাবী করত। এই রকম আরও কত কি। তখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি ঠিক মত লোকে আয়ত্ত করতে পারে নি, সত্যে নিষ্ঠাও তেমন জাগে নি। এখন কোন রকমের অপরাধে অপরাধী প্রায় নাই বললেই হয়।

নতুন কোন কাজে প্রেরণা লাভের জন্য অতীতের মহাপুরুষদের কৃত মহৎ কর্ম্মের নজির খোঁজা সে-কালের অলস অক্ষম মনের চিরাচরিত স্বভাব ছিল। তখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করা অন্যায় বলে পরিগণিত হত।

অনেক অন্যায় গর্হিত রীতি নীতি বা কুপ্রথা, কুকাজ সেকালে এমন নিশ্চিন্তভাবে প্রচলিত ছিল যা দিগ্বিজয়ী বীর, অবতার, সেণ্ট ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ আদির দ্বারাও অনুষ্ঠিত বা অনুমোদিত হত। ঐ সব গর্হিত কাজ সগৌরবে সৎকর্ম্মের নজিররূপে গৃহীত হত। অধিকন্তু ঐ রকমটি সৃষ্টি-কর্ত্তার অভিপ্রেত বলেও দাবী করা হত। এখন ঐ রকম নজির খোঁজার প্রবৃত্তি কারো হয় না। পেছন দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সামনে হাঁটবার ভাণ আর কেউ এখন করে না।

লীনা। এই কথাগুলি অকাট্য সত্য জেনেও অপ্রিয় বলে মনে লাগছে। অথচ আগেই বলেছি যে ঘোমটা খোলা সত্যই এখন আমার প্রিয়। সত্য অপ্রিয় লাগে কেন? এটা জাগ্রত মনের সঙ্গে সুপ্ত আর অবচেতন মনের খেলা নয় কি?

উঃ। ঠিক তাই। তবে খেলা নয়—প্রভাব। আসল কথা কি জান! তোমার ছিল বংশপরম্পরাগত সুপিরিয়রিটী কমপ্লেক্স বা প্রভু-মন-ভাব। বহু পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে এই মনোভাবে প্রভু শ্রেণী আক্রান্ত হয়েছিল। তোমার মৃত্যুর পরেও তোমার বিদেহী মন, সেই কন্‌জেনিট্যাল ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে।

রাজিব বাবু ছিলেন বিজ্ঞানের প্রফেসার। তাঁর ছিল কিছুটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি। তাঁর শিক্ষার গুণে আর

প্রেমের প্রভাবে তোমার মনটা হয়েছিল একটু যুক্তি-প্রবণ। তারপর তোমাদের কামজ প্রেমে লাগল যখন সমাজের বিধি নিষেধের ধাক্কা, তখন শিক্ষার দ্বারা নবার্জ্জিত তোমার আত্মসম্মানে, বা সুতীব্র সংস্কারে লাগল আঘাত। তখন হঠাৎ হয়ে দাঁড়ালে সমাজদ্রোহী (সমাজের কল্যাণের জন্য নয়, তোমাদের কামেচ্ছা চরিতার্থের জন্য)।

অনেকে কিন্তু এরূপ অবস্থায়, ধর্ম্মার্থে সংসার ত্যাগ করে, কোন মঠে বা আশ্রম আদিতে প্রেমানন্দে বা ভোগানন্দে অহং ব্রহ্মের আরাধনায় গৌরবময় জীবন যাপন দ্বারা সমাজকে ধন্য করে দিত। তোমাদের দ্বারা কিন্তু তা' হল না।

সে যাই হোক, ঐ প্রবল ধাক্কায় তোমার জাগ্রত মন হল একটু মিথ্যা কমপ্লেক্সের প্রভাবমুক্ত। সমাজ যে নিছক মিথ্যা প্রতারণার ওপর দাঁড়িয়ে—এই সত্য তখন তোমার মনে সেইভাবে জাগল, যেমন করে জাগে কোন সদ্য শ্মশানাগত ব্যক্তির মনে ক্ষণিকের বৈরাগ্য। যেমন জগৎ মিথ্যা। তারপর "এও সত্য, ও ও সত্য" অর্থাৎ কিনা বিজ্ঞান যা বলে তাও (হয়ত) সত্য। কিন্তু সেকালের সত্য দ্রষ্টা পূজ্য মহাপুরুষদের ইনটুইসনলব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টি—তা কি মিথ্যা হতে পারে? এই তোমার ভাবপ্রবণ মনের কথা।

তারপর সেকালে এই গ্রহের ত্রিকালজ্ঞ, ঐশ্বরিক বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের স্বার্থসর্ব্বস্ব, মিথ্যা-

প্রবণ অথবা সত্যাতঙ্ক—রোগগ্রস্ত বলে অভিহিত করাতে, তোমার মনে এখনও অপ্রিয় লাগছে সেই হেতু, যে হেতু উক্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে তোমার অশেষ ভক্তি-ভাজন পার্থিব মহাত্মাদের অনেকখানি সাদৃশ্য, তোমার মনে খোঁচা দিচ্ছিল।

এখন দেখ, ভক্তি সুসংযত হলেও যে তা মানুষকে অন্ধ করে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তুমি যে মানুষ নও, দেহহীন মন, আর তোমার মন যে এখন পার্থিব নয়—বিশ্বের, বিশেষ করে আমরা যে এখন পৃথিবী দেখছি না বা পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা করছি না, কিংবা অন্য একটি উন্নততর গ্রহ দেখছি, তা তুমি বার বার ভুলে যাচ্ছ; একি তোমার ভক্ত্যান্ধতা নয়?

লীনা। আচ্ছা তুমি দেখ, আমি ঠিক মত বুঝেছি কিনা? ভক্তিবাদকে ভিত্তি করে যে ভেনারেশন (যা কন্‌সারভেটিসমের মূল-মন্ত্র) মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল, তা একেবারে উপড়ে ফেলতে না পারলে এই গ্রহবাসীর চিন্তা স্বাধীন হত না; চিন্তা ভক্তিবাদের কবল হতে মুক্ত না হলে, বৈজ্ঞানিক সত্য দর্শন আর গ্রহণ করবার শক্তি জাগত না; আর জাগ্রত মন পূর্ণ-ভাবে কম্‌প্লেক্সের প্রভাবমুক্ত না হলে, সত্যের প্রতি অদম্য আগ্রহ জাগত না। সত্যপ্রিয় না হলে দৃষ্টি-ভঙ্গি বৈজ্ঞানিক হত না। দৃষ্টি-ভঙ্গি অভিনব-বিজ্ঞান-সম্মত

না হলে, মানবতার সত্য রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হত না। মানব জাতির সত্য-স্বরূপটি না হৃদয়ঙ্গম করলে, সার্ব্বজনীন সাম্য বা মুক্তির সত্য পথ খুঁজে পাওয়া যেত না। আর সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমেব* সার্ব্বজনীন ভাব এই গ্রহে কার্য্যে পরিণত হত না। 'সাম্য মৈত্রী লিবার্টি''ও এই গ্রহে পূর্ণরূপে বিরাজ করত না।

উঃ। আবার সত্য অপ্রিয় লাগবে না'ত?

লীনা। না। লাগতে পারে,—এই সন্দেহে ঐ 'পাবাব'—রহস্য জানতে চেয়েছিলাম।

উঃ। আচ্ছা, আর একটা কথা, এখনও এই গ্রহে পূর্ণ সাম্য-মৈত্রী লিবার্টি বিবাজিত, একথা বলা চলেনা। কারণ এখনও এখানে কতকটা বাধ্যতামূলক শ্রম, কোঅপারেটিভ নিয়ম কানুন নাম মাত্র হলেও তা মেনে চলা, অতি অহিংস হলেও বিচাবালয়, ব্যক্তিগত খরচের জন্য টিকেট প্রথা ইত্যাদি আছে, যদিও তা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হচ্ছে। আর একশ বছর পরে এসব কিছুই থাকবে না। যে যার কর্ত্তব্য নিজ নিজ বিবেকের প্রেরণায় সুন্দররূপে সম্পন্ন করবে।

* সর্ব্ব মানবের যা শিব অর্থাৎ শুভ তাই সত্য। যা সত্য এবং শিব তাই সুন্দর। কিন্তু সেকালে যা শুধু প্রভু শ্রেণীরই শিব তাই সত্য এবং সুন্দর বলে ব্যাখ্যা করা হত।

পরিশেষে বলি—তোমাদের পৃথিবীর একটা বহু প্রচারিত উপাখ্যান মনে করিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। যখন তুমি জীবিতা ছিলে, তখন ছেলে-বেলা দিগ্বিজয়ী মহাবীর সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার ও এক ভীষণ ডাকাতের কথোপকথনের কথা নিশ্চয় পড়েছিলে। তা থেকে তখন তোমার মনে সেকালের মানব-চরিত্র সম্বন্ধে কোন বিশেষ জ্ঞানের অনুভূতি জাগেনি!

লীনা তা সত্যি। যদিও আমার শিক্ষাগুরু অনেক ক'রে তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু—

উঃ। তুমি কিন্তু তারমধ্যে অজানা সত্য খুঁজে পাওনি নিশ্চয়!

লীনা। না, তা পাইনি।

উঃ। এখনও ছোট ডাকাতকেই ঘৃণিত ভীষণ মানব-শত্রু বলেই জেনে রেখেছ। আর বড় ডাকাতকে দিগ্বিজয়ী, বিজ্ঞ, মহাত্মা, মহাপুরুষ, সম্রাট্ বলে তোমার মন ভক্তি-অর্ঘ্য দিচ্ছে। এই গ্রহের সেকালের সব রকম দিগ্বিজয়ী যে একই রকম গোহালের, এ-সত্য এখন তুমি ধারণা করতে পারছ ত? এই গ্রহে এইভাবে ত্রিকালজ্ঞ মহাজন, সেণ্ট, মহাপুরুষ আদির কার্য্যকলাপ বা লীলা বিশ্লেষণ করলে (অপ্রিয় সত্যে) তোমার ব্যথার উদ্রেক না হয়ে, সত্যানন্দের অনুভূতি হবে নাকি?

এ-বিষয়টা বড়ই অপ্রিয় হয়ে উঠছে। আপাততঃ এ-বিষয় ছেড়ে তোমায় এই গ্রহের নারীর কথা বলব আর দেখাব। এখন তোমার মন আর পুরুষের মন পৃথক্—এমন ধারণা আর তোমার নাই। কারণ তুমি দেহহীন।

এখনও কিন্তু এই গ্রহের বিরাট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন অনেকগুলি অতীব দর্শনীয় বিভাগ দেখতে বাকী থেকে গেল। যেমন সাহিত্য, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, চিকিৎসা, নৃত্য, সঙ্গীত, চারুশিল্প ইত্যাদি—যা সেকাল হতে সম্পূর্ণ অভিনবত্ব লাভ করেছে।

লীনা। আচ্ছা, তা পরে দেখে নিতে পারব। এখন নারীর কথা বল।

নারীর স্থান

উঃ। আগে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ইউজিনিক্‌স্ বিভাগে, কেমন ক'রে শারীরিক গঠনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন আর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য 'ম্যাসাজ' করান হচ্ছিল তা দেখেছ। সব মেয়েদের গঠন, মুখমণ্ডল, চোখ, মুখ, নাক কত সুন্দর ও নিখুঁত হয়েছে দেখ। নারী এখন প্রায় সকল বিষয়ে পুরুষের সমান। 'ইউজিনিকস্'-এর কল্যাণে এখন নারীর শরীরের উচ্চতা সেকাল অপেক্ষা প্রায় গড়ে তিন ইঞ্চি বেড়েছে, তার ফলে নারী প্রায় পুরুষের

সমান উঁচু হয়েছে। এক কাঁধ হতে অন্য কাঁধ পর্য্যন্ত মাপ, গড়ে প্রায় দু'ইঞ্চি বেড়েছে। কোন কোন নারীর নিতম্ব পুরুষ অপেক্ষা কিছু বড় এখনও আছে। জাঙ্গ হতে পা পর্য্যন্ত শরীরের নিম্নাংশ অপেক্ষাকৃত লম্বা হয়েছে। পায়ের আর পায়ের আঙ্গুলের গঠন এত মনোহর হয়েছে যে একবার দেখে সাধ মেটে না। হাত আর হাতের আঙ্গুলও সেইরূপ সুন্দর হয়েছে। শরীরের চলন, চালন, ভাব-ভঙ্গির অভিব্যক্তি ও লীলায়িত ছন্দ কি মধুর, কি মনোরম দেখ !

লীনা। পুরুষ কি স্বভাবত স্ত্রী অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও সুন্দর নয় ?

অনেক পুং পশুপাখী, স্ত্রী পশুপাখী অপেক্ষা সুন্দর ও বলিষ্ঠ সেইখানে, যেখানে দলে 'মেদী' পশুপাখী অপেক্ষা নর পশু বা পাখীর সংখ্যা খুব কম ; যেমন ময়ূর, ষাঁড়, সিংহ ইত্যাদি। অনেক হাঁস, পায়রা, বক, শেয়াল, কুকুর, খরগোষ আদির নর মেদীর পার্থক্য আছে, কিন্তু সহজে নজরে ধরা পড়ে না। এই সকল পশু পাখীর দলে নর ও মেদীর সংখ্যা প্রায় সমান। পরন্তু অপেক্ষাকৃত উন্নত কয়েক প্রকার জীব দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক দলের দল-ভুক্তদের সংখ্যা প্রায় অসংখ্য ; যেমন মৌমাছি, উই, পিঁপড়ে ইত্যাদি। মৌমাছির প্রত্যেক দলে প্রজনন কার্য্য সম্পন্ন করবার জন্য, নর অপেক্ষা অনেক বড় একটি মেদী

মৌমাছি থাকে। এদের অসংখ্য নারী কর্ম্মীরা প্রায় নর মৌমাছি অপেক্ষা অধিক শ্রমশীল ও সবল হয়। তা হলে দেখ,প্রকৃতি বা স্বভাবে কোন কিছুর নিয়ম যে কত রকম তার ইয়ত্তা নাই। কাজেই বিশ্বে যা ঘট্‌ছে বা ঘটে তা'কে অস্বাভাবিক বলা চলে না, বা স্বভাবের খেয়াল বলাও চলে না। যেটাকে আমরা খেয়াল মনে করি, তারও প্রয়োজন (utility) আছে। এই প্রয়োজনের জন্য যদি নারীকে স্ত্রী-চিহ্ন ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে পুরুষের সমান হতে হয়, তবে তাকে অস্বাভাবিক বলতে পার না। পুরুষ যে নিজেকে স্বামী (প্রভু) আর স্ত্রীকে দাসীতে পরিণত করেছিল, সেইটাই বরং (যদি অস্বাভাবিক কথাটা প্রয়োগ করতে চাও তবে) অস্বাভাবিক শুধু নয়, ঘোরতর অন্যায়। পুরুষের স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব রক্ষা, আর নারীকে দাসীত্বে, অর্থাৎ আসবাবপত্রের মত নিজস্ব কেনা বেচা সম্পত্তিতে পরিণত করবার আপ্রাণ চেষ্টাকে স্বাভাবিক ব'লে সমর্থন ক'রে মানব জাতির অর্দ্ধাঙ্গের বা অর্দ্ধাংশের ওপর যে অতি বড় অমানুষিক (পাশবিক) অত্যাচার করা হত তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ।

পুরুষ মানুষ নিজেদের ঘৃণিত স্বার্থের, অর্থাৎ যদৃচ্ছা নারীকে ভোগ করবার জন্য নারীর ওপর সেকালে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। তাই পুরুষরা ষড়যন্ত্র ক'রে নারীকে সকল রকমে হীন প্রতিপন্ন করবার

জন্যে নানা প্রকারের আজগুবি গল্প বানিয়েছিল, যেমন "নারীর আত্মা নাই, স্বভাবত নারী দুর্ব্বল, দাসীত্বই নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও নারীর সুখে জীবন যাপনের একমাত্র উপায়। নারী সম্পত্তির অধিকারিণী হলে বা অর্থশালিনী ামীর দাসীত্বে মজে থাকবে না, অর্থাৎ শ্রীচরণের দাসী হয়ে অক্লেশে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে না।" একেই তুমি বলছ স্বাভাবিক ?

মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীব। কাজেই স্ত্রী-পুরুষ-সুলভ চিহ্ন ব্যতীত আর প্রায় সকল বিষয়ে নারী পুরুষেব সমান হতে পেবেছে বলেই এই সমাজ উন্নতির পথে যেতে পারছে। সেকালে দেখ, মানব জাতির অর্দ্ধাংশ নারীকে পুরুষের আয়ত্তাধীনে রাখবার, অর্থাৎ নারীর ওপর যদৃচ্ছা ভোগের অধিকার কায়েম রাখবার জন্য কত কুনীতি, কুপ্রথা, কুকার্য্য, কুচিন্তা, কুঅভ্যাস যে প্রবর্ত্তন করেছিল তার ইয়ত্তা নাই। এর সঙ্গে জুটেছিল আর্থিক প্রতিযোগিতা ও প্রভুত্ব বা আধিপত্যের অদম্য লিপ্সা। এই তিনের দ্বারা মানব-সমাজে যত সব মিথ্যা, প্রতারণা, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ভ্রাতৃহত্যা, মাতৃপিতৃ হত্যা, নরহত্যা (যুদ্ধ) প্রভৃতি যত কিছু অন্যায় অবিচার আদির তাণ্ডবলীলাকে কি তুমি স্বাভাবিক বলতে চাও ?

একশ বছর আগেও শিশু অবস্থায় বেটা ছেলে থেকে মেয়ে ছেলেকে চিনে নেওয়া সহজ হত না। উভয়ের

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ আচার ব্যবহারের প্রভাবে পুরুষ সবল, লম্বা, শক্ত, আর নারী দুর্ব্বলা, লম্বায় ছোট ও কোমল হত। এই অর্জ্জিত পার্থক্য, অনেক স্থলে কতকটা বংশানুক্রমিকতায় পরিণত হয়েছিল। রেভলিউশনের পর এখন প্রায় একশ বছর হল, বালিকাদিগকে বালকদের সমান মর্য্যাদা দেয়াতে আর বালিকারা বালকদের সমান হওয়ার অদম্য ইচ্ছার ফলে এখন নরনারী প্রায় সমান হয়েছে। স্ত্রী চিহ্ন আর পুং চিহ্ন ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে যে একটু আধটু পার্থক্য এখনও আছে তা এখন হতে আর একশ বছর পরে থাকবেনা।

লীনা। নারীর মর্‌দানী মর্‌দানী ভাবটা কি খুব সুরুচি-সঙ্গত ?

উঃ। তোমারি কথা ধর, তোমার শরীর প্রায় পুরুষের মতই লম্বা চওড়া ছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে তুমি পুরুষের পোষাকে থাক্‌তে। তোমার চেহারা মর্‌দানী বলে কেউ কখনও বলেছিল বা মনে করেছিল কি ? এই জন্যই সর্ব্বত্র কি তুমি বেশী খাতির শ্রদ্ধা পাওনি ?

যাক্, তুমি বলছ রুচির কথা। মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রুচি বদলাবেই। রুচি বদলানই উন্নতির লক্ষণ। সেকালে লজ্জাশীলতা ও পর্দ্দানশীনতাই ছিল নারীর সুরুচি-সঙ্গত কৃষ্টি। নৃত্য, গীত, বাদ্য, উচ্চশিক্ষা আদি ছিল নিষিদ্ধ। কৃশাঙ্গী, ক্ষুদ্রকায়া, অশিক্ষিতা নারী ছিল

পুরুষের রুচিতে মনোরমা। পরবর্ত্তীকালে যখন উচ্চ শিক্ষা রুচি-সম্মত হয়েছিল, তখন স্কুল, কলেজের ছাত্রীরা পাছে স্থূলাঙ্গী হয়, সে জন্য অল্পাহারী হত। যেহেতু পুরুষ চাইত সর্ব্ববিষয়ে নারীকে দুর্ব্বলা, অক্ষমা ও পুরুষের অধীনা, নির্ভরশীলা আর ঘটিবাটির মত সম্পত্তি করে রাখতে, সেই হেতু নারী বিশেষ চেষ্টা চরিত্র করে পেলব হওয়ার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হত। এহেন সুরুচিও কালে কুরুচি বলে বিবেচিত হয়েছিল; তাই খেলার মাঠে, জিমনেসিয়ামে, সাঁতারে আরও কত রকমে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারলে নারী (পুরুষও) ধন্য হত পরে পেলবত্বার ফ্যাসন উল্টে দিয়ে, পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে রাইফেল ধরে, কামান নিয়ে যুদ্ধ করেও নারী সুরুচির পরিচয় দিয়ে ধন্য হয়েছিল। আগে সনাতন রুচিতে বিতৃষ্ণা না জন্মালে বিজ্ঞানসম্মত, কুসংস্কার-বর্জ্জিত উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় উন্নততর রুচি জন্মাতে পারেনা। এখানে সকলেই আরও উন্নতির তীব্র অভাব বোধ করছে। সেইজন্য সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি আর রুচিরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তুমি যাকে মরদানী বলছ এখন এখানকার নরনারী তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রুচি বলেই মনে করছে। পুরুষের চেহারাও সুদৃঢ় সুঠাম অথচ মোলায়েম হয়েছে।

লীনা। আচ্ছা, এখন এদের যৌনমিলনের কথা বল।

যৌন মিলন ও বিবাহ

উঃ। যৌন-মিলন মানে তুমি কি বিবাহ মনে করেছ?

লীনা। না, দু'টো এক কথা যে নয়, তা আমি জানি। আমার বলা উচিত ছিল, যৌন-মিলন ও বিবাহের কথা জান্‌তে চাই।

জীব মাত্রেই বিশেষ করে কাম ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মে। এই দুটি প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত না থাকলে বংশ বৃদ্ধি ও জীবন ধারণ করা সম্ভব হত না। এখন কাম প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু বলব ও দেখাব। কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে যৌন-মিলন, এই মিলনে নরনারীর বিমল অথচ তীব্র আনন্দ হয় বলে, মিলনের তীব্র ইচ্ছা মানবের মনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। তার ফলে সন্তান জন্মে বলেই বংশ রক্ষা হয়। সুদূর অতীতে বিবাহ প্রথা কি করে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল তা তুমি হয়ত জান, তবুও এখন সংক্ষেপে বলছি পরে দেখাব। মানুষের আদিম অবস্থায় এই যৌন-মিলন প্রায়ই পশুসুলভ যথেচ্ছভাবেই চলত। ক্রমে মানুষ যেমন মানুষোচিত জ্ঞানলাভ করতে লাগল তেমনি প্রত্যেক পুরুষ কামজনিত ঐ বিমল আনন্দ অতিরিক্ত মাত্রায় যদৃচ্ছভাবে নিজে ভোগ করবার জন্য নারীর ওপর অবিচ্ছেদ্য একাধিপত্য কায়েম করবার উপায় স্বরূপ বিবাহ বন্ধন প্রথা বা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেছিল।

প্রথম প্রথম যত প্রকারে যৌন-মিলন ঘটা সম্ভব, তত প্রকারের বিবাহ, বৈধ বলেই ধরে নে'য়া হত। প্রথমে সম্ভবতঃ পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী নারীকে জোর ক'রে কেড়ে কিম্বা কিনে এনে পুরুষের প্রভুত্বাধীনে যে ভাবে রাখা হত, তাতে নারী কম বেশী দাসী ভাবেই থাকতো অর্থাৎ পুরুষের কামোন্মাদনা চরিতার্থ, সন্তান উৎপাদন আব সেবা করাই ছিল নারীর প্রধানতম ও পবিত্রতম কর্ত্তব্য। অবিশ্যি এতে নাবীর কামোন্মাদনা তেমন চরিতার্থ সব সময় হ'ত না। কারণ নারীর ইচ্ছা ধর্ত্তব্যেব মধ্যে ছিল না। উভয়ের মধ্যে প্রেম ক্বচিৎ সম্ভব হত।

স্বামী স্ত্রীব যৌন-মিলনেই যে সন্তানেব জন্ম হত, সুদূর অতীতে এই গ্রহের অধিকাংশ দেশের লোক, তা বিশ্বাস করত না। ঘোষণা করা হত, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, অগ্নি, আরও কত দেবতা, দেবদূত, মহাপুরুষ ইত্যাদি নারীর ওপর কৃপা করার ফলে পবিত্র ক্ষেত্রজ সন্তান জন্ম নিত। যাই হোক এতে কিন্তু পুরুষের নাবীর ওপর প্রভুত্ব বা এক-স্বামীত্বেব বিলাস বা উগ্রকামনা মিটত না। কাবণ ক্ষেত্রজ সন্তান মানে স্বামী বর্ত্তমানে অন্য পুরুষের বীর্য্যে যে সন্তান জন্মাত তারাই ক্ষেত্রজ সন্তান ব'লে মর্য্যাদা পেত। এই প্রথা কোন না কোন সময়ে এই গ্রহের সকল দেশেই প্রচলিত

ছিল। তারপর এল নারীর এক পতিত্বের বা সতীত্বের প্রচলন ও মহিমা কীর্ত্তন। কিন্তু পুরুষের পক্ষে এক পত্নীত্ব দৈন্যের পরিচায়ক বলে গণ্য হত। যে পুরুষ যত শক্তিশালী আর যত সম্পদের অধিকারী হত, তার প্রায় তত অধিক পত্নী, দাসী, ক্রীতদাসী, উপপত্নী বা বারবনিতা আদি থাকত, সেই পুরুষ তত অধিক মহামহিম বলে পূজ্য হত। এই গ্রহের কোন কোন ক্ষুদ্র সমাজে কিন্তু সতী নারীর বিবাহিত বহু পতিত্বেরও প্রচলন, রেভলিউ-শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল। আবার এই গ্রহের প্রায় সমস্ত জনবহুল স্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে বারাঙ্গনা, পুরুষের কাম-প্রবৃত্তির খোরাক জোগাত।

এ ছাড়া আবার সতীত্ব রক্ষা, পুণ্য সঞ্চয়, পাপ ক্ষয় করবার জন্য বহু নারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, আশ্রমে (Nunnery), মঠে (Monastery) আশ্রয় নিত। সেখানে যারা রক্ষক থাকত বা যারা আসা যাওয়া করত তাদের প্রায় প্রত্যেকে, একাধিক সতীত্ব গৌরবে গৌরবান্বিতা নারীর, কি প্রকার গৌরব রক্ষা করত, তা সে কালের গণ্যমান্য সুবিখ্যাত লেখকগণের লেখাতে বা পুস্তকে দেখতে পাওয়া যেত। ফলতঃ এই গ্রহের সর্ব্বত্র সতীত্বের অবমাননা অনিবার্য্য হয়েছিল; আর সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থতার বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। তবুও যৌনমিলন সম্বন্ধে সতীত্বের মহিমা কীর্ত্তন যত

বাড়তে লাগল, পুরুষ ততোধিক অসৎ হতে লাগল। তার ফলে প্রত্যেক সমাজে নানা প্রকার নতুন নতুন দুর্নীতি ও দুর্গতি দিন দিন গজাতে লাগল। এমন কি নারীর সতীত্ব নাশের জন্যই অনেক প্রকার উপধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়েছিল।

স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের কামজ অনুরাগ আমরণ একনিষ্ঠ থাকাই অস্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হতে চলল। এর ওপর দু'দশ জন বাদে বাকী পুরুষের মন যখন সাধারণত একনিষ্ঠ হয়ে থাকে না, তখন স্ত্রীর মন একনিষ্ঠ হয়ে থাকবে এ আশা করাই অসঙ্গত। এখানে শুধু মনের কথাই বলছি। পরিবর্ত্তনশীলতাই বিশ্ব রহস্য; মানুষের মন বিশেষ করে, এই রহস্যের সব চেয়ে অধিক প্রকট-স্থল; আবার মনের ওপর সব চেয়ে বেশী আধিপত্য করে আদিরস বা লিবিডো। পুরুষ ও নারীর মনের রুচিও পরিবর্ত্তন শীল, তাই স্বামীর প্রতি বীত-অনুরাগ বা মামুলি অনুরাগ সত্ত্বেও সময়ে অসময়ে অধিকতর মনো-রঞ্জনকারী পর-পুরুষের ওপর স্ত্রীর মনোভাব গাঢ়তর আসক্তিতে পরিনত হত। বিশেষতঃ অন্য নারীব প্রতি স্বামীর আসক্তি, স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি বীতকামানুরাগ, প্রতিহিংসা অথবা প্রতিশোধপরায়নতা জাগাত। তখন অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি বেহুঁসে কিম্বা হুঁসে প্রায় জাগত। সুযোগ সুবিধার অভাবে হয়তঃ অনেক স্থলে

যৌনমিলন ঘটত না, কিন্তু অন্য পুরুষের প্রতি মানসিক গোপন আসক্তি সতীত্বের মহিমা অথবা মর্য্যাদা রক্ষা করত না। এ পর্য্যন্ত দেখলে সতীত্বের গৌরব প্রায় বৃথা হয়েছিল।

এখন আরও একদিক থেকে দেখ; এই গ্রহের কোন কোন সমাজে যৌনমিলনের পূর্ব্বে পুরুষ নারীর মধ্যে প্রেমোন্মাদনা বা কামোদ্দিপনার সুযোগ, এমন কি নিভৃত প্রেমালাপেব সুবিধা দেওয়াও বিধিনিষিদ্ধ ছিল। কামোদ্দিপনা অর্থাৎ উভয়কে উভয়ের পাবার জন্য, দিনের পর দিন আকুলি বিকুলি, কাকুতি মিনতি দ্বারা উৎপন্ন প্রেম ও কাম জনিত বিমল বিপুল আনন্দোচ্ছাসের মধ্যে যৌনমিলনের বীর্য্যবান শুক্র বা প্রটো-জোয়ার উৎপত্তি হয়, যা জীব জগতে স্বাভাবিক এবং যা জীব উৎপত্তি ও উন্নতির উপায়, তা থেকে সেই সকল সমাজের প্রায় সকল নরনারীকে বঞ্চিত রাখা হত। তার ফলে যৌনমিলনে জাত শুক্র সতেজ ও পুষ্ট হত না। ঐরূপ সমাজে যে সন্তান জন্মাত অর্থাৎ ঐ সকল সমাজের মানুষ দুর্ব্বল, অলস, হীনমস্তিষ্ক এবং নানা দোষযুক্ত হয়েছিল। অবিশ্যি স্থান বিশেষের শিশু বিবাহ বা বাল্য বিবাহ প্রথা, আব-হাওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আদিও ঐ প্রকার সামাজিক দৌর্ব্বল্যের অন্যতম কারণ বলেও ধরা হত।

এই গ্রহের পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের উত্তর পশ্চিম দিকে কয়েকটী ক্ষুদ্র দেশে কয়েক শ' বছর পূর্ব্বে নরনারীর ধর্ম্মের ছাপ দেওয়া ঐরূপ প্রেমহীন যৌন সম্বন্ধ নানা কারণে এমন সাংঘাতিক ভাবে * কলুষিত ও সমাজ বিশৃঙ্খলার কারণ হয়েছিল যে, অন্যায় পক্ষপাত দোষ-দুষ্ট বিবাহ বা তখনকার প্রচলিত যে কোন প্রকার যৌন মিলনের ওপর, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্রমে ঘোরতর অনাস্থা যেমন বেড়ে উঠেছিল, তেমনি গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রথা ক্রমে প্রচলন হয়েছিল।

তারপর ক্রমে যুবক যুবতীর পরস্পরের প্রতি কামাসক্তি, গুণমুগ্ধতা, নিভৃত প্রেমালাপআদি জনিত প্রবল কামোদ্দিপনার সঙ্গে সঙ্গে, বিবাহের পর যৌনমিলন অথবা যৌনমিলনের পর বিবাহ যখন চলতে লাগল, তখনই উক্ত দেশগুলির অনেক মানুষ প্রেমানন্দের সহিত কামানন্দ সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

পূর্ব্বোক্ত দেশগুলিতে এই প্রেমজ কামানন্দের উন্মাদনায় যৌন মিলনে উদ্ভুত সতেজ, সুস্পষ্ট প্রটো জোয়াতে দৈহিক ও আত্মিক শক্তির উপাদান নিয়ে শক্তিমান, বীর্য্যবান সন্তান উৎপন্ন হতে লাগল।

---

*প্রায় আটশ' বছর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য কোন দেশে ধর্ম্মের গুরুগণ তাদের মা-বোনের সঙ্গে একত্রে-বাস-করতে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছিল। আরও কত কি!
" History of Europcan morals" Lecky. vol II. P. P. 350–351.

তারপর "নেতি নেতি" বিধান অর্থাৎ যাতে মানুষের সুখ হত বা যে কাজে আত্ম বিস্তার জনিত (Self expansion) বিপুল আনন্দ হত, তা থেকে বঞ্চিত করাই এই গ্রহের সকল সমাজের "নীতি" ছিল। সেই দুষ্ট "নীতি" না মানাই বীর্য্যবানের লক্ষণ। (ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বা অবতারেরও লক্ষণ)। কালক্রমে উক্ত জাতিগুলির বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি নতুন কিছু করবার আগ্রহে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রহের চারিদিকে দলে দলে বেরিয়ে পড়তে লাগল।

কয়েক শত বছরের মধ্যে এই গ্রহের ছোট বড় অন্য সমস্ত দেশ, মহাদেশ, যেখানে নারীর ওপর পুরুষের যথেচ্ছাচার সমানে চলে আসছিল, যেখানে কন্যার মতামতের অপেক্ষা না করে, প্রেম-বর্জ্জিত বিবাহ অর্থাৎ পুরুষেরই কামচরিতার্থের জন্য যৌন মিলনের ফলে যেখানে জাতি বা সমাজে নির্বীর্য্য, অলস, অকর্ম্মণ্য সন্তান জন্মাত, সেখানকার ঐরূপ দুর্ব্বল জাতি, পূর্ব্বোক্ত বীর্য্যবান কোন না কোন জাতির দ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত, লুন্ঠিত, শোষিত ইত্যাদি ইত্যাদি হতে বাধ্য হয়েছিল। দেশ বিশেষের চিরপরাধীনতার এও একটা গুঢ়তম কারণ।

যৌনমিলনের অতীত ইতিবৃত্ত আর তার বৈধা-বৈধতা সম্বন্ধে, অতি সংক্ষেপে যা শুনলে তাতে এই

গ্রহে এখন যে বিবাহ বা যৌনমিলন প্রথা প্রচলিত হয়েছে, তার বৈধতা উপলব্ধি করতে পারবে। পরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত গ্রহ যখন দেখতে যাব, তখন এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবে। বিশেষ মানব উন্নতির পথে।

লীনা। বিবাহ প্রথা বা যৌনমিলনের সম্বন্ধে আগে নানা দিক্ থেকে অনেক চিন্তা করেছি ও নানা দেশ ঘুরে ফিরে অনুসন্ধানও করেছি, কিন্তু বিবাহপ্রথা বা যৌন মিলনের ওপর একটা জাতি বা সমাজের শুভাশুভ এতটা নির্ভর করে তা আমি পূর্ব্বে ধারণা করতে পারিনি।

উঃ। এই সহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউজিনিক্স বিভাগটা ভাল করে দেখলেই সহজে বুঝতে পারতে; অবৈধ বিবাহের ফলে কোন জাতি দুর্ব্বল দেহ ও হীন মস্তিষ্ক হতে হতে, একেবারে ধ্বংস হয়েছিল; আবার কোন জাতি অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও পরাধীন হত। এই গ্রহের অনেক জাতি সেকালে এই প্রকারেই ধ্বংস বা দুষ্ট হতে বাধ্য হয়েছিল।

লীনা। গ্রেট রেভলিউশনের পর সমস্ত গ্রহের প্রত্যেকটি মানুষ মাত্র একশ বছরে এত উন্নত হয়েছে যে, প্রত্যেককে দেবতা বলা যেতে পারে।

উঃ। সেকালে এই গ্রহের প্রায় সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের কল্পনাতে। অসৎ

মানুষ সতের কল্পনা যে করতে পারে না, তা তুমি বোঝ। অসতের কল্পিত দেবতা তাই সত হতে পারে নি।

লীনা। তুমি আগেই দেবতাকে কল্পিত বলে ধরে নিচ্ছ কেন?

উঃ। দেবতারা যে কল্পিত তা তুমি নিজেই প্রমাণ করতে পার। তুমি তর্কের জন্য তর্ক করতে চাচ্ছ। তামাকের পাতা এক দেশের দেবতা ছিল। গ্রহরাজ, গ্রহ, উপগ্রহ আদিও অনেক দেশের দেবতা ছিল। তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা আদিও দেবদেবী বলে পূজিত হত। এরা যে কল্পিত—

লীনা। থাক, থাক্, আমি আর বৃথা তর্ক করব না। আর এও বুঝতে পেরেছি যে, এই গ্রহের মানুষরা দেবতাদের মত খেয়ালী নয় বা বৃথা পূজা বা বলি আদায়ের জন্য মানুষকে রোগ, শোক, দুঃখ, যাতনা আদি দিতে অক্ষম। তা বুঝি, তবু বেহুসে বেরিয়ে গ্যাছে। এও অবচেতন মনের খেলা।

এখন যা বলছিলে বল।

উঃ। প্রণয়ের প্রতিযোগিতা এখানেও কখনও কখনও দেখা যায়; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। বাল্যের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুতাই যৌবনে পরিণয়ে পরিণত হয়। যুবক বা যুবতীর মধ্যে অনেক স্থলে কাম-গন্ধহীন বন্ধুত্ব থাকে।

অন্যের সহিত বিবাহের পরেও তাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকে। আবার বিবাহিত স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অন্যের প্রতি অধিকতর কামাশক্তি বশত বিবাহ-মিলন আপোষে ছিন্ন করে, নির্ব্বিবাদে পুনরায় অন্যের সহিত বিবাহ করে। এই নির্ব্বিরোধ ভাবটাই এদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ অন্যের সহিত যৌন-সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘৃণিত মনে করে।

পরিণয়ের আগে সন্তান সম্ভাবনা হলে, গর্ভস্থ সন্তানকে নিজ নামে পরিচিত করে ধন্য হতে সাধ হলে তাদের যৌন পরিণয়, গেজেটে ঘোষিত হয়। কখনও কখনও মিলন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

আর একবার চল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌনমিলন বিষয়ক শারীরতত্ত্ব মনস্তত্ত্বআদি বিষয়ের বিচিত্র কৌতুহলোদ্দিপক রহস্য ঐ মিউজিয়ামে গিয়ে দেখি :

ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, রূপলিপ্সা, কাম, যৌনমিলন, সমকামিতা, বার্থ কণ্ট্রোল, প্রজননক্রিয়াআদি মানুষের সঙ্গে মানুষের শারীরীক আর মানসিক সব রকম মিলন বা সম্বন্ধ বিষয়ে, বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে কিশোর কিশোরীরা, কেমন স্ফুর্ত্তির সহিত বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা, গবেষনা আদি করছে, কাছে এসেই দেখ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই বিভাগে শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের যে বয়সে উক্তমিলন সম্বন্ধিয়

যে যে বিষয় শিক্ষা করা উচিত, সেই সেই শিক্ষনীয় বিষয় ভেদে শিক্ষার্থীদের শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে। স্ত্রী পুরুষের মৃত দেহের, বিশেষ করে মস্তিস্ক, মেডুলা, প্রজনন ইন্দ্রিয়াদি ডিসেক্ট্ ক'রে শারীরিক মানসিক কি প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্নেহ, ভালবাসা, প্রজনন, প্রটো-জোয়া-আদি উৎপত্তির কার্য্যকারণ আর তার প্রতিক্রিয়া কেমন ক'রে কোথা হতে, কেন হয়, এই সকল ও আরও বহু বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তথ্য আর সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করছে।

মানব প্রকৃতিগত উদ্দাম কামোন্মত্ততা মারাত্মক প্রতিদ্বন্দিতা, রেপ, সমকামিতা, ভ্রুন হত্যা আদি নানাবিধ মানসিক, শারীরিক কুৎসিত প্রবৃত্তি বা ব্যাধির কার্য্য কারণ, তার প্রতিক্রিয়াদির প্রতিরোধ আর প্রতিকারের উপায়, যৌবনের প্রারম্ভে এমন ক'রে শিখেছে বলেই, এদের সমাজে যৌনমিলন সম্বন্ধীয় কোন প্রকার অশান্তি ঘটতে পারে না।

এই অবস্থায় কারও কিছুমাত্র সুবিধা বা সুরুচির ব্যাঘাৎ না ক'রে স্বাস্থ্য রক্ষা আর বার্থ-কন্ট্রোলের যথোচিত বিধিনিষেধ মেনে, বন্ধুদের মধ্যে ক্বচিৎ (উভয়ত) প্রবল কামেচ্ছা চরিতার্থ জনিত বিমল আনন্দ যদি কেউ নিরিবিলিতে উপভোগ করে, তবে অন্যে জান্তে পারলেও তাতে এখন অন্য কারও অসূয়া বা সমাজ নাশের ভয় লাগে না।

এই গ্রহের মানব জাতির প্রথম উৎপত্তি হতে রেভলিউ-সনের এক শ' বছর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমষ্টি আর ব্যষ্টির রোগ, শোক ও অশেষ দুর্গতি আদি উপেক্ষা ক'রে নানাবিধ সমাজের নানা প্রকার নিষেধাত্মক উৎকট বিধিব্যবস্থা সত্ত্বেও উদ্দাম কামেচ্ছা চরিতার্থের অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তি কখনও সুসঙ্গত বা সুসংযমিত ছিলনা। এখন তা হয়েছে। গত রেভলিউসনের পূর্ব্বে এই গ্রহের কোন কোন অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশে, কতকটা এই রকম যৌনমিলন বা পরিণয় প্রথা প্রচলিত হয়ে ছিল। এই ভাবের নরনারী মিলনে এখানে সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেড়েছে আর সর্ব্ব সাধারণের সঙ্গত ইচ্ছা স্বাধীন ও স্বাভাবিক হয়েছে। ইহাই এখানকার প্রকৃত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র।

সেকালে স্বামীর গোচরে বা অগোচরে জাত ক্ষেত্রজ সন্তান, ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহিত স্বামীর পুত্র কন্যা ব'লে পরিচিত হত। এখন সন্তান যার ঔরস জাত, তারই সন্তান ব'লে অসংকোচে পরিচয় দেয়। সেকালে কোন কোন দেশে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত ব'লে বিবেচিত হত। তার মানে সেখানে ক্ষেত্রজ সন্তানের সংখ্যা অত্যধিক হয়েছিল।

লীনা। আমি মৃত্যুর আগে সভ্য অসভ্য অনেক সমাজের যৌনমিলন বা বিবাহ প্রথার স্বরূপ অনুসন্ধান

ক'রে দেখেছিলাম। ঠিক কি হওয়া উচিত খুঁজে পাই নি।

উঃ। মানে, ডাক্তার রায়কে নিয়ে তুমি কি করতে পার তাই খুঁজে পাওনি— এই না?

লীনা। ঠিক্ তা না হলেও ঐ থেকে অনুসন্ধিৎসা জেগে ছিল। সতীত্বের একটা বিকট সংস্কার আমার ছিল কিনা!

উঃ। সমাজসংস্কাররূপ মহান ব্রত এত ঐকান্তিক ভাবে নিলেও এত দিন পরে এত বয়েসে তোমাকেও লিবিডো ছাড়েনি।

লীনা। এখন স্পষ্টই দেখছি, কাউকে, কোন সুস্থ জীবকে কখনও ছাড়েনি। তোমাকেও ছাড়েনি। এখন বুঝলাম এর নাম স্বভাব। সুষ্ঠু বিজ্ঞানের পথে একে চালালে কল্যান দেয়। অস্বাভাবিক মিথ্যা বা অন্যায়ের পথে অকল্যান আনে।

উঃ। এত সব জ্ঞানানুসন্ধান, আর তার ফলে অভিজ্ঞতা লাভের পর তুমি আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা ক'রেছিলে কি?

লীনা। অনেক সময় সে চিন্তা আসে; আবার মনে হয় মরেত গেছি, এখন সে চিন্তা করে আর কি হবে!

উঃ। আত্মজ্ঞান ব্যতীত—

লীনা। আমি জানি, আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্যের সম্বন্ধে জ্ঞান সুচারু রূপে সিদ্ধ হয় না। 'আমার' 'আমি'

ভাবটা মন হতে বোধ হয় গ্যাছে, এখন নির্ব্বিকার ভাবে আলোচনা করতে পারি।

উঃ। তোমাব জন্মের পরে যখন হতে তোমার জ্ঞানের উন্মেষ হয়ে ছিল, তখন থেকে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভালবাসা আদি কামেচ্ছা কেমন ক'বে জেগে ছিল তাই বল।

লীনা। তার আনুসঙ্গিক তুচারটে কথাও বলতে হবে, অবিশ্যি সংক্ষেপে।

উঃ। ঠিক তাই, এতে মিথ্যা, হীন স্বার্থপরতা আদির কথাও আসবে।

লীনা। বাবা উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। কলকাতায় ছিল বাড়ী, মামাব বাড়ী ছিল কলকাতার বাইরে অদূরে কোন এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে। কচিত কখন তুচার দিনেব জন্য মামাব বাড়ী যেতাম। মামামামীরা ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ী প্রায় আসতেন। অন্য আত্মীয়েরাও মাঝে মাঝে আস্‌তেন। পার্কে অনেক ছেলে মেয়েদেব সঙ্গে মিলতে পারতাম।

তিন চার বছব বয়েসে মা বাবা আমায় নানা রকম ছবির বই দেখিয়ে পড়াতে সুরু ক'রে ছিলেন। মা ও শিক্ষিতা ছিলেন। কবে হতে যে প্রবল সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্‌স্ আমার মনে গজিয়েছিল তার হুঁস হয়নি।

তিন বছর বয়সের আগে তু-একটা কথা আবছা আবছা মনে পড়ে। মনে হত সকলে অন্য ছেলে

মেয়েদের চাইতে আমায় বেশী ভাল বাসত। ব'লে রাখি, লোকে আমায় সুন্দরী বলত।

যে আমায় কোলে নিয়ে চেপে চুপে আদর করত, লজেঞ্চ, টফি আদি ছেলেদের প্রিয় খাবার দিত, বেশ মিষ্টি করে কথা বানিয়ে বানিয়ে গল্প আর নানা রকম রূপ কথা বলত, সে দেখতে সুন্দর বা সুন্দরী হলে তাকেই আমার খুব ভাল লাগত।

মা বাবা আর অন্য যারা আমায় ভাল বাসত তারা, এমন কি আমাদের ঝী অন্য কাউকে কোলে নিলে, আদর করলে, ভাল খেলনা বা খাবার দিলে আমার মনে বড় খারাপ লাগত; চোখে জল আস্‌ত। মা বাবা তাতে আনন্দ পেতেন ব'লে মনে হত। পরে আমার অভিমান ভাঙ্গবার জন্য একটু বেশী ক'রে আদর করতেন। কেউ, কাউকে কোন ভাল জিনিষ দিলেও আমার মনে কষ্ট হত। এই ভাবে বহু প্রকারে শৈশবেই স্বার্থপরতা বা আত্মম্ভরিতায় শিক্ষা পেয়ে ছিলাম। অন্য ছেলে মেয়েকেও কম বেশী এই শিক্ষা লাভ করতে দেখেছি। এসব যে অন্যায় তা কেউ বুঝিয়ে দিত না। বরং এতে প্রশ্রয় দিত।

কখনও কোন রকম দুষ্টুমি করলে মা মিষ্টি ক'রে মানা করতেন। না শুন্‌লে বক্‌তেন আর মারতেনও! আবার কখনও কখনও খামখা বক্‌তেন—আর মারতেন! যখন রাগে, অভিমানে খুব কেঁদে ফেলতাম, তখন মা

আমায় বুকে নিয়ে একটু বেশী রকম আদর আপ্যায়ন করতেন। খেলনা, প্রিয় খাবার দেবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, বেড়াতে নিয়ে যাবার মিথ্যা আশা দিয়ে, মিথ্যা ভয় দেখিয়ে, আরও কতরকম মিথ্যা দিয়ে ভোলাতেন। এই প্রকার মিথ্যার ব্যবহার মন্দ লাগত না। তাই আমিও কারণে অকারণে যত পারতাম মিথ্যার ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। এ থেকে জীবনের সকল বিষয়ে স্বার্থপরতা জনিত সকল রকম মিথ্যা আর তার সাঙ্গপাঙ্গ সমেৎ জগাখিচুড়ী পাকাতে যে কত ভাল লাগত তা আর কি বলব।

জন্মের পর, যখন ভাষা অজ্ঞাত ছিল, তখন থেকেই ভালবাসার মারফৎ, ভাবে আর কাজে মিথ্যা, স্বার্থপরতা আদির মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছিলাম ব'লে এখন বুঝ্‌ছি।

উঃ। এখন দেখ, সেকালে এই গ্রহের সব ছেলে মেয়ে জন্ম জন্মান্তর হ'তে পূর্ব্ব পুরুষের উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ কুপ্রবৃত্তি, বিজ্ঞান যা অকাট্যভাবে মানসিক রোগ ব'লে প্রমান করেছে, তা নিয়েই সবাই জন্মাত। এ সকল রোগ ভালবাসাকে ভিত্তি করে মিথ্যা আর স্বার্থপরতা আদির মধ্যদিয়ে বয়স্ক জীবনে নানা রূপেও নানা ভাবে ক্রমে সংক্রামিত হত। মনে রোগের কোন লক্ষণ নাই—সেকালে এমন মন কদাচিৎ সম্ভব হত।

গত রেভলিউসনের পর হতে মনের এই প্রকার রোগ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত উদ্যম আর চেষ্টার ফলে (জন্মের পূর্ব্বে প্রসূতি আগারে এবং জন্মের পরে শিশু শিক্ষা ভবনে) বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুচিকিৎসা এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য এখন সম্ভব হয়েছে। তিন চার পুরুষ অর্থাৎ একশ' বছর পরে এ গ্রহবাসীর মধ্যে মানসিক রোগের লক্ষণ কদাচিত এখন দেখা যায়।

যা বল্‌ছিলে, এখন আবার বল।

লীনা। যে সময়ের কথা বলছিলাম তার আগেও মা বাবার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা আর আমার স্কুলের ছেলে মেয়েরা আমাদের বাড়ী আসত। তাদের মধ্যে, মেয়ে ছেলে অপেক্ষা ছোট বড় বেটা ছেলেদের বেশী ভাল লাগত। বেটা ছেলেরাও মেয়ে ছেলে বেশী চাইত। যে বেটা ছেলে দেখতে সুন্দর হৃষ্ট পুষ্ট, ফর্সা, যার ব্যবহার মধুর, বিশেষ ক'রে আমাকেও যার ভাল লাগত, আর যে আমার ভালমন্দ সব কিছুর প্রশংসা করত, তার উপরই আমার ভালবাসা ভাল করেই পড়ত। তার সঙ্গে মিলবার জন্য আমার মন অস্থির হত। এই রকম অনেক বেটা ছেলেকে ভাল বেসেছিলাম। শেষেরটি আমায়ও খুব ভালবাসত। ভালবাসার, সে অনেক কিছু রীতি বা ধারা শিখিয়েছিল। শরীরে এমন অনেক স্থান বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল যেখানে ছোঁয়া লাগলে, হাত কিম্বা

মুখ দিলে, চুমো খেলে আমাদের বালিকা বয়েসেও ভারী তৃপ্তি হত। এসব ব্যাপার অবিশ্যি নিরিবিলিতে চলত।

আর এক রকম ভালবাসার রীতি ছিল যা ঝগড়ার মধ্য দিয়ে গজাত। কথায় কথায় অনর্থক দোষ দিয়ে, ভেঙ্গচে, বকে ঝকে, এমন কি চিম্‌টি কেটে মেরেও ভালবাসা জানান হত। এর নাম ঝগড়াটে ভালবাসা। বোধ হয় ঝগড়ার পর মিলনটা মধুর লাগত। এরকম ভালবাসা প্রায়ই দেখা যেত। অনেক জীব জন্তুর মধ্যেও এহেন ঝগড়াটে কামানুরাগ দেখা যেত। যেমন বেড়াল, সাপ, কাক ইত্যাদি। এরকম ঝগড়াটে ভালবাসা আমার ধাতে সইত না।

স্ত্রী পুরুষের ভিতরকার যে মধুর সম্বন্ধ, তার হরেক রকম সন্ধান, গল্পের মধ্য দিয়ে বেমালুম ভাবে দিত আমাদের ঝি। সে অনেক সময় আমায় কোলে নিয়ে কাতুকুঁতু দিয়ে হাতবুলিয়ে, চুমো দিয়ে কত আদরই না করত। আমার জন্ম থেকে সে জুটে ছিল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। চাকর প্রায়ই বদল হত। একটা ছোক্‌রা চাকর একবার জুটে ছিল; সেও ঐ রকম একটু আধটুকু সন্ধান দিতে ত্রুটী করত না। কোন কোন কচি বন্ধু বান্ধব, তাদের ঝী চাকর আদির কাছে পাওয়া ঐভাবের সন্ধান একটু আধটু রং চড়িয়ে আমায় দিত।

আর গল্পের প্রায় সবই আজগুবি মিথ্যা আর সত্যের খিচুড়ী হত। আমাদের ঐ সব কথা চুপি চুপি বলতে বা শুন্‌তে খুবই ভাল লাগত।

খুব কম বয়েস থেকে আত্মীয়স্বজন প্রায় সকলের কাছে গল্পশুন্‌তে চাইতাম। তাঁরাও ভালবেসে আমাদের অনেক মিথ্যা অলৌকিক ব্যাপার বানিয়ে বানিয়েও বল্‌তেন। কত দেশের মিথ্যা আজগুবি রূপকথা যে কত শোনাতেন তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ঝীর বলা রূপকথা তার মন গড়া গল্প, ঠাকুর দেবতার, আর স্বর্গের কথা আদি যত কিছু নিরিবিলিতে শোনাত ; তার মধ্যে প্রায় বেশীর ভাগ অলিক প্রেম আর কামানুরাগের, বা কামোন্মাদনার বুকুনী থাকত। ব্রজলীলা, রাসলীলা কৃষ্ণ-রাধার প্রেম, মানভঞ্জন, বিদ্যাসুন্দর আদি পালার মধ্য থেকে আদি রসের ব্যাখ্যা এমন হাব ভাব ক'রে বলত আর আমাদের এমন মিষ্টি লাগত যে, ঐ সকলের ভিতরকার মিথ্যা আর মিথ্যা ব'লে মনে লাগত না, মনে হত সংসারটা বুঝি ঐ রকমই।

আমার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে ঐ সব আদিরসাত্মক গল্পের প্রহসন দেখান হ'ত। এ থেকে কামানুরাগ সূচক আলাপ ইঙ্গিতের ভাব মা-বাবা, মামা-মামী আদি গুরু-জনদের মধ্যে দেখলে, বেটা-ছেলে, বিশেষ করে মেয়ে-ছেলেরা অনেক সময় তা' বুঝতে পারত। এরকম কামানু-

রাগের হাব-ভাব ইঙ্গিতের কথা বান্ধব-বান্ধবীদের কাছে শুন্‌তে খুব কৌতূহল হ'ত।

ঐ সব নিভৃত আলাপ-আলোচনা অনেক সময় ভাল লাগত। কিন্তু এসব যে দূষণীয় তা' আমরা প্রায় সকলেই অল্পাধিক জানতাম ব'লেই গোপনে করতাম। অনেকে ঐ রকম আলোচনায় বাধা দিত, আর বড়দের ব'লে দেবার ভয় দেখাত। আমারও কখনও কখনও এসব ভারী অন্যায় ব'লে মনে হ'ত। মা'ও কতকটা জানতে পেরেছিলেন। অন্যায় কাজ করা জনিত ভয় ও ঘৃণায় একদিন মাকে একটু ব'লে ফেলাতে, অর্থাৎ ঐ সকল গল্পের কোন কোন মিথ্যে কথায় সন্দেহ হ'লে, সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য মা'কে প্রশ্ন করাতে, মা মিষ্টি কথায় আদর ক'রে আমারই মুখ থেকে ঐসব অনেক কথা বের ক'রে নিয়েছিলেন।

আমার ন' বছর বয়েসের সময় বাবার মৃত্যু হয়েছিল। তারপর মামা মাঝে মাঝে এসে আমাদের দেখা শোনা করতেন। মামাকে মা ঐসব কথা জানালেন। দোষটা গিয়ে পড়ল ঝীর ওপর। ঝীকে তাড়ান হল। চাকরটা অনেক আগেই গেছল। বান্ধব-বান্ধবীদের সঙ্গে মিলবার এবং নিভৃত আলাপের সুযোগ সুবিধা আর দিতেন না। আমার স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধুদের সঙ্গে মিলবার ইচ্ছা এত বেশী হ'ত যে আমি কেঁদে ফেলতাম।

তখন আমার বয়েস প্রায় এগার। আমি খুব হৃষ্টপুষ্ট ও লম্বা ছিলাম। হয়ত তাই ঐ বয়েসে আমার শরীরে কিশোরী-সুলভ চিহ্নের একটু আধটু উন্মেষ হয়েছিল।

এই সময়ে মামা, রাজিব লোচন দত্ত নামক তাব এক বন্ধুকে আমার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ক'রে দিলেন। তখন বুঝলাম আমার স্কুলে যাওয়া আর হবে না। আব একেবারে বন্ধ হল—বাইরের কোন লোকের সঙ্গে আলাপ। মার ওপর আমার বেশ একটু জাগল রাগ আর অভিমানের ভাব। মনটাও ভারী ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

রাজিব বাবু ছিলেন কোন এক বড় কলেজের প্রফেসার—M.Sc.। বয়েস ২৬৷২৭। বাড়ী চন্দননগর। জাত ছিল তাঁতী। কলকাতায় তাঁদের বড় কারবার ছিল। তিনি তার সিকি অংশীদার। তাঁর অংশের লাভের টাকা জমত ব্যাঙ্কে। তিনি ছিলেন লম্বা, ফর্সা, স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ-দেহ। মুখ আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ছিল সুঠাম। মোটের ওপর দেখতে মন্দ ছিলেন না। খুব ভদ্র আড়ম্বরশূণ্য, মিষ্ট-ভাষী, অথচ ছিল তাঁর—গম্ভীর প্রকৃতি। প্রথম প্রথম তাঁর গাম্ভীর্যের জন্য বোধ হয় আমার মনে হত, বয়েসে আরো ছোট বা মনির মত সুন্দর হলেই ভাল হত।

তিনি রোজ দুবেলা আসতেন। সন্ধ্যের পর কোন কোন দিন অনেকক্ষণ থাকতেন। মা দুবেলাই যত্ন করে

খাবার ও চা দিতেন। কখনও কখনও রাত্রে আমাদের বাড়ী খেয়ে যেতেন। তাঁকে খুসী করবার জন্য আমিও চেষ্টা করতাম। তাঁর ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা এমন মনোরম যে, আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারলাম না।

বন্ধু বান্ধবীদের প্রতি আমার যে প্রণয়াসক্তি ছিল আর মেলা মেসার যে উন্মাদনা ছিল, তা ক্রমে অতীত স্মৃতিতে পরিণত হ'তে চলল। ক্রমে তার স্থান পূরণ করতে এল রাজিব বাবুর প্রতি গুণমুগ্ধতা জনিত শ্রদ্ধার বেশে প্রীতি-ভালবাসা। তাঁর শিক্ষা দানের পদ্ধতি ছিল এমন মনোজ্ঞ যে, তিনি যা শিক্ষা দিতেন, তা যেমন সহজে বোধগম্য হ'ত তেমনি আনন্দ আর তৃপ্তি পেতাম।

আগে স্কুলে খুব ভালভাবে লেখাপড়া করতাম। তাই আমায় শেখাতে তাঁকে বেগ পেতে হত না। আমার বোধ-শক্তির তিনি খুবই প্রশংসা করতেন, আর বলতেন আমায় শেখাতে তাঁর খুব ভাল লাগে। এই য়্যাপ্রিসিয়েসনের মৎলব আমার মনোরঞ্জন করা কিনা, এ সন্দেহ তখন হয়নি। তাঁর প্রশংসা-বিজড়িত মধুর চাউনিতে আমি আনন্দে বিমুগ্ধ হতাম। সেই বয়েসে আমার রূপে যে তিনি কত মুগ্ধ, আর তাঁর ঐ চাউনিতে যে রূপলিপ্সা কতখানি ছিল, তা আমার বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে কতকটা বুঝেছিলাম।

তাঁর প্রতি আমার এ হেন আসক্তি আর তাঁর শিক্ষাদানের গুণে দুবছরের মধ্যে কোন রকম ইংরেজি

বই পড়ে বুঝতে পারতাম। তা ছাড়া অনেক দুরূহ বিষয়ের বই কত করে যে পড়াতেন তা আর কি বলব! কত নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা এমন মিষ্টি করে করতেন যে, আমার নিত্য ঐভাবে নতুন কিছু শেখবার বাসনা নেশাতে পরিণত হয়েছিল।

সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ আদি যাবতীয় বিষয়ে এমন চুলচেরা বিচার-পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন যে, আমি জ্ঞানবৃদ্ধ অর্থাৎ আমার যে এত কচি বয়েস তা মনেই থাকত না। এখন আর আমার মনেই হত না যে তাঁর বয়েস বেশী, আর তিনি গম্ভীর প্রকৃতির। সব, সময় তাঁর সঙ্গলাভের প্রবল বাসনা মনে জাগত। অনেক কঠিন বিষয়ে প্রাক্‌টিক্যাল্ জ্ঞান দেবার জন্য অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান-মন্দির, মিউজিয়াম আদিতে আর নিজের ল্যাবরেটারীতে ছুটির দিন নিয়ে যেতেন; সঙ্গে অনেক সময় মা, কখনও মামাত ভাই বোন, বা মামা মামী থাকতেন। আমার যে কি আনন্দ হত তা বুঝতেই পারছ।

তখন আমার তের চৌদ্দ বছর বয়েস, অঙ্গের কোন কোন স্থানে যৌবনের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা দিয়ে ছিল। নানা বিষয়িনী জ্ঞানের প্রভাবে, মনের ভাবটাও—বেশ ভারী হয়ে ছিল।

এই সময়ে তাঁর প্রতি আমার প্রেমাসক্তি ক্রমে প্রবল হ'তেছিল। তার মধ্যে যে অনেকখানি কামাসক্তি ছিল, এখন তা বুঝতে পারছি।

উঃ। দেখ, ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা কি রকমে ব্যর্থ হয়! প্রাইভেট টিউটার দ্বারা কত অবাঞ্ছিত প্রেমের অঘটন ঘটে, আর তা নিয়ে মেয়েদের ভাগ্যে কত লাঞ্ছনা জোটে তা তোমার মামা-মামার আর মা'ব অবিদিত ছিল না।

তোমার আর রাজিবের মধ্যে যে প্রেম জন্মেছিল তা আদর্শ প্রেম। উভয়ের মিলনও আদর্শভাবেই হয়েছিল। তা যে হচ্ছিল, গুরু-শিষ্যের ভাবে তাঁরা নিত্য প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি ক'রেও ছিলেন। মনে ক'রেছিলেন (যেমন সকলে ক'রত) স্বজাতে একটী ভাল বর জুটিয়ে দিলে, প্রাইভেট মাষ্টারের প্রতি প্রেমজ কামাসক্তি তখন একেবারে উধাও হয়ে যাবে। এ রকম অনেক-স্থলে যেত। আবার অনেক স্থলে যেত না, অনেক কিছু ঘটত।

কিন্তু তুমি ছিলে একটু অসাধারণ মেয়ে, অর্থাৎ রাজিব-বাবুর প্রদত্ত শিক্ষার গুণে তোমার সম্যক্ কন্‌সেন্স গজিয়ে ছিল। কিন্তু তা সংস্কার মুক্ত ছিল না। তাই সতীত্বের একটা গৌরবোজ্জ্বল বিলাস, দৃঢ়ভাবে তোমার কচি মনে জেগেছিল। প্রেমের একনিষ্ঠতাই সতীত্বের একমাত্র ধর্ম্ম ব'লেই তোমার কন্‌সেন্স-অনুমোদিত ধারণা ছিল। যাই

হোক্, প্রাইভেট টিউটার অথবা অন্য জাত বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে মেলা মেশা করতে মা-রাই অনেকস্থলে সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন, তা আর এখানে বলব না। তারপর কি হ'ল বল।

লীনা। স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ভক্তি আদির মধ্যেও যে কামানুরাগের বীজ বেমালুম নিহিত থাক্ত, তা নিত্য প্রত্যক্ষ ক'রেও লোকে বিশ্বাস ক'রত না। বাজিববাবু মামার বন্ধু; তাই মা তাঁকে ভাই বলতেন; তিনিও মাকে দিদি বলে ডাক্তেন। আমিও তাঁকে প্রায় মামা ব'লে ডাকতাম।

উঃ। আর কি ব'লে ডাক্তে ?

লীনা। স্যার, মাষ্টার মশায় ব'লেও ডাকতাম। এই 'মামা' সম্পর্কটাকে গ্যারান্টি মনে করতেন। তিনি আমায় কখনও মুখ ফুটে কোন অনুরাগ জানান নি। আমিও তা তাঁকে জানতে দিই নি। আমার বিবাহ প্রস্তাবের আগে সজ্ঞানে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ব্যতীত আর কোন ভাব তিনি জানতে পেরে ছিলেন বলে বুঝতে পারি নি।

তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা, শিক্ষা দেবার আন্তরিক স্নেহ-সহানুভূতিপূর্ণ ভাব, ভাষা আর হৃদ্যতা-ব্যঞ্জক চাউনি আমায় সম্মোহিত করেছিল। কি আনন্দই না পেতাম! যে শিক্ষা তিনি আমায় দিয়েছিলেন, আমার মনে

হত কোন কলেজে সে শিক্ষা সম্ভব হত না। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা দীক্ষা এমন সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করতাম যে, তার ফলে আমার জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি দেখে তিনি যেমন মুগ্ধ হতেন, আমিও তেমনি ধন্য হতাম। কত চেষ্টা যত্ন করে আমার চিন্তা আর বোধশক্তি যে বাড়াতেন তার অন্ত নাই। এই ভাবে তাঁকে যে কত ভালবেসে-ছিলাম তা আর কি বলব!

আমাকে শেখাবার জন্যে লাইব্রেরী হতে কত বকম বই সংগ্রহ ক'রে, পড়ে, চিন্তা ক'রে তাঁরও জ্ঞান-চিন্তা আর বোধশক্তি যে প্রভূতরূপে বেড়ে উঠেছিল, সেজন্য আমার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাতেন। আব ব'লতেন আমরা উভয়ে উভয়ের জ্ঞানদাতা। এই রকম বলে আমায় এক তর্ফা ওব্লিগেশনের দায় হতে মুক্তি দিতেন, মনে হত। এখন মনে হয়, এ'তে আমাব আত্মমর্য্যাদা বাড়াতেন। এই রূপে দিনরাত সব সময় তাঁর শিক্ষা আর তাঁর চিন্তা আমাব ছেয়ে থাকত।

পনর বছর বয়েসের শেষে আমার বিবাহের সম্বন্ধ খোঁজা সুরু হ'ল। অনেক প্রার্থী দাম দস্তুরে নিরাশ হয়ে, আমার আশা ত্যাগ করলেন। মা'র কথা ছিল, পণ তিনি দেবেন না, যা দেবার তা বে'ব পরে মেয়েকেই দেবেন; পণ দেওয়া মেয়ের পক্ষে অপমানজনক। অধিকাংশ স্থলে পাত্রপক্ষের প্রশ্নেব খুঁত ধ'রে তার

উত্তরে যা ব'লতাম তা শুনেই পালাত। মা'র কাছে সে জন্য গঞ্জনা শুনতে হত।

তখন বিবাহিত জীবনের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যকার সম্বন্ধটা আমার মনে ক্রমাভিব্যক্ত হতে ছিল। তা বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, রাজিব মামা ছাড়া আর কারুর প্রতি আমার কামানুরাগ সম্ভব নয়।

ডাক্তার রায় আমায় ইতোপূর্ব্বে কোথাও দেখেছিলেন, আমার সম্বন্ধে খোঁজও নিয়েছিলেন। তিনি বিনা পণে বিনাসর্ত্তে আমায় বে' করবেন ব'লে ঘট্‌কী লাগিয়েছিলেন।

মা, মামা, মামী বরঘর দেখে এসে, যা ব'লেছিলেন তার মোদ্দা কথাটা এই ছিল যে, এমন পাত্র না কি দুনিয়ায় কারো ভাগ্যে জুটে নি। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ যথারীতি সাড়ম্বরেই চলেছিল। আমি আমার মনকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে ছিলাম, তবু রাজিব বাবুকে কিন্তু ভুলতে পারলাম না। আমার অসম্মতি যে টিকবে না তাও বুঝেছিলাম, দিনলগ্ন স্থির হয়ে গেল, আর মাত্র ১৮ দিন বাকী।

মামীকে অতি সন্তর্পণে আমার অসম্মতির ভাব জানিয়ে অন্ততঃ দিনটা বেশী ক'রে পিছিয়ে দিতে ব'লেছিলাম। তার ফলে এত বকুনি ও লাঞ্ছনা ভাগ্যে জুটেছিল যে পুড়ে মরাই স্থির করতে হয়েছিল।

চার পাঁচ দিন কঠিন চিন্তার পর এ-হেন বিবাহ-সঙ্কট হ'তে উদ্ধারের নানা ফন্দি মাথায় এসেছিল, যেমন চিঠি লিখে মাকে আমার মনের কথা জানান, এ-সঙ্কট হতে 'মুক্তির' উপায় করতে রাজিব বাবুকে লেখা, পালিয়ে গিয়ে রাজিব বাবুর বাড়ী ওঠা ইত্যাদি। কোনটাতে বিশেষ কিছু সুবিধে যে হবেনা তাও বুঝেছিলাম। আর বুঝেছিলাম একমাত্র মৃত্যুই এ-বিবাহের দায় হতে আমায় অব্যাহতি দিতে পারে। অনেক চেষ্টার পর মৃত্যুর উপায় যখন হস্তগত হ'ল তখন ডাক্তার রায়কে কোন রকমে এ-খবরটা জানান উচিত ব'লে মনে হ'ল, অবশেষে তখনকার বিদ্যাবুদ্ধির সমস্ত কেরামতি দেখিয়ে যে চিঠিখানা পাঠিয়ে ছিলাম, তা আমার মনে গাঁথা হয়ে এখনও আছে, শোন ঃ—

শ্রদ্ধেয় বন্ধু,

আপনি যার অন্তর না জেনে, শুধু বাইরের রূপ দেখে শুনে বে' করতে কৃত সঙ্কল্প, আমি সেই লজ্জাহীনা দুখিনী লীনা। বড়ই কাতর হয়ে আপনাকে আমার মনের কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি অন্যকে এমন ক'রে দিয়ে ফেলেছি যে আর ফিরিয়ে নেবার সাধ্য আমার নাই। কিন্তু তিনি তা জানেন না, আমিও দিয়েছি বেহুঁসে

একটু একটু ক'রে আমার সম্পুর্ণ হৃদয়খানি। হৃদয়হীনা লীনা কি আপনার সহধর্ম্মিণীর যোগ্যা হতে পারে!

এ-হেন ভ্রান্তি জনিত আসন্ন মনস্তাপের জ্বালা হতে আপনার গৌববময় ভাবী জীবনকে নিষ্কৃতি দেওয়া আমাবই কর্ত্তব্য জেনে, এই নির্ম্মম চিঠিখানা লিখতে সাহসী হয়েছি। এই চিঠি পেয়েও যদি আমায় বে' করবার সঙ্কল্প ত্যাগ না করেন, তবে অপনাব সঙ্কল্প সিদ্ধ হতে দোব না অর্থাৎ এই বিবাহ হতে দোব না ; তার খানিকটা কারণ হচ্ছে, বে' করে আপনাব বিবাহিত জীবন বিষবৃক্ষে পরিণত হতে না দেওয়া, ইহাই আপনার প্রতি আমার শুভেচ্ছা। আমি বে'র আগে ইহলোক ত্যাগ করবই।

আমায় পত্নিরূপে পাবার আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ ক্ষণিকের তরে পাবেন, আর সেই সঙ্গে নারী হত্যার অনেকখানি কারণ ব'লেও হয়ত সারাজীবন বিবেকের দংশন হতে নিষ্কৃতি পাবেন না। এখন দেখুন, প্রাণপণে আমি আপনার শুভ কামনা করছি। একথা বিশ্বাস ক'রে নিলে, আমি যে আপনার মত মহতের বন্ধু, দয়া ক'রে তাও আপনাকে স্বীকার করতে হয়।

বন্ধুত্বের প্রতিদান মহতেরই কাজ। আপনি কত মহৎ তা জেনেছি তখুনি, যখন "মেয়ে দেখা" ও "বরপন" এর অপমান আর লাঞ্ছনা থেকে অযাচিত ভাবে আমাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

আপনার অনুমতি না নিয়ে পতিত্বের পরিবর্ত্তে আমার হৃদয়আসনে বন্ধুরূপে আপনাকে বরণ করেছি। বড়ই কাতরভাবে মিনতি করছি আমায় পত্নিরূপে পাবার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে আপনার মহৎ হৃদয়ের নিভৃত কোনে অকৃত্রিম বন্ধুরূপে আমায় বরণ করুন। বন্ধুত্বের শুভ কামনা করছি, অচিরে আপনার একটি অধিকতর মনোমত পত্নিলাভ হউক। আমার এই অকপট শুভেচ্ছার প্রতিদানে, দয়া ক'রে আমায় বিয়ে না ক'রে, একটু সত্বর এ বিবাহের অঙ্গীকার প্রত্যাহার দ্বারা আমায় চির বাধিত করুন।

আমি জানি, আপনি আমায় প্রত্যাখ্যান করলেই অবিলম্বে আর এক পাত্র জোটাবেন, তিনি গেলে, এমন আর এক জন হয়ত আসবেন, যিনি কোন বাধাই মানবেন-না। তখন আমাকে ইহলোক ত্যাগ করতেই হবে, সেজন্য আমি প্রস্তুত আছি।

বলতে পারেন, মৃত্যুই যখন এ-হেন মুস্কিল আ-সানের শেষ উপায়, তখন এখনই মরি না কেন? সেই কথাই ত এখন নিয়ত ভাবছি, তাতে যে একটা মস্ত অবোধ্য 'কিন্তু' এসে পড়ছে, তা হচ্ছে জীবনের 'মায়া'।

এই 'মায়া' অবোধ্য হলেও, জীব মাত্রেই এই মায়াতে আবদ্ধ বলে জীব জগতের অস্থিত্ব সম্ভব হয়েছে। জীবন ভোগের অফুরন্ত কামনারূপ ইন্সটিংকটকে বেহুঁসে

সম্বল ক'রেই জীব জন্মে। আমিও জন্মেছি, আত্মহত্যাতে এই বয়েসে কামনা ত্যাগ জনিত মনস্তাপ যে কত ভোগ করছি, তা ভাষায় ব্যক্ত করবার শক্তি আমার নাই।

আপনি দয়া ক'রে আমায় ত্যাগ করলে, আর যে ক'টা দিন বেঁচে থাকব, সেই ক'টা দিন অনন্ত দুঃখের মধ্যেও আপনার মত সুহৃদ লাভের গৌরবমণ্ডিত জীবনটুকু ভোগ করতে পারব, আর যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আমার হৃদয়-দর্পণে দেখতে পাব তাঁকে যাঁকে .....

বন্ধু! বন্ধু!! বন্ধু!!! বিদায়।

আপনার বন্ধুত্ব প্রার্থী—

লীনা

দেখ, আর—

উঃ। থাক্, আর বল্‌তে হবেনা।

তোমার প্রথম জীবন বিশ্লেষণ দ্বারা ভাল লাগা হতে ভালবাসা, তা থেকে ভালবাসার ক্রম-পরিণতির চরম পর্যায় কামানুরাগ, যা সর্ব্বজীব-সুলভ প্রবৃত্তি, তা কেমন ক'রে মনে জেগে উঠে, তাই তোমায় দেখাতে চেয়েছিলাম, আশা করি এ-থেকে অনেকখানি সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছ।

লীনা। নিশ্চয়, আর সেকালে এই গ্রহের প্রায় সমস্ত মানুষ মিথ্যাপ্রবণ হয়েছিল কি ক'রে তাও বুঝলাম।

উঃ। কিন্তু শৈশবে, বাল্যে এবং কৈশোরে তোমার বেহুঁসে যা ঘটেছিল, তার অনেক হয়ত ভুলে গ্যাছ। আর হুঁসেও হয়ত এমন অনেক কিছু ঘটেছিল, যা তোমার তখনকার জ্ঞানেব মাপকাঠিতে এত কুৎসিৎ ও অনন্যসাধারণ যে তোমার অবচেতন মন তা জাগ্রত মনের অগোচরে চেপে রেখেছে। তুমি এখন চেষ্টা করলে অবচেতন মনকে অবদমিত ক'রে তা ধরতে পারবে।

লীনা। তা কতকটা সত্য।

উঃ। যাক্, আপাততঃ সে আলোচনার আবশ্যক নাই। তারপর সতীত্বের ধারণা, দেশকাল-পাত্র-ভেদে বহু প্রকার। এমন কি এক সমাজের মধ্যে নারী বিশেষের সতীত্বের সাধনাও অল্পাধিক বিভিন্ন প্রকৃতির।

সাধারণতঃ পতি বর্ত্তমানে বা পতির মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের সঙ্গে কেবল-মাত্র যৌন-মিলনে প্রবৃত্ত না হলেই সতীত্ব অটুট থাকে, এই ধারণাই সাধারণত প্রবল। কিন্তু তোমার সতীত্বের ধারনা ছিল (বিবাহ হোক্ বা না হোক্ অথবা প্রণয়ী মৃত হলেও) নিষ্ঠার সহিত আমরণ একমাত্র পুরুষের প্রেমে আবদ্ধ থাকাই সতীত্বের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

এই রকম ধারণা থেকেই হয়ত সেকালে এই গ্রহে হয়েছিল সহমরণ প্রথার সৃষ্টি। আবার অনেক দেশে বা সমাজে এক পতিকে বহুনারী বিনিময়ে তাদের হৃদয়

নাকি পুরোপুরি দিয়ে পতিত্বে বরণ করত। এই পতি-পুঙ্গবও বিবাহের মন্ত্রানুযায়ী পরে সকল ধর্ম্মপত্নীকে ভগবান্ সাক্ষী ক'রে সম্পূর্ণ হৃদয় দেবার অঙ্গীকার ক'রত!

আগে বলেছি, অনেক সভ্য-অসভ্য সমাজে এক সতী নারীর অনেক ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহিত পতি সত্ত্বেও সতীত্বের মর্য্যাদা অটুট থাকত। এ ছাড়া আরও বহু প্রকারের সতীত্বের নিদর্শন বহু জাতির মধ্যে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত ছিল। এই সকল বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পত্নীব কোনও রকমে সতীত্ব রক্ষা। পতির নয়।

কোন কোন ধর্ম্মের দেশে আবার কেবল কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থেব প্রয়োজন হেতু হ'ত বিবাহ। সেখানে এক-জনের বিবাহিত পত্নী, পরিবারের অন্য লোকেরও কামেচ্ছা চরিতার্থের প্রয়োজন সিদ্ধ করত।

এত সব সত্ত্বেও এই গ্রহের প্রায় সকল দেশে সতীত্বের ব্যভিচার অবারিত ছিল। এ-বিষয় পূর্ব্বেও তোমায় দেখিয়েছি।

আচ্ছা, তুমিওত প্রথম যৌবনের উন্মেষে, বিবাহ হ'তে না হ'তে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছিলে। এখন বলত, তোমার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তোমার সতীত্বের ধারণা অবিচলিত ছিল?

লীনা। না, এ-যে একটা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলাম, তখন—

উঃ। একটু থাম, এই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন ক'রে আগের প্রশ্নটা পূরো করি। বলত—এখন তুমি যদি কোনগতিকে বেঁচে যেতে, তবে তোমার লিবিডোকে নিয়ে কি করতে ?

লীনা। কি আর করতাম! কামেচ্ছা দমনের বা সংযমের নানাবিধ বিধি নিষেধ আর ব্যবস্থা, বহু দেশের হরেক রকম নীতিবেত্তাদের বচন শুনে ও শাস্ত্র পড়ে হদ্দ হয়ে গেছলাম। কামেচ্ছার বিরুদ্ধে কসরৎ করতে করতে চিন্তাশক্তি (যে-কোন বিষয়ে) ক্লান্ত অলস হয়ে পড়ে ছিল; কোন কাজ বা চিন্তা সঙ্গতভাবে করে উঠতে পারতাম না। আমার আবার প্রেমহীন কাম ধাতে সইত না, তার মানে পূর্ব্ব ধারণার লেশ তখনও ছিল। অনেক ভেবে চিন্তে বুঝেছিলাম শরীর আর চিন্তাশক্তিকে অব্যাহত আর কর্ম্মক্ষম রাখতে হ'লে প্রকৃতির ন্যায্য দাবী পূরণ করতেই হয়; সেজন্য একজন এমন প্রেমাস্পদ—

উঃ। আমার মনে হচ্ছে, রাজীব বাবুর স্মৃতি তোমার বিদেহী মনকেও সদ্য এমন বিচলিত করেছে যে, মন বিশ্লেষণের মত ফেলাও ক'রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। যদি তুমি প্রীত হও, তবে আমি তোমার হয়ে গোড়া থেকে, তোমার লিবিডোর স্বরূপ বর্ণনা করছি। যদি ভুলচুক করি শুধরে দিও —কেমন ?

লীনা। আচ্ছা।

উঃ। প্রকৃতির যে নিয়মে নরনারীর হৃদয়ে কাম পূর্ণ বিকশিত হওয়া উচিত, ঠিক সেই নিয়মেই তোমার হৃদয়েও কামেচ্ছা, অবশেষে একমাত্র রাজীব বাবুকে আশ্রয় ক'রে কতকটা বেহুঁসে, অর্থাৎ পরিণাম চিন্তা শূন্য যৌবনের তৃপ্তি আর মাধুর্য্যে জীবনকে ক'রেছিল উদ্বেলিত।

হেনকালে স্বজাতের একটি অপরিচিত পাত্রকে প্রেমানুরাগশূন্য বিবাহ আর তার পরক্ষণেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন মিলনরূপ বিধান, যা রেপেরই তুল্য, আর তোমার ভব্য লিবিডোকে, পূর্ব্ব প্রেমাস্পদের আশ্রয়চ্যুত করবার প্রস্তাব, তোমার মনে সমাজের বিরুদ্ধে সন্দেহ দিলে জাগিয়ে। তখন হরেক রকম দুর্ব্বার চিন্তার মধ্যে তুমি দেখলে (বা অনুসন্ধানের পর আবিষ্কার করলে) সমাজটা দাঁড়িয়ে আছে এক ক্ষুদ্র শ্রেণীর স্বার্থপ্রণোদিত নিছক মিথ্যার ওপর।

ঐ মিথ্যার যত সব দোসর তোমার দৃষ্টির সামনে একটার পর একটা প্রকট হয়ে তোমার মনোরাজ্যে আলোড়ন বা বিদ্রোহ সৃষ্টি করল। এর ফলে সত্য উপলব্ধি করবার ব্যাকুল আগ্রহ (তথাকথিত সত্যাগ্রহ নয়) উদ্বুদ্ধ হল। এ থেকে তোমার মন প্রবল প্রতাপান্বিত সমাজের বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দ্বিধাবোধ করল না।

মাঝে থেকে একটা কথা তোমায় আবার মনে করিয়ে দিই—এ সত্ত্বেও এতদিন পরে তোমার শরীরের ও সেই সঙ্গে তোমার সমাজ সমেত পৃথিবীর সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে, এই অনন্ত বিশ্বে এসেও, এই গ্রহে (যার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধই নাই) অতীতের প্রত্যক্ষ মিথ্যাকে মিথ্যা ব'লে স্বীকার করতে তোমার মন আঁতকে ওঠে এখনো কেন? তোমার ভাবে আমি লক্ষ্য—

লীনা। মানুষের মন সংস্কার রূপ নেশায় এমনি আচ্ছন্ন অথবা এও বলা যেতে পারে জাগ্রত মনের ওপর অবচেতন মনের প্রভাব।

উঃ। থাক্, এখন যা বলছিলাম তা বলি,—ডাক্তার রায় আর রাজীব বাবুরও লিবিডো অনুরূপ ধাক্কা খেয়ে, অনুরূপ ভাবে সমাজ আর আত্মীয়-স্বজন-দ্রোহী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই তিনটি বিদ্রোহী মনের ষড়যন্ত্রে সমাজ-বিধান ভেঙ্গেচুরে তিনের মনোরাজ্যে হঠাৎ রেভলিউশন সংঘটন দ্বারা তিন জনেরই লিবিডো বেশ পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

এখন তুমি বল্‌তে পার ডাক্তার রায়ের লিবিডো তৃপ্ত হল কিসে?

হয়েছিল একটু অসাধারণরূপে, "মন্মথ (লিবিডো) দুর্নিবার", এটা চিরস্বীকৃত সত্য। কোন কোন অতি উন্নতিশীল, সংযত-মনা ব্যক্তি যৌন মিলন অভাবে অন্য

উপায়েও "দুর্নিবার মন্মথ"কে সংযত রেখে, শান্ত করতে সেকালেও যেমন পারতেন, একালেও তেমনি পারেন। সেকালে এই গ্রহে নানাদেশে যুগে যুগে যৌন মিলনের উপায়বিহীন বিশিষ্ট যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, বিপত্নীক, মহাপুরুষ, গুরু, কবি, আদি যে কোন মহামহিম ব্যক্তি "দুর্নিবার মন্মথ"কে অসাধারণ ভাবে তৃপ্ত ক'রেও শরীর মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করতেন।

লীনা। কিরূপে ও কেন ? আর একটু খুলেই বল।

উঃ। ঐরূপ ব্যক্তিদের এক বা একাধিক স্নেহাস্পদ জুটত। তারা হ'ত পঞ্চইন্দ্রিয় রঞ্জনকারী সুদর্শনা, সুমধুর-ভাষিণী, সুকণ্ঠী, সুগন্ধা বা সুখস্পর্শা ইত্যাদি। এ হেন স্নেহাস্পদের মমতা-বিজড়িত সান্নিধ্য, সাহচর্য্য তাঁদের লিবিডোকে অনেকখানি সোয়াস্তি, তৃপ্তি আর শান্তি দিত। তোমার পূর্ব্ব-স্মৃতিতে এর অনেক নিদর্শন খুঁজে পাবে। নারীর মধ্যেও পাবে।

কেন করত তাত বুঝতেই পারছ। শারীরিক স্বাস্থ্য বিশেষ করে মনকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত রাখতে, ক্রম-বিকাশের পথে চিন্তাশক্তিকে অসাধ্য সাধন উপযোগী করতে "মন্মথ"কে কোন প্রকারে তৃপ্ত সংযত রাখাই প্রকৃতির বিধান।

তোমার বন্ধুত্বের আন্তরিক সুখ সাহচর্য্য, আর তোমার সুমধুর সান্নিধ্য, ডাক্তার রায়ের লিবিডোকে শান্তি-স্বস্তি

দিত। তার ওপর তোমার মত নারী-রত্ন পেয়ে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তোমার প্রণয়াস্পদের হাতে তোমাকে সম্প্রদান রূপ মানবতার এত মহান্ ধর্ম্ম সম্পাদন জনিত আত্মপ্রসাদ তাঁর মনকে এমন শান্তরসাপ্লুত করেছিল ব'লেই যৌন-মিলন প্রবৃত্তি তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে পারেনি। তাঁর শরীর ও মন ক্রমে উন্নত হয়েছিল।

আবার অন্য দিকে দেখ, রাজীব বাবুর মৃত্যুর পর তোমার—

লীনা। থাক্।

উঃ। আচ্ছা, এখন দেখ, তোমাদের তিন প্রেমিকের মনোরাজ্যে (যত সামান্যই হোক্) রেভলিউশন, সংঘটনের ফল শুভ হয়েছিল। সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে, অর্থাৎ সার্ব্বজনীন সত্যের পথে চালিত যে কোন প্রকার রেভিলিউশন্ কখনও মানব জাতির অকল্যাণ সাধন করে না।

লীনা। এই গ্রহবাসীদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু দেখাও আর বল।

উঃ। ধর্ম্ম বল্‌তে যদি রিলিজান মনে ক'রে থাক, তবে দেখাতে আর বলতে ত বেশী কিছু বাকী রাখিনি। আচ্ছা তবু কিছু বলছি সংক্ষেপে। ধর্ম্ম অর্থে তুমি রিলিজান মনে করছ ত?

লীনা। তা নয়ত আর কি?

উঃ। বাংলা ধর্ম্ম শব্দের হরেক রকম অর্থ হয়। প্রধান দুটি অর্থের একটি এই যে—স্বভাব, প্রকৃতি বা গুণ (virtue), অন্যটি রিলিজান অর্থাৎ ধর্ম্মতন্ত্র।

তোমাদের কবিগুরু বল্‌ছেন—

"মনে রাখা দরকার, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মতন্ত্র এক জিনিষ নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। * * *

ধর্ম্ম বলে—মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁৎ বলে না মনে কর তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হবে। ধর্ম্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা, বিশেষ তিথিতে অন্ন জল তুলে দেয়, সে পাপকে লালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম্ম বলে, সাগরগিরি পার হয়ে পৃথিবীটাকে দেখে লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করে নাকে খৎ দিতে হবে। ধর্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়, ধর্ম্মতন্ত্র বলে যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড়

অভাজনই হোক মাথায় পা তুলবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র গড়ে ধর্ম্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র গড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।”*

এই কথাগুলি বিশেষ একটি ধর্ম্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখিত। লেখবার ভঙ্গিটি সুন্দর, তাই উদ্ধৃত করলাম। অথরিটি হিসাবে নয়। কারণ এর উল্টো কথাও তিনি বলেছেন। ধর্ম্মের ঐ দুটি অর্থ সম্বন্ধে আমরা এখানে দেখব। আগে প্রথমটির কথা বলি।

সেকালে এই গ্রহে, গোড়াতে ধর্ম্ম বলতে স্বভাব, প্রকৃতি (Nature), গুণ (Virtue) বোঝাত। এখন আবার এখানে তাই বোঝায়। শেয়াল রাতের বেলা হুক্কা হুয়া শব্দ করে; এটা শেয়ালের স্বভাব-ধর্ম্ম। রিলিজান নয়।

ধাতু গরম হলে আয়তনে বাড়ে। এটাও ধাতুর রিলিজান নয়। ধাতুর গুণ বা ধর্ম্ম।

ক্ষুন্নিবৃত্তি বা আত্মরক্ষা (Selfp-reservation) আর যৌন প্রবৃত্তি (instinct), জীব মাত্রেই স্বভাব, প্রবৃত্তি বা সহজাত ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য জীবের মত তা সীমাবদ্ধ নয়। একেও রিলিজান বলতে পার না।

ইভলিউসন থিওরি অনুযায়ী অন্য জীবের প্রবৃত্তি আর প্রকৃতির উন্নতি এত অধিক বিলম্বিত যে, তা সীমাবদ্ধ বললে অসঙ্গত হবে না। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়

---

* “কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম,” ১৮পৃষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথ।

বলে, তার প্রকৃতিদত্ত স্বেচ্ছাচারী সংজ্ঞান-স্বভাব বা চেতনা, উন্নতি বা অবনতির পথে অপেক্ষাকৃত অনেক দ্রুত গতিশীল।

দল বা সমাজ-বন্ধন-প্রবৃত্তি অন্য অনেক জীবের মত মানুষেরও সহজাত ধর্ম্ম। কিন্তু মানুষের বেলায় সমাজ-বন্ধন-পদ্ধতি সীমাবদ্ধ নয়। ক্রম-প্রগতিশীল।

সহজাত বলছি যে জন্য তা হচ্ছে, সমাজবদ্ধ হয়ে থাকবার অনিবার্য্য প্রবৃত্তি নিয়ে অন্য জীবের মত মানুষও জন্মে। জন্মের পরেই মা, ধাই বা অন্য কোন মানুষের সহানুভূতি, স্নেহ, যত্ন আদি ব্যতীত শিশু যেমন বাঁচতে পারে না, সেই রূপ বয়স্ক মানুষেরও আমরণ সর্ব্ব বিষয়ে অন্যের বা সমাজের সহানুভূতি আদি সাহায্য অপরিহার্য্য। কাজেই এই সমাজ-বন্ধনের সুপ্ত প্রবৃত্তি (Herd instinct) সঙ্গে নিয়ে মানুষ ভূমিষ্ঠ না হলে, এই গ্রহে মানুষের মত দ্রুত প্রগতিশীল সমাজবদ্ধ জীবের অস্তিত্ব সম্ভব হত না। কাজেই এই সহজাত সমাজবন্ধন-প্রবৃত্তিকেও রিলিজান বলা চলে না।

এখানে বলে রাখি সমস্ত গ্রহের মানব জাতিকে সমাজ-বন্ধনে, প্রকৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যা সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে তা হচ্ছে মৈত্রী। এই সার্ব্বজনীন মৈত্রী এখন সম্ভব হয়েছে—এখানে, এই গ্রহে, যেখানে পারস্পরিক শুভেচ্ছা-প্রণোদিত পারস্পরিক মৈত্রী, সহানুভূতি সাহায্য আদি অকপট, অকুণ্ঠ, অজস্র ভাবে বিদ্যমান।,

মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ সমাজের সর্ব্ব-মানবীয়তন্ত্র, অর্থাৎ সমাজ-ইতি-কর্ত্তব্যতার সার্ব্বজনীন ব্যবস্থাই সমাজতন্ত্র বা কমুনিজম্। এই সমাজ-গঠন-প্রবৃত্তিও মানুষের সহজাত স্বভাবধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম মানুষের অর্জ্জিত নয়, সীমাবদ্ধও নয়।

লীনা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ-প্রবৃত্তির লক্ষণ বা অভিব্যক্তি দেখতে পাই নি ত?

উঃ। ভাবী বিকাশ বা স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা বিশিষ্ট মানুষের কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি সুপ্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে, সদ্যজাত শিশুর মনে অন্তর্নিহিত থাকে। বয়স আর জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তা' স্ফূর্ত্ত হয়। যৌন আর সমাজ-বন্ধন প্রবৃত্তি ঠিক ঐ প্রকৃতির।

জন্মের কয়েকদিন পরে যখন শিশুর দৃষ্টিশক্তি ক্রমে বেড়ে ওঠে, তখন একলা কিছুক্ষণ থাকতে হ'লে, শিশু অস্বস্তি বোধ করে। কেউ কাছে এলেই স্বস্তির ভাব মুখে ফোটে। আবার ঘুম থেকে জেগে, কারুর সাড়া না পেলে বা কাউকে দেখতে না পেলেও শিশু কাঁদে। এই সঙ্গ-লাভের বাসনা সহজাত। তা শিশুর মনে কেউ জাগিয়ে দেয় না। তুমি ছেলের মা, তুমি নিশ্চয় এটা প্রত্যক্ষ করেছ।

লীনা। তখন এ সকল ব্যাপার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিনি বলে, এর রহস্য ধরতে পারিনি।

আচ্ছা! আর এক কথা, মানুষ যদি এ হেন মৈত্রী তথা সমাজতন্ত্র-প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মে, এই গ্রহে তবে রেভলিউ-

সনের আগে মানুষ এত ভ্রাতৃদ্বেষী, মানুষ-বিদ্বেষী, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, হীন দুর্নীতিপরায়ণ, এক কথায় সমস্ত গ্রহ জুড়ে প্রভু-দাস-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়েছিল কেমন করে ?

উঃ। তোমার এই প্রশ্নটিই সন্দেহ-বাদের একেবারে মোক্ষম কথা। সত্যানুসন্ধিৎসা আর সমাজতন্ত্রবাদের এটি মূল প্রশ্ন বা সমস্যা। এই সন্দেহই তোমার মনে বিশদভাবে জাগাবার চেষ্টা এতকাল করছিলাম। এই প্রশ্নটি তোমার মনে জেগেছে এবং তা তোমার অন্তরে সুস্পষ্ট হয়েছে দেখে কৃতার্থ হ'লাম। এই সন্দেহের ফলে সত্যানুসন্ধান দ্বারা সত্য জ্ঞান লাভ করাই তোমার কাম্য ছিল।

তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে, কেবলমাত্র মানুষেই সম্ভব, এমন একটি বিশিষ্ট সহজাত প্রবৃত্তির কথা বললে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে সুবিধা হবে।

এই গ্রহের সকল জীবের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধিজীবী মানুষই, সত্যানুসন্ধান আর নতুন নতুন সত্যের ধারণা করবার অথবা অনন্ত জ্ঞানার্জ্জনের (পরমার্থ জ্ঞান নয়, বাস্তব জ্ঞানার্জ্জনের) ভাবী সম্ভাবনা বিশিষ্ট সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

মানবেতর জীবও জ্ঞানের ঐ সম্ভাবনা কতকটা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সত্য, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ।

এসব কথা আগেও অনেক কিছু তোমায় বলেছি। এখন তুমি বেশ বুঝছ—ক্রমে তোমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি যেমন

বাড়ছে, অর্থাৎ তোমার সংজ্ঞান মনের ওপর নির্জ্ঞান আর অবচেতন মনের আশৈশব অর্জ্জিত মিথ্যার প্রভাব যেমন কমছে, তোমার বোধশক্তিও তেমনি উত্তরোত্তর বাড়ছে; তার মানে মিথ্যা ভক্তিবাদ আর তার বাহন ভেনগ্নোরী-রূপ ব্যাধি দ্বারা কবলিত চিন্তাশক্তি ক্রমেই যত ঐ রোগ-মুক্ত হচ্ছে, অর্থাৎ যে ভক্তিরূপ গণ্ডীদ্বারা সেকালের মানব-জাতির চিন্তাধারা সব দিক্ হতে আবদ্ধ ছিল, তা ভেদ করে যত প্রসার লাভ করছে, তোমার চিন্তাধারা আর বোধশক্তি তত বাড়ছে। আর সেকালের মানবজাতির অর্জ্জিত স্বভাবগত মিথ্যার প্রহেলিকা ক্রমশঃ তত সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছ। তাই কয়েকটা বিষয়, দ্বিরুক্তি দোষে দুষ্ট হলেও, অনেকবার ধরে ক্রমে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করতে হচ্ছে।

এখন আগের কথায় ফিরে আসা যাক্। ইভলিউসন থিওরী অনুযায়ী আদি জীব 'এমিবা' হতে সুরু করে, ক্রমোন্নত কোটী কোটী স্পিসিজে পরিণতির মধ্য দিয়ে, জীবের চেতনা, ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধি, এক কথায় জ্ঞান ক্রম-উন্নত হতে হতে মানুষের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী স্পিসিজ পর্য্যন্ত তা সীমাবদ্ধ থেকে, অবশেষে মানুষেই সেই জ্ঞান, সীমা অতিক্রম করে অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনায় এসেছে। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি, অভাব বা দারিদ্র্যবোধ, ইচ্ছা আদি যাবতীয় শক্তি ক্রম বর্দ্ধনশীল ও অনন্ত হয়েছে।

জ্ঞানার্জ্জন-প্রবৃত্তিও মানবের সহজাত এবং শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তা স্ফূর্ত্ত ও উন্নত হতে থাকে; উন্নতির এইরূপ অবাধগতিই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু সেকালে অতি ক্ষুদ্র প্রভুশ্রেণীদ্বারা সেই গতি অস্বাভাবিক-রূপে রুদ্ধ হয়েছিল—কেমন করে, তা আবার বলছি।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, ঐ ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানের সাহায্যে বা অপব্যবহারে, এক বা একাধিক প্রবৃত্তি, নিজের অন্য প্রবৃত্তির ওপব প্রভাব বিস্তার ক'রে, সেই প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বিকৃত, বা কখন সম্যক্ উন্নত করবাব ভাণ করত। অন্য মানুষের প্রবৃত্তির বা অন্য সমাজের প্রভাবেও মানব-প্রকৃতি ঐ প্রকারে পরিবর্ত্তিত হত। আবার নৈসর্গিক অথবা ভিন্ন পরিবেষ্টনীব চাপেও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে এক বা একাধিক অর্জ্জিত কুপ্রবৃত্তিতে পরিণত হত। এই কাবণে মানুষ এত বিভিন্ন প্রকারে দুর্নীতিপরায়ণ হতে পেরেছিল। এই কারণেই আদিতে কয়েকটি মানুষ হীন স্বার্থ-সর্ব্বস্ব হতে পেরেছিল। আব সেই স্বার্থপর চালাক মানুষরাই অগণিত জনগণকে হীন, দরিদ্র দাসে পরিণত করতে পেরেছিল।

অন্য জীবের সহজাত প্রবৃত্তি বা স্বভাব কিন্তু এত সহজে ঐরূপে পরিবর্ত্তিত হতে পারে না। কারণ তাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কাজেই তাদের সমস্ত প্রবৃত্তি এবং স্বভাবও সীমা-বদ্ধ। তাই তাদের প্রবৃত্তি সুসমঞ্জসরূপে সংযত।

কিন্তু মানুষের এই স্বভাবের বিকৃতি বা প্রবৃত্তিগুলির অসঙ্গত অসংযত পরিণতির ফলে প্রভু-দাস তন্ত্রের প্রবর্ত্তন আর অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছিল।

সেকালের মানব-সমাজের প্রবৃত্তির বিকৃতি সম্ভূত, শুধু অর্জ্জিত নয়, instilled কুস্বভাব বা কুচরিত্র জনিত যত কিছু দুর্নীতি চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়ে, মানবজাতির ক্রমোন্নতিশীল স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা virtue পুনঃপ্রবর্ত্তনই গত সার্ব্বলৌকিক রেভলিউসনের সার্থককীর্ত্তি। যতদিন মানব-সমাজ থাকবে ততদিন ত্রিসন্ধ্যা ঐ কীর্ত্তি স্মরণ করে ধন্য হতে থাকবে।

লীনা। এই কীর্ত্তি দেখে-শুনে আমার মন অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্বেলিত হচ্ছে। এখন এই গ্রহে মহামানবেরা যে অতুলনীয় আনন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুভব করছে, সে কালের কোন মানুষের কি তার কণামাত্র কল্পনাতেও ধারণা করবার শক্তি ছিল। তাদের আদর্শ ছিল স্বর্গ। তাও দুর্নীতির আকর ছিল।

উঃ। তোমার আনন্দ দেখে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আচ্ছা! এখন দেখ, কি করে মানুষের জ্ঞান নিত্য ক্রম স্ফুর্ত্ত আর ক্রমে সক্রিয় হয়। দৃষ্টিশক্তি লাভ ক'রে, নবজাত শিশু নতুন বিশেষ কিছু দেখলে, তার মুখমণ্ডলে হঠাৎ যে ভাব ফুটে ওঠে, তা হয় প্রথমে সন্দেহসূচক, তার মানে—ওটা ভাল কি মন্দ এই সন্দেহ জাগে।

পরক্ষণে যে ভাব শিশুর মনে দেখা দেয় তাহা অনুসন্ধিৎসা (অর্থাৎ সত্যানুসন্ধিৎসা)। অনুসন্ধানের পর ভাল মনে হলে, তৃপ্তি বা প্রীতি শিশুর মনে জাগে। আর মন্দ ঠেকলে ভীতি বা বিরক্তির ভাব শিশুর মুখে আর শরীরে সুস্পষ্ট হয়। এইরূপে শিশুর মনে কোন কিছু সম্বন্ধে প্রথমে হঠাৎ আসে সন্দেহ, পরক্ষণে তা ভাল কি মন্দ—তার অনুসন্ধান; তার পরে অন্যের ইঙ্গিত ব্যতীতও নিজের সহজাত চেষ্টায় শিশু ভাল মন্দের বিচার-লব্ধ সত্যের আবিষ্কার করতে পারে। তারপর পরবর্ত্তী জীবনে ক্রমে অর্জ্জিত স্বয়ংক্রিয় সেই মানবীয় জ্ঞান, বা বিবেক-বুদ্ধি, নিজ পারিপার্শ্বিক সমাজের ও বিশ্ব প্রকৃতির সাহায্য-লব্ধ ক্রমোন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সত্যের পথে অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভ করতে মানুষ পারে।

এই গ্রহে সেকালেও সর্ব্বমানবের দৃষ্টিভঙ্গি ঐরূপে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হতে পারত। মিথ্যার লেশমাত্রও মানুষের মনে জাগত না।

আবার এও পূর্ব্বে দেখিয়েছি যে শৈশবে, কথা বলার সুরুতে, 'কি' ও 'কেন' আদি প্রশ্নদ্বারা শিশু সত্যানু-সন্ধিৎসা প্রকাশ করে। এই অনুসন্ধিৎসা জনিত জ্ঞানার্জ্জন-প্রণালী, কেউ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুকেও শেখায় না। তাই জ্ঞানার্জ্জন-প্রবৃত্তিও মানুষের সহজাত স্বভাব ধর্ম্ম।

এই জ্ঞানার্জ্জন-পদ্ধতিটা এত সহজবোধ্য যে তুমি নিজের চেষ্টাতে এর সত্য উপলব্ধি করতে অনায়াসে পার। কারণ তোমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি জন্মেছে।

লীনা। মৃত্যুর পর এখানে এসে তোমার সাহায্যে আর এখানকার সব কাণ্ড কারখানা দেখে শুনে, সত্যের ধারণা করবার প্রকৃত শক্তি কিছুটা জন্মেছে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু হাতে কাজে কোন সত্য ত আবিষ্কার করতে এখনও পারিনি। তবে পারব বলে মনে হচ্ছে। এইতে তুমি বলতে পার আমার দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা আরও অনেক দেখতে শুনতে হবে। আমার মনে হয়, রেভলিউসনের অব্যবহিত পরে আর পূর্ব্বে অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকদেরও অনেকের এখনকার মত এমন সর্ব্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক মত জন্মাতে পারত না। কারণ পারিপার্শ্বিক লোকমত তখনও অত্যন্ত ভক্তি-ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। তার প্রভাব বৈজ্ঞানিকদের অনেকে এড়াতে পারত না।

এ সওয়া আরও অনেক সহজাত এবং অর্জ্জিত স্বভাব-ধর্ম্ম মানুষের আছে। এই ধর্ম্ম শব্দের পরিবর্ত্তে রিলিজান, যার মানে ধর্ম্মতন্ত্র, তা চলে না।

এখন ভিজুয়েলাইজ কর, সেকালে সহজাত জ্ঞানার্জ্জন-প্রবৃত্তির প্রেরণায় শিশু যখন প্রথমে 'কি'ও 'কেন' আদি প্রশ্ন করত, তার উত্তর যদি সর্ব্বদা এমন বৈজ্ঞানিক সত্য

হ্'ত, যা সেই সত্যানুসন্ধিৎসাকে ক্রমে আরও উদ্দীপিত, আনন্দদায়ক ও ক্রম-উন্নত করত, এবং উত্তরদাতাগণ যেখানে সত্য উত্তর দিতে অক্ষম হতেন, সেখানে যদি তাঁরা অকপটে অজ্ঞতা স্বীকার ক'রে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করতেন, কিম্বা যে সকল উপায়ে, শিশু কিম্বা বয়স্ক মানুষের সন্দেহপ্রবণতা, সত্যানুসন্ধিৎসা অথবা জ্ঞানার্জ্জন-লিপ্সা ঘুচিয়ে দেওয়া হত, সেই সকল উপায় যদি প্রয়োগ করা না হত, তবে এই গ্রহের মানুষগুলি সত্য জ্ঞান বর্জ্জিত হত না। তা'হলে মিথ্যার প্রচলন আবশ্যক হত না; সমস্ত প্রবৃত্তি, বিশেষ করে পূর্ব্বোল্লিখিত বিশিষ্ট চারটি ইনিষ্টিংট্-এর সুসামঞ্জস্য রক্ষা করে সংযত হতে পারত। তা হলে ভক্তিবাদের মিথ্যা ধাপ্পা, প্রতারণা আদি সমস্ত দুর্নীতির পরিবর্ত্তে, ক্রমোন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলে মানুষের সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে মানুষ সৎচিদানন্দে (সত্য জ্ঞানানন্দে) চির অগ্রসর হতে পারত। তা হলে মানবজাতি কখনও ভ্রাতৃদ্বেষী বা মনুষ্যদ্বেষী, হীন-স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, সকল বিষয়ে দুর্নীতিপরায়ণ অমানুষিক স্বভাব বিশিষ্ট হত না। এখন বুঝলে?

লীনা। কেমন করে এমনটি হয়েছিল তা তুমি আগেও অনেক কিছু বলেছিলে। তবুও ঠিক মত ধারণা করতে এখনও যে পারছি না?

উঃ। এবার নিশ্চয় পারবে। ধর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত দুটি

অর্থের প্রথমটি যে Virtue, স্বভাব বা প্রকৃতি তাত তুমি বুঝেছ ?

লীনা। তার মানে জ্ঞান-বিজ্ঞানই মানুষের সহজাত প্রকৃত পরম-ধর্ম্ম।

উঃ। আচ্ছা! রেভলিউসনের আগে মানুষ বিজ্ঞান-বিরোধী বা সমাজ-দ্রোহী ছিল কেন ? আর ধর্ম্ম শব্দেব দ্বিতীয় অর্থ যে রিলিজান (ধর্ম্মতন্ত্র), তা কি ? ও কেমন করে উদ্ভাবিত আর প্রচলিত হয়েছিল, তা একটু সহজ ভাষায় আবার বললে বুঝতে পারবে—কি করে এমনটা হয়েছিল।

লীনা। এতকাল কি তবে অসহজ ভাষায় বলছিলে ?

উঃ। সত্যই, একটু অসহজ ভাষায় বলতে হয়েছিল। কারণ সেকালে শ্রোতা বা পাঠকের ভেন সেন্টিমেণ্টকে, অর্থাৎ বৃথা ভাবপ্রবণতাকে, যে যত মিথ্যা ভেনগ্লোরীর সুগারকোটিং দিয়ে বলত বা লিখত, সে তত উৎকৃষ্ট বক্তা বা লিখিয়ে বলে খ্যাতি ত লাভ করতই, অধিকন্তু সাহিত্যিক, দার্শনিক, নেতা, অবতার, কবি, গুরু আদি ব'লে দুহাতে পকেট ভর্ত্তি করত।

সত্য কখনও ভেনগ্লোরীর সমর্থক বা পোষক হতে পারেনি। না হলে, সত্য অপ্রিয় হত। অপ্রিয় সত্য সহজ ভাষায় বললেও মিথ্যাপ্রবণ মন তা বুঝতে অথবা বুঝেও বেহুঁসে না বোঝার ভাণ করত। আর ভেন-

গ্লোরীর মানেই হচ্ছে, প্রভুদাস বা শ্লেভমেকিং সভ্যতার মিথ্যা এবং অতিরঞ্জিত মহিমা বা কীর্ত্তি।

তুমি জীবিতাবস্থায় এক ভেনগ্লোরীর পীঠস্থানের প্রভুশ্রেণীভুক্ত মহিলা ছিলে। এখানে অশরীরী মন হয়ে এসে, সত্যের অপূর্ব্ব মহিমা ক্রমে উপলব্ধি করবার পর, তবে ভেনগ্লোরীরূপ দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হতে ক্রমে হয়ত মুক্ত হয়েছ।

লীনা। সেকালে ঐ প্রভুদাস সভ্যতার মহিমা, এমন করে অগণিত দাসশ্রেণীর মনকেও আচ্ছন্ন বা ব্যাধি-গ্রস্ত করেছিল যে, তার বিরুদ্ধে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার বা প্রচার মাত্র করাতে কত শত শত সত্যব্রতকে হাজার হাজার বছর অবধি বিষ দিয়ে, মেরে কেটে, পুড়িয়ে আরও কত প্রকারে নির্য্যাতন করা হয়েছিল। শাস্ত্র, পুরান, কাব্য, ইতিহাস আদিতে ঐ নির্য্যাতনের রকমারি মহিমা কীর্ত্তন দেখা যেত। একথাও বলা যেতে পারে—এই গ্রহে সেকালে জনসাধারণকে চিরকাল দাসে পরিণত করে রাখতে, প্রপাগ্যাণ্ডা চালাবার জন্য মানুষের সমস্ত মস্তিষ্ক-শক্তির ব্যয়ে যাবতীয় মিথ্যা সাহিত্য, মিথ্যা ইতিহাস আর শাস্ত্র আদি রচিত হয়েছিল।

উঃ। ঠিক তাই। রেভলিউসনের পর, মানবজাতিকে এই মিথ্যারূপ ভীষণ ব্যাধিমুক্ত করবার তরে, রেভলিউসনের পূর্ব্বেকার মানুষের যত কিছু ইতিকর্ত্তব্যতা বা সমাজ-

ব্যবস্থা, বিশেষ করে সাহিত্য বা যে কোন পাঠ্য, এমন কি সমস্ত ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করতে হয়েছিল। ঐ আমূল পরিবর্ত্তনের নামই প্রকৃত রেভলিউসন।

তাই এখন তোমাকে রেভলিউসনের পরবর্ত্তী কালের প্রচলিত নতুন সহজ-সত্য-ভাষার কিছুটা ধরণ অনুকরণ করে রিলিজান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে অতি সংক্ষেপে কিছু বলতে চেষ্টা করছি মাত্র। কিন্তু তোমাদের সেকালের ভাষাতে এত মিথ্যা ভাব প্রকাশক শব্দ আর ভাব-প্রবণ বাক্যের প্রচলন ছিল যে তা দিয়ে এখানকার বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত ভাষার অনুকরণ করাও অসম্ভব। তবু সেকালের—যুক্তির বদলে উপমা, দৃষ্টান্ত, রূপক, হেত্যাভাষ, অথরিটী কোট করা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুপ্রকার লিপি-চাতুরীর (ধূর্ত্তামীর) মায়া কাটিয়ে, তোমার মনের প্রগতির ধাপে ধাপে, এখানকার আধুনিক ভাষার কিছুটা অনুকরণে, ক্রমে সহজ করে বলতে চেষ্টা করছি।

পরে যে সকল সদৃশগ্রহে ঐরূপ রিলিজানের লীলা প্রকট হচ্ছে, তার একটাতে যখন যাব, তখন এই সকল রহস্য বিশদভাবে তোমায় প্রত্যক্ষ করাব।

এখন দেখ—আদিম অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে, পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে বা প্রভাবে সকল মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সমান ভাবে স্ফূর্ত্ত হত না। জন্তু জানোয়ারেব বুদ্ধি সীমাবদ্ধ হলেও, সকল জীব-জন্তু সমান চালাক হয়

না। সেইরূপ মানুষের বেলায়, একটু বেশী চালাক আর বলবান হত যারা, তারাই সবচেয়ে আনন্দ দায়ক প্রথম দুটি ইন্‌ষ্টিংট্—ক্ষুন্নিবৃত্তি আব যৌন প্রবৃত্তিকে, অন্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা স্বল্পায়াসে অধিকমাত্রায় অসঙ্গত ভাবে পরিতৃপ্ত করতে স্বভাবতঃ প্রলুব্ধ হত। কারণ মানুষের বুদ্ধি, সেই সঙ্গে তার ইচ্ছাশক্তি অন্য জীবেব মত সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই মানব-জীবনের শৈশবে, তার সেই প্রবৃত্তিগুলি সীমাবদ্ধ না থাকাতে, শিশু-সুলভ মন বিশিষ্ট মানবের পক্ষে, বিশেষ করে চালাক চতুরদের পক্ষে উদ্দাম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই উক্ত দুটি ইনিষ্টিংটের অতিতৃপ্তির বাসনায় মানুষের প্রবৃত্তিগুলির যথোচিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হত না।

অন্য পক্ষে সীমাবদ্ধ বলেই অন্য জীবের প্রবৃত্তিগুলির আবশ্যক মত যথাযথ সামঞ্জস্য স্বভাবতঃ আপনা হতে রক্ষিত হয়।

আদিম অবস্থায় জ্ঞানের স্ফূরণ বিলম্বিত ছিল বলে, মানুষের সামঞ্জস্যহীন যথেচ্ছ স্ফূরণশীল ঐ দুটি প্রবল প্রবৃত্তি, নিজের বা অন্য কোন মানুষের প্রবৃত্তিকে (যেমন উচিত অনুচিত বিচার সম্পন্ন জ্ঞানার্জ্জন প্রবৃত্তি আর মৈত্রী দ্বারা আবদ্ধ সমাজবন্ধন-প্রবৃত্তিকে) নিজের স্বার্থের জন্য অবদমিত, বিভ্রান্ত অথবা যে কোন প্রকারে সীমাবদ্ধ করতে পেরেছিল।

আবার এও বলা যেতে পারে—ক্ষুন্নিবৃত্তি বা Self-preservation প্রবৃত্তি জন্মের পরেই আর যৌন বা sex প্রবৃত্তি কিছু অধিক বয়সে, অন্য সব প্রবৃত্তি অপেক্ষা অতি আনন্দদায়ক হ'ত বলে, চালাক মানুষগুলি অতিমাত্রায় লোভী বা কামাচারী হয়েছিল। সেইজন্য ঐ স্বার্থের অন্তরায় যারা, তাদের জ্ঞানকে পঙ্গু, বিকৃত, সীমাবদ্ধ আর পূর্ব্বোক্ত মৈত্রীকে হিংসা-দ্বেষে পবিণত করতে চালাক-চতুর প্রভুবা প্ররোচিত বা প্রলোভিত হয়েছিল।

এইরূপে মানব-সমাজেব বাল্যাবস্থায় অতি অল্প সংখ্যক অপেক্ষাকৃত চালাক-চতুব ব্যক্তিরা (যেমন সর্দ্দার, দলপতি, রাজা, ওঝা, মেডিসিনমেন, উইজাড্, গুনিন, প্রভু, গুরু, পুরোহিত ইত্যাদি ইত্যাদি) আদিমকাল হতে, অক্লেশে ঐ দুটি আদি প্রবৃত্তিকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিতে গিয়ে, দলের বাকী অত্যধিক সংখ্যক মানুষদের জীবন ধারণোপযোগী শ্রমলব্ধ যত কিছুর বিশেষ অংশের ওপর, আর যৌন ক্ষুধা অতি-চরিতার্থের জন্য একাধিক শ্রেষ্ঠা নারীর ওপব অতিরিক্ত ভোগাধিকার, প্রথমে অনেকটা গায়ের জোরে, পরে অধিকাংশটা চালাকি ভণ্ডামি (যেমন ওঝামি, মন্ত্র-শক্তি, যাদু, ম্যাজিক, অলৌকিক শক্তি, ভৌতিক শক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি) দ্বারা লাভ করবার স্থায়ী অলঙ্ঘনীয় প্রথা বা ধর্ম্মতন্ত্র, অর্থাৎ ধর্ম্মের নামে শাসন-শোষণ প্রভৃতি, এককথায় কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব ক্রমে প্রবর্ত্তিত করেছিল।

বস্তুতঃ গায়ের জোরে বা লৌকিক উপায়ে অথবা ছোট-খাট ভৌতিক আর দৈবশক্তির দ্বারা ঐ দুটি অতিরিক্ত ভোগের অতি লোভনীয় অধিকার স্থায়ী সাব্যস্ত করা যে অতীব কষ্টসাধ্য, অনিশ্চিত বা মারাত্মক, তার অভিজ্ঞতা বহুকাল ধরে উক্ত চালাক চতুরেরা লাভ করছিল।

শত সহস্র বছর ধরে ক্রম-বর্দ্ধিত এই অভিজ্ঞতা-লব্ধ বুদ্ধিবলে, আপাত পরম লোভনীয় উক্ত প্রবৃত্তি দুটির ভোগ-লালসা পূরণের জন্য, প্রায় প্রত্যেক দলের ক্রম-বর্দ্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনে, প্রভুশ্রেণী সর্ব্ব বিষয়ে বিনাশ্রমে স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টায়, হরেক রকম বিকট এবং বিরাট অলৌকিক শক্তির যে অন্ধ বিশ্বাস বা, ভক্তি মানবমনে instil করেছিল, তারই নাম রিলিজান বা ধর্ম্মতন্ত্র।

মোটামুটি প্রত্যেক দল, রেস (race), জাতি বা সমাজ, দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল বলা যেতে পারে। চালাক-চতুর লোকগুলি হয়েছিল প্রভুশ্রেণীভুক্ত। আর বাকী সব জনসাধারণ—যাদের শ্রমে প্রভুদের যত কিছু সম্পদ্ লাভ হত তারা হয়েছিল দাসশ্রেণী। প্রভুশ্রেণীর নারীরা ছিল স্বামী আর পুরুষের সেবাদাসী, আর দাসশ্রেণীর নরনারী ছিল, প্রভুদের সেবাদাস আর সেবাদাসী। অর্থাৎ প্রভুশ্রেণীর যৌন লালসা অতিমাত্রায় চরিতার্থের জন্য উভয়শ্রেণীর বহু শ্রেষ্ঠা নারীকে বিবাহিতা পত্নী, সেবাদাসী,

রক্ষিতা, প্রণয়িনী আদি রূপে ভোগদখল করবার অধিকার রিলিজানের মারফত কায়েম করা হয়েছিল।

আদিম কালে এই গ্রহে অনেক স্থলে আর বেভলিউ-সনের আগেও কোথাও কোথাও একজনের বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা পরিবারের প্রায় সকল পুরুষের কামেচ্ছা পূরণ হত। আবার এক নারীর অনেক স্বামীও ধর্ম্মানুমোদিত ছিল।

এই গ্রহের নানাদেশে যুগে যুগে অসংখ্য প্রকার রিলিজান, প্রভুশ্রেণীর উদ্দাম অসঙ্গত অন্যায় বাসনা চরিতার্থের জন্যই উদ্ভাবিত, প্রবর্ত্তিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। এইরূপে মানবসমাজে সর্ব্ববিধ দুর্নীতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

অনেক রিলিজান শেষের দিকে দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবে ভক্তিপ্রবণ মনের পক্ষে কতকটা যুক্তিসহ হয়েছিল। তখনও আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়নি।

প্রায় সকল রিলিজানের সোজা কথাটা ছিল—অলৌকিক শক্তিতে ভক্তি। এই শক্তির মূল যিনি, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, অর্থাৎ তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্ত্তা। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্যমান, সর্ব্বগুণাকর, সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি শান্তও বটেন, অনন্তও বটেন; তিনি নিরাকার আবার সাকার; সগুণ আবার নির্গুণ; তিনি জ্ঞেয় আর কারো বিচারে অজ্ঞেয়; কারো মতে

আছেন, কারো মতে তিনি নাই ইত্যাদি হরেক রকম ঈশ্বরের স্বরূপ বা অলৌকিক শক্তি অবোধ্য ভাবে ও ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়ে আসছিল। যেমন—

মর্ত্ত্যলোকে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রভুশ্রেণীকে তাঁর প্রতিনিধি বা এজেন্টরূপে সৃষ্টি করেছিলেন। দেশভেদে আর রিলিজান ভেদে গড্, ভগবান, ব্রহ্ম, সুপ্রিম বিং আদি তাঁর ছিল বহুবিধ নাম-রূপ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাকার, নিরাকার দেবদেবী আদি অসংখ্য রূপে তিনি ছিলেন বিরাজিত। তিনি সর্ব্বশক্তিমান হলেও, তাঁর সৃষ্ট কোন মানুষকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দিতে অথবা ঐভাবে মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে তিনি ছিলেন একেবারে অক্ষম।

দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন, কখনও বা দুষ্কৃতের নাশ, আর সাধুর (প্রভুরা প্রায় সবাই ছিলেন সাধু) রক্ষার জন্য ভগবান, যুগে যুগে দেশে দেশে মনুষ্যরূপে হতেন অবতীর্ণ। এই বহুরূপী ভগবানের অসংখ্য নামের মধ্যে দয়াময় নামটি নাকি সার্থক, তাই মহত্তম।

পর দুঃখ মোচনের নাম দয়া। তাই দীন দুঃখী দাসরা ডাকত—"হে দয়াময়, দুঃখ-দৈন্য আধি ব্যাধি দূর কর!" আর দাসদের দুঃখদাতা প্রভুরা ডাকত—"ওহে দয়াময়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর—মনোরমা ভার্য্যা দেও (নতুন করে), সম্পদ দেও (আরও), যশ দেও, প্রভুত্ব দেও, শত্রু নাশ

কর ইত্যাদি ইত্যাদি।" এ সকলও যাদের আর আবশ্যক হত না, তারা ডাকত—"দয়াময় হে, আমায় (আমাদিগকে না) দেও মুক্তি (যার মানে সাষ্টি, সালোক্য, সাযুয্য, সারূপ্য, নির্ব্বাণ আদি অপবর্গ), অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি"। এই ডাকা এবং চাওয়াটা হত ব্যক্তিগত ভাবে।

স্বভাবত কারো দুঃখ প্রায় নিরবচ্ছিন্ন হয় না। ব্যক্তি-বিশেষের দুঃখ অন্য কোন বাস্তব কারণে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু সমষ্টিগত দুঃখ, দয়াময়ের ইচ্ছায়, বিশেষ করে দুঃখী দাসদের প্রতিকারবিহীন দুঃখ বেড়ে আসছিল বই কম্‌ছিল না।

এখন দেখ, তোমার দয়াময় ভগবান কোন প্রকারে দাসদের দুঃখ বা কোন মানুষের কিছুমাত্র দারিদ্র্য বা অভাব-জনিত দুঃখ মোচন করতে পারেননি। আর প্রভুদের মনোবাঞ্ছাও তিনি দয়া করে কখনও পূরণ করতেন না। দাসেরাই নিজেদের অশেষ দুঃখের পর দুঃখ বাড়িয়েই প্রভুদের মনোবাঞ্ছা চিরকাল পূর্ণ করে আসছিল যে জন্য তা হচ্ছে ভক্তি, অন্ধ-বিশ্বাস অথবা কম্‌প্লেকস্‌। সুতরাং এটা ভগবানের দয়াময় নামের কলঙ্ক। কাজেই ভগবান, ভগবানের দয়া আর তাঁর দয়াময়ত্ব সবই মিথ্যা। এই মিথ্যা দ্বারাই প্রভুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হত।

লীনা। আচ্ছা! এই সহজ সন্দেহ, অথবা জ্ঞানানু-সন্ধিৎসা, এই গ্রহের আদিম কাল হতে রেভলিউসনের পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত মানবজাতির শত্রুকরা পঁচানব্বই ভাগ দাসদের মাথায় আসেনি কেন ?

উঃ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূর্খ, দরিদ্র, সর্ব্ব বিষয়ে অধম, অক্ষম ক'রে রাখবার জন্যই ধর্ম্মতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। এই ধর্ম্মের নামে মিথ্যা প্রবঞ্চনা আদির নানা প্রকার হিকমত আবিষ্কার করতে আর জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করতে, প্রভু দাস উভয় শ্রেণীর মস্তিষ্ক শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ও ব্যয়িত হয়েছিল। এইরূপে প্রভুশ্রেণী, নিজের উদ্ভাবিত ফাঁদে নিজেরাই জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতিই হয়েছিল মানব-জীবনের সর্ব্ববিধ স্বার্থ সাধনের একমাত্র উপায়। রেভলিউসনের একশ' বছর আগেকার সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট মানুষ, রেভলিউসনের একশ' বছর পরের সীমাহীন জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সম্পূর্ণ বিপরীতও তার ফলে আইন-কানুন রীতি-নীতি সবই বিপরীত।

মানুষের অব্যবহিত পূর্ব্বের স্পিসিজের সীমাবদ্ধ যে জ্ঞান, প্রাকৃতিক ইভলিউসনের নিয়ম অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ বছরে মানুষে তা সীমাহীন জ্ঞানে পরিণত হয়েছিল, সেই জ্ঞানের অগ্রগতির অনন্ত পথে, কিছু দূর এগোতে না এগোতে রিলিজান আর তার একমাত্র অবলম্বন যে অন্ধ বিশ্বাস বা ভক্তিবাদ, তার দ্বারা মানব জাতির শৈশবে সেই স্ফূরণোন্মুখ জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল, অর্থাৎ সীমাহীন জ্ঞান বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে আবার

সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট মানুষরূপী অভিনব জীবে পরিণত করা হয়েছিল।

রেভলিউসনের কিছু আগে, সাধারণত বলা হত, সার্ব্ব-জনীন বা ব্যক্তিগত দুঃখ মোচনই ভগবান, রিলিজান, দর্শন আর প্রার্থনা-উপাসনাদির একমাত্র উদ্দেশ্য। অথবা বলতে পারি—ঐ দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই সর্ব্ব-শক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ভগবান, রিলিজান, তার ভক্তিবাদ, তার দর্শনাদির প্রয়োজন বলে দাবী করা হত। এখন তুমি বুঝতে পেরেছ—সেই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনটা ছিল, মানব সমাজে প্রভুদাস তন্ত্র সর্ব্বতোভাবে অব্যাহত রাখা।

লীনা। তাহলে বলব—তথাকথিত সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ভগবান, বা তথাকথিত সূক্ষ্মদর্শী আপ্ত মহাপুরুষ (intuitionists) কিম্বা তথাকথিত সত্যদ্রষ্টা দর্শন যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে নি, সেই সীমাহীন মানবীয় জ্ঞানের যাত্রা-পথকে অবরোধ-মুক্ত করতে, সেই মানবের সর্ব্ববিধ অভাবজনিত দুঃখ-দারিদ্র্য চিরতরে মোচন করতে আর মানব জাতিকে, মানবতার শ্রেষ্ঠ দান যে ভ্রাতৃপ্রেম, সেই মৈত্রীবন্ধনে অবিচ্ছেদ্য রূপে আবদ্ধ করতে, গত মহান্ রেভলিউসনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কল্যাণে তা পেরেছে।

লীনা। কিন্তু একটা প্রবচন ছিল—"দুঃখ বিনা সুখ কভু হয় কি মহীতে?" এ না হওয়াই যদি সত্য হয়, তবে ত সুখানুভূতির জন্য দুঃখ থাকা চাই!

উঃ। দুঃখ থাকা চাই, মানে দুঃখী জিয়িয়ে রাখা চাই সেই হেতু, যে হেতু দুঃখীদের হৃদয়-বিদারক দুঃখ দেখে সুখীরা তার তুলনায় সুখ উপলব্ধি করবে!

লীনা। দুঃখ বা দুঃখীর তুলনা বিনা যদি সুখানুভূতি না হয় তবে দুঃখ বা দুঃখী জিয়ান ব্যতীত উভয় শ্রেণীর সুখেচ্ছুদের উপায় কি?

উঃ। এও একটা সাংঘাতিক ফ্যালাসী যার ওপর ভর করেই সেকালে প্রভুদাসকৃষ্টি দাঁড়িয়ে ছিল। তোমার নিজের কথাই ধর—তোমার জীবিতাবস্থায় তোমার নিজ মনে, তোমার সুখ-দুঃখের অনুভূতি কি করে হত, আর এখনকার মনোভাবে কি হতে পারত, তার একটা উদাহরণ এখানে দিলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে।

লীনা। বেশ ত!

উঃ। মনে কর, তুমি যখন জীবিতা ছিলে, তখন একদিন এক সুসজ্জিত ব্রেকফাষ্ট টেব্‌লে, এক বন্ধুর সহিত উপাদেয় খাদ্য নিত্য যেমন করে উপভোগ করতে, তেমন করে খেতে বসেছিলে। সেদিন বছরের প্রথম আমদানী ল্যাংড়া আমের আস্বাদনে ও সুগন্ধে বিশেষ করে একটু তৃপ্তি বা সুখের সজ্ঞান অনুভূতি যে তোমার জেগে ছিল তা বলতে পারি ত?

লীনা। হাঁ, ল্যাংড়া আম খেয়ে কার না সুখ হত!

উঃ। তার আগে তুমি কুইনিন্ খেয়ে দুঃখের পর সুখানুভূতি নিশ্চয় জাগাওনি! তবু তোমার "দুঃখ বিনা সুখ" তখন হয়ে ছিল ত?

লানা। হাঁ, তবে কুইনিন খাবার পরে আমটা খেলে, আমের মিষ্টি স্বাদটার অনুভূতির হুঁস বোধ হয় একটু বেশী হত।

উঃ। আচ্ছা, আর এক দিক থেকে দেখ, খেতে খেতে জানালা দিয়ে দেখলে—একটা কঙ্কাল-সার মেয়ে, ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে, কোন রকমে গা ঢেকে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, রাস্তার পাশে, যেখানে ঝাড়ু দেবার পর, দু'চারটা এঁটো ভাত ভেসে যাচ্ছিল তাই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

তোমার জ্ঞান হয়ে অবধি কত ভিখারী, দীন, দুঃখী, মুটে, মজুর, চাকর, চাকরাণী আদির খাদ্যের অল্পতা বা অভাবজনিত দুঃখ নিত্য দেখে আস্‌ছিলে। তা'দের কাকুতি মিনতিতে, তোমার দু' একটা পয়সা বা ঐরকম কিছু দেবার প্রবৃত্তি হয়ত কোন দিন জেগেছিল—দিয়েও ছিলে; অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে দিয়েও থাকত। তাতে তথাকথিত দয়াধর্ম্মের (?) চরিতার্থতা হেতু ক্ষণিক মামুলি সুখানুভূতি হয়ত একটু হত। কিন্তু তাতে চিরদুঃখীর দুঃখ বা দারিদ্র্য নিবৃত্তির কিছুই হত না। অন্নাভাব বা ক্ষুন্নিবৃত্তি-আদির অভাবই যে মানব-জীবনের চরম দুঃখ, তা' কি

তোমার মত "চির-সুখী জন ভ্রমে কি কখনও" বুঝতে পেরেছিল ?

লীনা। আমি বুঝতাম না সত্য; কিন্তু যারা দুঃখবাদ নিয়ে এত ঝুলাঝুলি করেছিল তারাও বুঝত না। সাম্য-বাদের পরিকল্পনা তাদের উর্ব্বর মস্তিকে গজায়নি কেন? এতে তাদেরও সকল দুঃখের অবসান হত, সকল অভাব মোচন হত। সকল বিষয়ে সকলের বাসনা যেমন পূর্ণ হ'তে পারত, তেমন মিথ্যা দুর্নীতির নারকীয় বিড়ম্বনা কাউকে ভোগ করতে হত না; বিষয়বস্তুর প্রতিযোগিতার আর প্রভুত্বের বদলে মস্তিষ্ক-শক্তির বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি-যোগিতাতে ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতুলনীয় আনন্দও বাড়তে থাকত; তবে কেন তারা সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার নামে এত আতঙ্কিত হত আর এত বিরোধিতা করত ?

উঃ। প্রভুরা ছিল কর্ত্তা; কর্ত্তার ইচ্ছায় অন্ধভাবে কর্ম্ম করাই ছিল দাসদের ব্যাধি। তাই উভয় শ্রেণী প্রাণপণ করে সাম্যের বিরোধিতা করত। তোমার এই কেনর উত্তরেই আগে অনেক কিছু বলেছি। আবার সহজ কথায় কিছু বলতে হবে।

এই গ্রহে রেভলিউসনের আগে ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীগত স্বার্থ-সাধন জন্য, অন্যকে বা অন্য সম্প্রদায়, অন্য জাতি, দেশ, অন্য শ্রেণীর মানুষ মানুষকে যে উপায়ে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করত, সেই উপায়গুলি ছিল, রিলিজান-

ধর্ম্মতন্ত্র, মন্ত্রতন্ত্র, দর্শন, বিশ্বাস, ভক্তি, রীতিনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা প্যাট্রিয়টিস্‌ম, শাসনতন্ত্র, আইনকানুন, দয়া-দাক্ষিণ্য, নর-নারায়ণ-সেবা, তথাকথিত অহিংসা, সত্যাগ্রহ, সংস্কৃতি, বিশেষ করে প্রভুত্ব—এক কথায় সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতা ছাড়া আর সব। তা'হলেই দেখ, সমস্ত মানবসমাজ স্বার্থপরতা দ্বারাই চালিত হত; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রথম দুটি ইনিষ্টিংটের অতিভোগেব লিপ্সার জন্য, লিপ্সার দ্বারা, লিপ্সাতে মানুষ চালিত হচ্ছিল। এই স্বার্থ-সাধন পলিসির ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিকার-হীনতার গালভরা নামই ছিল তথাকথিত সংস্কৃতি (culture), সভ্যতা, কৃষ্টি, সনাতন কীর্ত্তি, মানবতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমস্ত মানুষের মন এত অতি-স্বার্থপর কেন, কি প্রকারে হয়েছিল, তা তোমার কমনসেন্স দ্বারা যাতে বুঝতে পার, সেইভাবে আগে অনেক ক'বে বলেছি। এখন মনঃ-সমীক্ষণবিদ্‌দের কথার আভাষমাত্র অতি সংক্ষেপে কোন রকমে তোমায় বলছি। আমি বৈজ্ঞানিক নই। বৈজ্ঞানিক ভাষা জানা না থাকলে এখন এখানকার অভিনব বিজ্ঞান বোঝা বা বোঝান সমান দুষ্কর।

রেভলিউসনের পর বিজ্ঞানের সকল দিক্ এমন উন্নত হয়েছে যে পূর্ব্বের বিজ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। তাই এখন এখানকার বিজ্ঞানকে অভিনব বিজ্ঞান বলা

হয়। সমস্ত গ্রহে এখন একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক ভাষা বা সত্য ভাষা প্রচলিত হয়েছে। সেকালের স্বার্থসর্ব্বস্ব মন দিয়ে একালের অভিনব বিজ্ঞানের সমস্যা বোঝা বা বোঝাতে চেষ্টামাত্র করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কতটা হবে তা তুমি বুঝতে পার। তবু বলছি।

মনের সঙ্গে চৈতন্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। চেতনার সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্রমবিকাশ হয়। মনের অজ্ঞান অবস্থা থেকে সংজ্ঞান অবস্থা পর্য্যন্ত সেকালের মনকে বা চেতনাকে তিনটি অবস্থায় ভাগ করা হয়েছিল। যেমন—

প্রথম, সুপ্ত চৈতন্য বা নির্জ্ঞান মন (unconscious state)। মনের এই অবস্থাটি সম্বন্ধে মানুষের পরবর্ত্তী সংজ্ঞান মনে একেবারে হুঁস থাকত না। বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত তা বোঝা প্রায় সম্ভব হত না। কিন্তু মনের এই আদি নির্জ্ঞান অবস্থা বেহুঁসে সংজ্ঞান মনের ওপর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করত।

দ্বিতীয়, মগ্ন চৈতন্য বা অবচেতন মন (subconscious state)। মনের এই অবস্থা সংজ্ঞান মনে অর্দ্ধ বেহুঁস, অর্থাৎ খানিকটা বেহুঁস থাকলেও, যাদের অন্তর্দ্দৃষ্টি বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি যতটা জেগেছিল, তারা ততটা অবচেতন মনের রহস্য সম্বন্ধে সচেতন হতে পারত। সেকালে খুব কম লোকই তা হতে পেরেছিল। রেভলিউসনের আগে রেভলিউসনারীদের প্রধানতম কর্ত্তব্য হয়েছিল, নির্জ্ঞান

আর অবচেতন মনের প্রভাব হতে মানুষের সংজ্ঞান মনকে মুক্ত করা। সেকালে অবচেতন মনদ্বারা মানুষের সংজ্ঞান মন অবদমিত করাই ছিল শিক্ষাপ্রণালীর বা সমস্ত উনিভার্সিটির অন্তরনিহিত প্রধান উদ্দেশ্য।

তৃতীয়, সংজ্ঞান মন (cdnscious state)। এর ওপর নির্জ্ঞান আর অবচেতন মনের প্রভাব ছিল দুর্দ্দমনীয়। এই দুর্দ্দমনীয় শক্তির নাম কম্‌প্লেক্‌স্ বা ভাবগ্রন্থি—চলতি কথায় হাল্‌কা অর্থে বলা হত কুসংস্কার। পূর্ব্বেই বলেছি—কম্‌প্লেক্‌স্ এমন কতকগুলি ধারণার সমষ্টি, যার সঙ্গে মানবমনের মূলগত অনুরাগ বা বিরাগ, অর্থাৎ স্বার্থ লিপ্সা অন্তর্নিহিত ছিল। এইরূপে কমপ্লেকস্‌গুলি সংজ্ঞানকে করত অবদমন (reprcssion। সেই ধারণাগুলির মূল ছিল পূর্ব্বোক্ত প্রথম দুটি ইনিষ্টিংটএর অতিভোগ-লিপ্সা জনিত স্বার্থ। এ হেন স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে স্বার্থ-সাধন জন্য কমপ্লেক্‌স্‌গুলি যত কিছু মিথ্যা, প্রতারণা, এক্‌স্‌প্লইটেস্‌ন্ আদি অসংখ্য প্রকার দুর্নীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্ররোচনা আদি দ্বারা দমিয়ে রাখত সংজ্ঞান মনকে।

শৈশবে মানুষের মন যখন শিশুসুলভ নির্জ্ঞান আর তারপর অবচেতন অবস্থায় থাকত, স্বাভাবিক নিয়মে, তখন মাতৃ-পিতৃ স্থানীয় * তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীদের কম্‌প্লেক্‌সের প্ররোচনায় শিশুদের কম্‌প্লেক্‌সেরও উৎপত্তি

* মা বাবারা এই অপ্রিয় সত্য ক্ষমা করবেন। ডাঃ রায়।

হত। শিশুদের পরবর্ত্তী জীবনে এই প্রকারে তথাকথিত নিম্ন-উচ্চ শিক্ষা আর লোকমত আদি দ্বারা সকল মানুষের সংজ্ঞান মন কমপ্লেক্স্ রূপ দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে 'Morbid অবস্থায় ছিল। রেভলিউসনের পর এই মরবিড্ মনকে কম্প্লেক্সের অবদমন মুক্ত করতে এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কি রকম বৈজ্ঞানিক উপায় প্রয়োগ করছে, তা আগে তুমি দেখেছ। কিন্তু তখন তোমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এতটা উন্নত হয়নি ব'লে ঐ সব বৈজ্ঞানিক রহস্য এমন হালকা ভাবে নিয়েছিলে।

লীনা। তাইত তখন তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেকালের চেয়ে একালের শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট কি? এখন দেখছি, পার্থক্যটা আকাশ আর পাতাল।

উঃ। এখন তোমার সংজ্ঞান মন অনেকখানি কম্প্লেক্সের অবদমন-মুক্ত হয়েছে। এখানকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটা অন্ততঃ আর একবার দেখলে মনের অনধীনতার ঠিক স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে মুগ্ধ হয়ে যেতে।

পরন্তু পূর্ব্বোক্ত সমাজবন্ধন আর সত্যানুসন্ধিৎসা (বা জ্ঞান) এই দুটি প্রবৃত্তি, নির্জ্ঞান এবং অবচেতন মনে জাত কমপ্লেক্সের অস্বাভাবিক অবদমন মুক্ত হয়ে, স্তর-শূন্য অখণ্ড সুস্থ সংজ্ঞান মনে পরিণত হওয়াই মানব মনের স্বভাব। কিন্তু কম্প্লেক্সের প্রভাবে বা চাপে যে মানুষের সংজ্ঞান মন অবদমিত হয়েছিল, অর্থাৎ স্বার্থ-

সর্ব্বস্ব হয়েছিল তা সেকালের মানুষ কিছুতেই স্বীকার করত না বা করতে চাইত না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে-ছিল, স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ব্যতীত মানুষের ঋদ্ধি কিছুতে সম্ভব নয়। তারা স্বার্থ সাধনকেই জীবন ধারণের একমাত্র উপায় মনে করত। তাই এই কম্‌প্লেক্‌স্‌কে থাইসিসের মত উৎকট ব্যাধি বলা হত। রেভলিউসনের পর বৈজ্ঞানিক রীতিতে এই রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই তৃতীয় প্রবৃত্তিটি প্রথম আর দ্বিতীয় প্রবৃত্তির মত ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত ভাবে স্বার্থপর নয়। সার্ব্বজনীন স্বার্থ সাধনই এর স্বভাব। অর্থাৎ সমাজের পারস্পরিক সদ্ভাব, সার্ব্বজনীন কল্যাণ এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছাই সমাজবন্ধন-প্রবৃত্তির স্বভাব ধর্ম্ম।

তাই অতিস্বার্থপর প্রথম প্রবৃত্তি দুটির (বিশেষ করে যৌন বৃত্তির) সঙ্গে পরার্থপবতা আর সমাজবন্ধন-প্রবৃত্তির —বিরোধ অনিবার্য্য হয়েছিল। স্বভাবের জরুরী তাগিদেই মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক প্রকৃত মানুষ হতে হলেই মানুষের চাই পরার্থপরতা, অর্থাৎ সাম্য, মৈত্রী, অনধীনতা। এ না হলে এই গ্রহে সমাজবন্ধন বা সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব হত না।

অন্যকে বঞ্চিত না করলে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ সাধন হত না। সমাজ বন্ধনের সূত্র যে পারস্পরিক সদ্ভাব,

শুভেচ্ছা, ভ্রাতৃভাব, মৈত্রী আদি তা এক ক্ষুদ্র শ্রেণীর স্বার্থের জন্য যখন একেবারে অচল হয়েছিল, তখন পরস্পর পরস্পরকে কোনরকমে বেঁধে রাখবার জন্য মানব-মনের স্বভাবজ-সদ্ভাব মৈত্রীর বদলে নিজ্র্জান আর অবচেতন মনে instilled করা ভক্তি *বা অন্ধ বিশ্বাস কিম্বা অন্ধ কুসংস্কার আর প্রভুদাস তন্ত্রের মিথ্যা প্রতারণা আদি ধারণার সমষ্টিই পরিণত হয়েছিল উল্লিখিত কম্‌প্লেক্‌সে,—যা সহজ কথায় বলা যেতে পারে—সেকালে মানবমনের সুস্থ সংজ্ঞান অবস্থাকে, মিথ্যা কুসংস্কাররূপ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত কৃত্রিম ঘৃণিত স্বার্থ-সর্ব্বস্ব অপ-মনে পরিণত করা হয়েছিল।

এই রোগের একমাত্র অমোঘ প্রতিকার যা প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা হচ্ছে, আন্তর্জ্জাতিক পূর্ণ রেভলিউসন্, যার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দ্বারা সেকালের মরবিড্ মনকে পরার্থপরতায় মগ্ন করাতে, এই গ্রহের এখনকার মানুষ কম্‌প্লেক্‌স্‌হীন, ভক্তিবাদের গণ্ডীমুক্ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন, স্ফুরণোন্মুখ অনন্তজ্ঞান বিশিষ্ট, মানবোচিত অনধীন মন ফিরে পেয়েছে।

---

* যাতে যে গুণ বা শক্তি নাই অথবা যে গুণ বা শক্তি থাকা অস্বাভাবিক, তা জেনে শুনে, তাতে সেই গুণের বা শক্তির আরোপ করে, সেই আরোপিত গুণের প্রভাবে প্রায় অন্য সর্ব্ববিধ গুণ বা শক্তি তাতে বর্ত্তায় কিম্বা বর্ত্তেছে, এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হলে, তথাকথিত সেই গুণবান বা শক্তিমানকে পূজা, অর্চ্চনা, বশ্যতা, আরোপিত-গুণমুগ্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, হীনতা, দাস্য, নতি, ভয়, সম্ভ্রম আদির সমাবেশে যে একটা ভাব-তরঙ্গ মনকে উদ্বেলিত করে, সেই ভাবের নামই ভক্তি আর তার ভাবকে ভক্তিবাদ বলা হত।

এখন বোধ হয় বুঝলে সেকালের মিথ্যা দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থ-সর্ব্বস্ব পণ্ডিতদের কম্‌প্লেক্‌স্‌ দ্বারা কবলিত অমুর্ব্বর মস্তিষ্কে কেন পরার্থপরতা, কেন নিখুঁত সমাজতন্ত্রবাদ বা কেন সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার ঠিক মত ধারণা গজাতে পারেনি।

লীনা। আচ্ছা! এত সব মিথ্যাকে নিঃসন্দেহে সত্য বলে মেনে নেয়াতে,—হতভাগ্য দাসেদের কি এমন স্বার্থ ছিল?

উঃ। আচ্ছা, আবার একটু স্পষ্ট করে বলছি। "মৃত্যুতেই দুঃখের বা দুঃখময় জীবনের শেষ। জন্মিলেই দুঃখ। জন্মের হেতু—প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির নাশেই দুঃখের নাশ। দুঃখের নাশই জীবের একমাত্র ঈপ্সিত। সুখও (বিশেষ করে প্রভুদের), দুঃখের অনুষক্ত (অর্থাৎ দুঃখের সংলগ্ন)। অতএব সুখও গৌণরূপে দুঃখ।"

অসীম আপ্তবাক্য, শাস্ত্র, দর্শন, প্রত্যাদেশ আদির অন্তর্গত দুঃখবাদের ঐ কয়টি মূল প্রবচনের মধ্যে কি রকম ফ্যালাসী দেখ ঃ—

"মৃত্যুতে দুঃখময় জীবনের" যেমন শেষ হয়, সুখের বা সুখময় জীবনেরও তেমনি শেষ হয়। এখানে দেখ, দাসশ্রেণীর জীবনই দুঃখময়। আর প্রভুশ্রেণীর জীবন যে সুখময় তা অস্বীকার করতে পার না। তারপর "জন্মিলেই দুঃখ" দুঃখীদেরও যেমন হয়, সুখীদের (সুখী প্রভুদের)

সুখও তেমনি হয়। "জন্মের হেতু—প্রবৃত্তি" হতে পারে কিরূপে? চেতনার সঙ্গেই প্রবৃত্তির জন্ম। প্রবৃত্তিহীন চেতনা অথবা চেতনাহীন প্রবৃত্তির ধারণা করতে পার কি? প্রবৃত্তি আর চেতনা এ দুয়ের কেউ কারও হেতু হতে পারে না। প্রবৃত্তির লোপ হলে জীবনেরও লোপ হয়। গতি, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুন্নিবৃত্তি, আত্মরক্ষার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, যৌন মিলন, সমাজবন্ধন, অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি, চিন্তা, মনন ইত্যাদি সকল প্রবৃত্তি বা বাসনার পূরণেই সুখ, আর তার অভাবে বা তার নিবৃত্তিতে দুঃখ। এই অভাব-বোধের অত্যন্ত অনুভূতি দারিদ্র্য। দারিদ্র্যই দুঃখ।

"প্রবৃত্তির নাশেই দুঃখের নাশ" এই ডগমার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেকালের পণ্ডিতরা এত বচনের প্যাঁচ কষতেন যে, তোমার মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নকেও—

লীনা। না, তা পারতেন না। আচ্ছা, যা বলছিলে বল।

উঃ। "প্রবৃত্তির নাশে দুঃখের নাশ" কিন্তু হয় না, বরং দুঃখের চরম হয়; তাতেই জীবন বা চেতনার নাশ নিশ্চিত। প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নাশে জীব বেঁচে থাকতে পারে না। "হাতীটা চাইলে ঘোড়াটা মিলে"—এই লৌকিক ন্যায়ের মোতাবেক, প্রভুরা নিজেদের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে পূর্ণভোগ দেবার জন্য, ডগমার বিধান দিয়েছিলেন, বেচারী দাসেদের প্রবৃত্তিকে 'সম্যক'নাশ করতে।

অর্থাৎ কিনা গৃহপালিত পশুর পালক প্রভুদের স্বার্থ সাধনের মত, দাসেদের কোন রকমে প্রাণে বেঁচে থাকবার প্রবৃত্তিটুকু মাত্র নাশ না করে, বাকী মানবোচিত যতকিছু প্রবৃত্তি, অর্থাৎ বিষয় ভোগ বাসনা, জ্ঞানানন্দের আকাঙ্ক্ষাদি যত কিছু সুখভোগের প্রবৃত্তিকে ত্যাগ, 'নাশ' বা 'নিবৃত্তি'র দ্বারা প্রভুদের ঐ সকল বহুমুখী সুখজনক প্রবৃত্তির পূরণেই দাসেদের—"দুঃখের নাশ" হয়,—এই ছিল সেকালের রিলিজানের মৌলিক ডগ্‌মা অথবা মানুষের অপমন বা কম্‌প্লেক্সেব বদ্ধমূল 'পায়াস' ধারণা।

তারপর, এইরূপে "দুঃখের নাশই জীবের (জীবনের ?) একমাত্র ঈপ্সিত", এই ডগমাটা দাসেদেব পক্ষেই যে প্রযোয্য তা সহজবোধ্য। কারণ প্রভুদের ত দুঃখ ছিল না। "দুঃখনাশ" প্রভুদের ঈপ্সিত হত কেমন করে! তাই আর একটা ডগমার যে আবশ্যক হয়েছিল, তা ছিল— "সুখও (প্রভুদের) দুঃখেব অনুষক্ত (অর্থাৎ দুঃখের সংলগ্ন), অতএব সুখও গৌণরূপে দুঃখ।"

লীনা। আর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

উঃ। তোমার প্রশ্ন ছিল, সেকালের অত সব মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নেয়াতে হতভাগ্য দাসেদেব কি এমন স্বার্থ ছিল। এখন কি তুমি—

লীনা। সেকালে ইহলোকে ঐ সকল 'পায়াস ক্রডে' অচলা ভক্তি আর অন্ধ বিশ্বাসের অব্যর্থ ফলে, মৃত্যুর পর

সোজা পরলোকে গিয়েই পূর্ব্বোক্ত নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত সুখ যে পাবে—এই অনড় বিশ্বাসই, প্রতিকারহীন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও ইহকালে হতভাগ্য দাসেদের সুখ সান্ত্বনা ছিল। এই সুখ সান্ত্বনার তাগিদে, সোনা পুড়ে পুড়ে যেমন খাঁটি হয়, সেইরূপ তাদের রক্ত মাংসের নশ্বর দেহটা, ভগবৎ বিধান মত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণাধীনে দুঃখানলে পুড়ে পুড়ে ভস্মীভূত হলে পর, তাদের সুখ দুঃখের 'ভোগদেহ' বা প্রকৃত ভোক্তা অমর আত্মা, সেই দুঃখানলে পোড়ারূপ সৎকর্ম্মের ফলে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হয়ে পরকালে নিরবচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দে অনন্তকালের জন্য মগ্ন, চাই কি সেই দয়াময় ভগবানে লীন হবার মরীচিকা দেখে আসছিল' হাজার হাজার বছর ধরে।

উঃ। এও বলতে পার,—মর্ত্ত্যলোকে মাত্র কয়েক বছরে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত দুঃখ অহিংস ভাবে ভোগের পর, পরলোকে অমর আত্মার অনন্ত সুখের বিরাট আশাই ছিল দাসশ্রেণীর গালভরা স্বার্থ। এটা অবিশ্যি তাদের পারমার্থিক পরমানন্দের অতি (মিথ্যা) লিপ্সাজনিত স্বার্থ।

লীনা। এখন বুঝলাম—রেভলিউসনের আগেকার মানব-মনের মিথ্যা ভূতাচ্ছন্ন ভাবটা—যা তুমি মানব-মনের ব্যাধি, কম্‌প্লেক্‌স্‌, অপ-মন, বিকারগ্রস্ত মন বা মেণ্টাল ব্ল্যাক্‌ আউট্‌ বলছ, তার আদি কারণ, ব্যক্তি, জাতি, সম্প্রদায় আদি শ্রেণীগত হীন স্বার্থপরতা।

আদিম সাম্যের যুগে যখন মানুষের সবে মানবোচিত জ্ঞানের উন্মেষ হচ্ছিল, তখন ভূত আদির অনিষ্টকর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস জন্য বিপদ আপদের ভয়ের ধারণা মানুষের তখনকার শৈশবমনে গজিয়েছিল। এই ভয়ের ধারণা মানুষের সহজাত নয়। অন্যের দ্বারা বা অন্য কিছু থেকে, জন্মের পর মনে ক্রমে ইন্‌ষ্টিল্‌ড হয়েছিল।

ঐ ভয় আদির আতঙ্ক বাড়াবার ও নিবারণের ভাণ করে, দলের চালাক চতুরেরা অনায়াসে নিজেদের সর্ব্ববিধ স্বার্থ অতিমাত্রায় সাধন জন্য, দলের অন্য সব লোকের ওপর প্রভুত্ব করত। অনিষ্টকারী ভূত প্রেত আদির অলৌকিক দুষ্ট শক্তির ধারণা, মানুষের মৃত্যু ঘটনা, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ, আর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হ'তে ঐ আদিম মানুষের মনে গজাত।

সেই আদিম অবস্থায় মানুষ অনেক যন্ত্রণা ভোগের পর, যখন ভয়ঙ্কর বিকারগ্রস্ত হয়ে মরত, তখন মৃত দেহটার, বিশেষ করে তার মুখখানার দৃশ্য হত অতি ভয়ানক। উপস্থিত লোকগুলির তখনকার অপাপবিদ্ধ শিশুসুলভ সহজ মনে হঠাৎ জাগত—'এ কি, ও কেন' এই ধরণের একটা বেমালুম শঙ্কা বা সন্দেহসূচক প্রশ্ন। তখুনি অন্যের সমর্থনে বা ইঙ্গিতে সেটা মন্দ আর ভয়ঙ্কর ব'লে যাই মনে হত, অমনি ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ত প্রায়

সবাই। পরক্ষণে তাদের সকলের সহজাত অনুসন্ধিৎসা প্রশ্ন করত, 'কেন এমন হয়, প্রাণটা কোথায় যায়?' ইত্যাদি। তার উত্তরে তাদের আদিম কালের অর্ব্বাচীন মনে যে সিদ্ধান্ত বা কারণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হত, তা ছিল—যে প্রাণটা শবীর থেকে বেরিয়ে যেত সেটা ঘোষ্ট, ভূত ইত্যাদি। নানাবিধ ভাষায় তার বহুপ্রকার নাম ছিল। এই অশরীরী অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস কবত না, তখন এমন মানুষ প্রায় এই গ্রহে ছিল না। এই বিশ্বাস থেকে ক্রমে অনেক জীবে, গাছ পাথরে, পর্ব্বত, নদী আদিতে নানাবিধ অলৌকিক শক্তির আরোপ কবা হত।

ভূত যে মানুষের অশেষবিধ অনিষ্ট করত, তা মানুষের মৃত্যুকালীন বিকারগ্রস্ত অবস্থা, বিভীষিকাপূর্ণ প্রলাপ, মৃত্যুর পব বিকট বীভৎস্য মুখভঙ্গী দেখে উপস্থিত সকলে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস না করে পাবত না। এই বিশ্বাসটা এবং ভয়ের আরও বহুবিধ অন্ধ বিশ্বাস ক্রমে বেড়ে বেড়ে হাজার হাজার বছরে বদ্ধমূল সংস্কার রূপে মনের নির্জ্ঞান আর অবচেতন স্তরে কম্‌প্লেক্‌সে পরিণত হয়ে, সংজ্ঞান মনকে একেবাবে অবদমিত করেছিল। এতে প্রায় সকলের সংজ্ঞান মনের সংজ্ঞানতা ঘুচে গেছল। তখন ঐ অদৃশ্য ভূত আদির মিথ্যা ভয়, উপদ্রব উৎপীড়ন, আর নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ভয় নিবারণ এবং নানা

রকম কল্পিত মুস্কিল আসান জন্য উক্ত ভূত আদির অলৌকিক শক্তিকে কনট্রোল করবার মন্ত্র, তন্ত্র, তুক্ তাক আদি হরেক রকম কাণ্ড কারখানার দ্বারা বৃহত্তম অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান বলে ভাণ করত যারা, তারা ছিল বহুবিধ গুণীন্, ওঝা, ম্যাজিসিয়ান, মেডিসিন-মেন প্রভৃতি তখনকার সবজান্তা বিদ্যাবাগীশেরা।

আমার জীবিতাবস্থায় অনেক স্তরের আদিম অধিবাসী-দের মধ্যে বাস ক'রে ঐ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। অনেক আদিম জাতি একেবারে উলঙ্গ থাকত। তাদের সঞ্চয়বুদ্ধি গজায় নি। তারা দিন এনে দিন খেত। আবার কোন কোন জাতের সঞ্চয়বুদ্ধি জেগেছিল। তারা সকলে মিলে অস্ত্রাদি উৎপাদন বা খাদ্য সংগ্রহ করত। সকলে মিলে বেঁটে বুটে অভাব পূরণ করত। তাদের মধ্যে কিছুটা আদিম সাম্যের ব্যবস্থা চালু ছিল। ঐ সকল আদিম জাতি অনেক রকমের কৌতূহল-উদ্দীপক ভূত, প্রেত, ব্যাধি এবং প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আদিকে কন্ট্রোল করবার হিক্মত দেখিয়েছিল।

উঃ। পরবর্ত্তীকালে ঐ ওঝা, গুণীন্ আদির খুব উন্নততর আপ-টু-ডেট্ সংস্করণ রূপে আপ্ত, দার্শনিক আদি মহাত্মারা হয়েছিলেন ক্রমাভিব্যক্ত। এই রূপেই ভূতাদির ধারণা থেকে ক্রমে উন্নত হয়ে হয়ে আত্মা, পরমাত্মা আদি সাকার নিরাকার অসংখ্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবদেবী

সমেত গড্, ভগবান, সুপ্রিম বিং আদির মিথ্যা উদ্ভট ধারণা বিশিষ্ট কৃত্রিম মনের (কম্প্লেক্সের) যে উদ্ভব হয়েছিল, তার প্রধান লক্ষণ ছিল—বৈজ্ঞানিক সত্য বা যুক্তি সইতে না পারা। আর মিথ্যা • স্বার্থসূচক কাল্পনিক কোন কিছুকে ধ্রুবসত্য ব'লে দৃঢ়ভাবে আঁকৃড়ে ধরা।

এইভাবে জ্ঞানার্জ্জনের সমস্ত পথ রোধ করে মিথ্যার দুর্ভেদ্য আবরণে, এই গ্রহটাকে সেকালে প্রভুরা "অচল আয়তনে" পরিণত করেছিলেন। চিড়িয়াখানার মধ্যে যেমন খাঁচা, আবার তার মধ্যে খাঁচা, তেমনি এই "অচল আয়তনের" মিথ্যা গণ্ডীর মধ্যেও অসংখ্য মিথ্যা গণ্ডী ছিল।

লীনা। এই সকল গণ্ডী ভেদ করে রেভলিউসন এসেছিল কেমন করে?

উঃ। ঐ গণ্ডীর মধ্যেও ক্বচিত দু-এক জন ক্ষণজন্মা মানুষের ফ্রি-থিংকিং-এর, অর্থাৎ সহজাত সত্যানুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির এক আধটুকু, কম্প্লেকস্ দ্বারা অনবদমিত থেকে যেত। তদ্দ্বারাই হয়ত কোন বেস্পতিবারের বারবেলায় মুহূর্ত্তের ফাঁকে আসল বিবেকের বা মানবতার মৃদু দংশন তাঁরা অনুভব করতেন। তাই অচলায়তনের ধর্ম্মতন্ত্রোদ্ভূত ঘন অন্ধকারে, সেই লেশমাত্র বিবেক জাত বিজ্ঞানরূপ বিজলী চমকে, কখনও ক্বচিৎ যা দেখা যেত তা ছিল প্রভুদাস-তন্ত্রেরই লীলা খেলা। ক্রমে এই প্রকার বৈজ্ঞানিক সত্য, ক্রমাভিব্যক্ত হতে হতে, সাম্যবাদের

বৈজ্ঞানিক আদর্শ জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমে প্রভূত শক্তিশালী হতে পেরেছিল। অবশেষে এই বৈজ্ঞানিক সত্যই অচলায়তনকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে এই গ্রহকে মিথ্যা দুর্নীতি আর প্রভুদাসতন্ত্রের কবল হতে মুক্ত করেছে। এরই নাম রেভলিউসন।

যে মিথ্যাবাদের দ্বারা মানব-সমাজে অচলায়তন পর্য্যবসিত, পরিচালিত, আর রক্ষিত হয়ে আসছিল, আলোচনার সুবিধার জন্য তার নাম দিতে পার 'কৈতববাদ।' এর উল্টো যা তার নাম বিজ্ঞানবাদ। কৈতববাদ কেন বলছি তাব কারণ হচ্ছে, মিথ্যাবাদ নামটাতে একটু ঝাঁজ আছে। মনে কর, মিথ্যাই যার ব্যবসা, সেই মিথ্যাবাদী মানুষটির হাতে কাজে মিথ্যা ধ'রে তাকে মিথ্যাবাদী ব'লে অভিহিত করলে, বেচারার মিথ্যারূপ ব্যাধিগ্রস্ত নির্জ্ঞান আর অবচেতন মনেব কম্‌প্লেক্‌স্‌ দ্বাবা অবদমিত (মিথ্যাসংস্কারাচ্ছন্ন) সংজ্ঞান মন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। তাই বলছি 'কৈতব' শব্দটি অপেক্ষাকৃত মোলায়েম। কানের মধ্য দিয়ে অথবা চোখের ভেতর দিয়ে ঢুকে, হঠাৎ মনে ছোবল দেয়না, রয়ে সয়ে,মবমে পশে। নয় কি? তোমার কি মনে হয়?

লীনা। ঠিকই বলেছ। মিথ্যাবাদী বললে, অনেকটা গালাগালির ভাবই মনে লাগে। কিন্তু কৈতববাদী বললে, সহজে সে ভাবটা মনে জাগে না। অথচ সত্য যা তা

মেনে নিতে কম সংকোচ বোধ হয়। এ আমি নিজের মনের কথাই বলছি।

উঃ। সে যাই হোক, সেকালে এই গ্রহে মানবোচিত ক্রম-বর্দ্ধমান মানব-জ্ঞানের • আয়তন, মাঝপথে কৈতব-বাদদ্বারা তার ক্রম বিস্তারের সহজ পথ, সবদিক দিয়ে রুদ্ধ ক'রে, সেই জ্ঞানের আয়তনকে ক্রমে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ অচল গতিহীন করা হয়েছিল। এই প্রকারে সীমাবদ্ধ রুদ্ধ-গতি জ্ঞানকে অচলায়তন নামকবণ করা হয়েছিল।

কোন দেশবিশেষের পক্ষে যেমন অচলায়তনের উপমাটা খাটে, সেকালের সমস্ত গ্রহটাব পক্ষেও তেমনি খাটে। এই উপমাটার সঙ্গে তোমার বিশেষ পরিচয় ছিল বলেই এখানে অচলায়তনরূপ উপমেয়ের উল্লেখ করলাম।

এই অচলায়তনে কৈতববাদের যে ইন্দ্রজাল অজ্ঞানান্ধ-কার সৃষ্টির দ্বারা জ্ঞানালোকেব পথ সুদৃঢ়রূপে রুদ্ধ করে ছিল, আর যা চোখে জ্ঞানালোক সহ্য করতে দিত না, তারই নাম ধর্ম্মতন্ত্র বা রিলিজান, কৈতববাদীরা যার নাম দিয়েছিল 'ধর্ম্ম'।

'ষ্ট্রাগল ফর্ এগ্‌জিস্‌ট্যান্‌স্' হচ্ছে ইভালিউসন থিওরীর একটা উপ-থিওরী। বেঁচে থাকতে হলে জীব মাত্রকেই অনেক কিছুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত ষ্ট্রাগল্ বা সংগ্রাম করতে হয়। সংগ্রাম খুব বেশী করেই নিত্য চালাতে হয় যে

জন্য, তা হচ্ছে সেই পূর্ব্বোল্লিখিত প্রধান ইন্‌ষ্টিংট্‌ self-preservation এবং sex এর ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে।

জীব জগতে একটা স্পিসিজ অন্য স্পিসিজকে ভক্ষণ, শোষণ, এক্‌স্‌প্লইটেস্‌ন্‌, ইউটিলাইজেস্‌ন্‌ আদি দ্বারা ক্ষুন্নি-বৃত্তি বা আত্মরক্ষা করেই বেঁচে থাকে। তাই বলতে পার, এক স্পিসিজের সঙ্গে অন্য কোন কোন স্পিসিজের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। কিন্তু এক স্পিসিজের পরস্পরের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক হত, তবে উন্নততর জীব-গুলির অস্তিত্ব সম্ভব হত না। তা'হলে জীব জগতের ইভলিউসন থিওরীও ব্যর্থ হত। তবে ক্বচিৎ কোন হীন-স্তরের জীব নিজের অধিকাংশ সন্তানকে প্রাকৃতিক বিধানে, না খেলে বা না ধ্বংস করলে, সেই স্পিসিজের অতিমাত্রায় সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অন্য জীবের, অর্থাৎ স্পিসিজের এক্সটিংট্‌ হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই খায় বা ধ্বংস করে।

কিন্তু মানুষ হচ্ছে জীব জগতের শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিজীবী প্রাণী। মানুষের সেই বুদ্ধি আর জ্ঞান অনন্ত। মানুষের সহজাত উচিত, অনুচিত বা ন্যায়-অন্যায় বিচারশক্তি অনন্য-জীব-সাধারণ বলে মানুষ গর্ব্ব করে। এ হেন মানব-জাতির শতকরা পঁচানব্বই জনকে জ্ঞানহীন দরিদ্র দাসে পরিণত ক'রে শোষণ, শাসন, পীড়ন আদি অবর্ণনীয় দুঃখানলে সারাটা জীবন পুড়িয়ে মারাই যে শতকরা পাঁচজন প্রভুদের স্বার্থ-সর্ব্বস্ব জীবনের একমাত্র ব্রত হয়েছিল, তাদের ঐ

রুদ্ধদ্বার মস্তিষ্কে মহান্ সাম্যবাদের পরিকল্পনা কেন আসেনি, তার কারণ তুমি এখন সহজে ধারণা করতে পার। অধিকন্তু দাস আর প্রভুর মধ্যে যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধের সৃষ্টি করেছিল, তার সমর্থন জন্য ঐ ষ্ট্রাগল্ ফর্ একজিষ্টান্স্-এর দোহাই দেওয়া হত।

লীনা। এখন আমার মনে হচ্ছে তারা (আমিও তাদের মত একজন ছিলাম) নিশ্চয় মানুষ নামের অযোগ্য ছিল।

উঃ। মানুষ বলতে "মনুর" সন্তান ব'লে ধরে নিচ্ছত? আদ্মি মানেও তাই!

লীনা। মানুষ শব্দটা এখন ম্যান (man) অর্থে ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় নাই। সে যাই হোক এই গ্রহের সেই কৈতববাদীদের মেরে ধরে জোর জবরদস্তিতে তাদের মনের কম্‌প্লেক্‌স্ ঘুচিয়ে দেওয়াই হত প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত কাজ।

অশরীরী আমি এখানে আসবার পরে, তোমার নিকট সেকালের সনাতনপন্থীদের দু'একটা মিথ্যা-প্রবণতার কথা শুনে, সত্য ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েও, মহাপুরুষদের প্রতি ঐ মিথ্যার অপবাদ সহ্য করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়েছিল। আমার জীবদ্দশায় পেলে, তোমায় হয়ত মেরেই খুন করতাম। আমি জানি অনেকে অনেককে মেরে খুন করেছিল এই জন্য।

উঃ। হয়ত তাতে সত্যের জয় বিলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ জয়, অর্থাৎ রেভলিউসন্‌কে ঠেকাতে পারেনি।

লীনা। সে যাই হোক এখন তুমি আমায় ক্ষমা করেছ। তোমার কৃপায় এখন আমার শ্রেণী-চেতনা সম্পূর্ণ হয়েছে। আমার নির্জ্ঞান আর অবচেতন মনের কম্‌প্লেক্‌স্‌ সম্পূর্ণরূপে অবদমিত হয়েছে। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা তা নির্দ্ধারণ জন্য বিচার বা তর্ক-বিতর্কের বড় একটা আবশ্যক হয় না। আমার মনের স্তর আর নাই।

উঃ। এখন তোমার আর আমার মনের প্রভেদ নাই সত্য। কিন্তু কম্‌রেড, রাগ কোরো না, এখনও তেমন বাক্যবাগীশ ঝানু কৈতববাদীর কবলে পড়লে "পুনর্মূষিক" না বললেও ছুঁচো হয়ে যেতে পার। সেই মহান্‌ রেভলিউ-সনের পূর্ব্বে আর অব্যবহিত পরে অনেকেই ঐ রকমে মূষিক আর ছুঁচো বনেছিল। তাদের মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক আর সমাজতান্ত্রিকও ছিল। তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যেমন সম্পূর্ণ হয়নি, শ্রেণী চেতনাও তেমনি অসম্পূর্ণ ছিল।

লীনা। আচ্ছা! রেভলিউসনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কৈতববাদ, ভক্তিবাদ, রিলিজান, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ আদি নানাবিধ মানসিক ব্যাধি স্বেচ্ছায় কি সবাই ত্যাগ করে কার্য্যত সানন্দে সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতা বরণ করে নিয়েছিল?

উঃ। না, তা নেয় নি। নিলে, সেই ক্রম-পরিবর্ত্তনকে রেভলিউসন না ব'লে,—ইভলিউসন বলা হত। জীব-জগতে

যে, একটা স্পিসিজ আর একটা উন্নত স্পিসিজে পরিণত হয়ে আসছে, তা-ই ইভলিউসন। কিন্তু মানুষের বেলায় এই রকম ইভলিউসন সংঘটন কত লক্ষ বা কোটি বছরে হতে পারে তা বলা যায় না। মানুষ সেই লক্ষ কোটি বছর অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। কারণ মানুষের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি হয়েছে অফুরন্ত। তাই মানুষের ইচ্ছাশক্তির ফলেই ত্বরা প্রগতির পথে বিলম্বিত ইভলিউসনের সঙ্গে রেভলিউসন অনিবার্য্য আর স্বভাবতঃ অবশ্যম্ভাবী। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও ইচ্ছা বিশিষ্ট অন্য যাবতীয় জীবের পক্ষে ঐরূপ রেভলিউসন সম্ভব হতে পারে না। এই হল সর্ব্ব মানবীয় আচরণবাদ বা সমাজতান্ত্রিক রেভলিউসনের মরেল বেসিস।'

কোন কোন মানুষ, ক্রমে বিজ্ঞানের বলে দেখল,—এই গ্রহে মানব-সমাজে এমন অস্বাভাবিক ধ্বংসাত্মক কৈতববাদ গড়ে উঠেছে এবং তার বৈষয়িক, অর্থাৎ ইকনমিক্ ব্যবস্থার অবস্থা এমন মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সন্ত বৈষয়িক সাম্য মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হলে, ইভলিউসনের নিয়মানুযায়ী মানব-সমাজ ক্রম-প্রগতির (উন্নতির) পথে না গিয়ে যে অশেষ দুর্গতির পথে যাচ্ছে, সেই পথ হতে উন্নতির পথে ফেরান অসম্ভব।

তখন বিজ্ঞান যা দেখাল তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে আদিতে অর্থনৈতিক মানুষ ছিল সহজ সরল সাম্যবাদী। তারপর ক্রমে হল—প্রভু আর দাস, এই দুই শ্রেণীতে

বিভক্ত। বহুকাল ধরে ভয় ও ভক্তিবাদের সাহায্যে সেই প্রভুদাসতন্ত্র ভগবৎবিধান রূপে করল মানব-জ্ঞানের পথ রুদ্ধ।

বিভিন্ন দেশে প্রগতিব ঐ রুদ্ধ পথ সংস্কারের চেষ্টা হয়ে আসছিল বহুকাল ধরে। কিন্তু সেই সমস্ত চেষ্টাও প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেছল। তারপরে কোন এক দেশে জোর জবর-দস্তিতে হঠাৎ পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ খণ্ড রেভলিউসনের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও, সাম্যবাদের আদর্শ বীজ সমস্ত গ্রহে ছড়িয়ে পড়েছিল। পবে এই গ্রহের একটি বিশেষ দেশে কয়েকজন প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টায় হঠাৎ যে বেভলিউসন সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল, তাতে একেবারে পূর্ণ সাম্যবাদ সদ্য প্রবর্ত্তিত না হলেও অবিলম্বে সমস্ত গ্রহে সকল দেশ-জোড়া পূর্ণ রেভলিউসনেব সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করেছিল।

এই বিশিষ্ট দেশের নব প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদকে ধ্বংস করবার জন্য অন্য সমস্ত দেশের কৈতববাদী অগণিত ধুবন্ধরেরা প্রাণপাত করেছিল। তাতে সমস্ত গ্রহে লোকক্ষয়, অর্থনাশ ও দুর্নীতির প্রকোপ এত বেড়েছিল যে পূর্ব্বে কখনও এমনটা হয়নি। এই সাম্যবাদ ক্রমে দেশে দেশে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ ক'রে, একদিন সমস্ত গ্রহ-জোড়া সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার মহান্ রেভলিউসন সংসাধিত করেছে।

লীনা। এত রক্তপাত কি—

উঃ। কি জান? পুরাতন মানুষ (মাতৃগর্ভ) থেকে, নতুন অপাপবিদ্ধ শিশু রূপে সম্পূর্ণ নতুন মানুষের আবির্ভাব হয়, তখন মাতৃ জরায়ুতে পচে না মরে, যথা-সময়ে, তাকে তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়তেই হয়, স্বভাবতঃ তাতে বেদনা, রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী; তাই কল্যাণজনক। আবার পুরাতনের (মাতার) সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদের জন্য অতি সাবধানে নাড়ী কাটতেই হয়। এতেও রক্তপাত আর বেদনা স্বাভাবিক, অনিবার্য্য এবং মঙ্গলদায়ক। মানুষের সমাজ-জীবনেও ঠিক তাই। এই গ্রহের দুর্গত পুরাতন সমাজ হতে রেভলিউসনের অনিবার্য্য বেদনা আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে এমন অপাপবিদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন এক পবিত্র মানব-সমাজ উদ্ভূত হয়েছে যার মহিমা আমাদের পুরাতন ভাষায় পুরাতন মনে পূর্ণরূপে ধারণা করা বা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

লীনা। আচ্ছা! রেভলিউসনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কৈতববাদ, ভক্তিবাদ, রিলিজান, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা আদি নানাবিধ ব্যাধি স্বেচ্ছায় সবাই ত্যাগ ক'রে, সানন্দে কি সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতা মেনে নিয়েছিল?

উঃ। না, তা মেনে নিতে পারে নি। প্রায় প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোক কিছুটা মেনে নিয়েছিল। এমনও অনেক অতি বড় ধর্ম্মের দেশ ছিল, যাদের জোর জবর-দস্তিতে মানিয়ে নেওয়াতে হয়েছিল। নীতির দিক্ থেকে

সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় মেনে না নেওয়া সবচেয়ে অন্যায় অপরাধ ও পাপ বলে বিবেচিত হত। এই রূপ অপবাধীর দণ্ড স্বরূপ ঐ জোর-জবরদস্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল। এখন এখানে সকলেই ঐ জববদস্তিকে সঙ্গত বলে ত সমর্থন ক'রেই, অধিকন্তু অনেকে মনে করে ঐ সকল মানব শত্রুদের যুগ যুগ ব্যাপী শত্রুতার প্রতিশোধমূলক দণ্ডবিধানই উচিত ছিল। কাবণ প্রতিশোধ দেওয়া জীবমাত্রেবই একটা সহজাত ইনষ্টিংট্। জীবের আদি ইন্‌ষ্টিংট্ Self-preservation এব এটা প্রধান সহায়। এই সহজাত ইন্‌ষ্টিংটকে মানব-মন হতে উচ্ছেদ করা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অসঙ্গত। মনেব অন্য সকল প্রবৃত্তিব ন্যায় এই প্রতিশোধ-প্রবৃত্তিকেও সংযত ভাবে সক্রিয় বাখা যে আবশ্যক তা এখন সকলে স্বীকাব কবে। আমরা এর পবে এমন একটা সদৃশ গ্রহে যাব যেখানে বেভলিউসনের আগে পঞ্চাশ বছব ধবে যে সকল উদ্যোগ আয়োজন অনুষ্ঠান আদি চলছে তা হুবহু দেখতে পাবে। এখন কি তুমি এই গ্রহটা আবার একবার খুব ভাল কবে দেখবে? আমার মনে হয় অনেক বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য ঠিকমত বোঝাতে পারিনি, অথবা তুমিও ঠিকমত ধারণা করতে পারনি। অনেক কিছু একেবাবে ছেড়ে গেছি। হয়ত অনেক কিছু উল্টো বুঝেছ। তাই বলছি, আব একবার ভাল করে সব দেখলে কেমন হত?

লীনা। দেখবার অনেক কিছু বাকী আছে, আর দেখবার ভুলও অনেক কিছু হয়েছে, জানি। আর একবার নয় অনেকবার দেখলে তবে হয়ত দেখা সার্থক হতে পারে। কিন্তু তুমি এই মাত্র যে রেভলিউসনের পূর্ব্বের অবস্থা, অন্য একটা সদৃশ গ্রহে দেখাবে বললে! এখন তাই আগে দেখব। সেই গ্রহটা দেখতে দেখতে আবশ্যক হলে এই গ্রহ আর এর থেকে উন্নত বা অবনত গ্রহ দেখতে পারব।

এখন বল, রেভলিউসনের অব্যবহিত পরে, যে সব কৈতববাদীরা পরার্থপরতা বা সাম্যের আদর্শ কিছুতে নিতে পারল না তাদের কি ব্যবস্থা হয়েছিল?

উঃ। এই গ্রহবাসীদের প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী লোকেব শ্রেণী-চেতনা কতকটা জেগেছিল। সেই সঙ্গে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী জেগেছিল তা সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হতে পারেনি। জন্ম জন্মান্তর হতে অর্জ্জিত ভক্তিবাদের অথরিটি মেনে চলবার এবং মিথ্যাপ্রবণতার বদ্-অভ্যাস পরবর্ত্তী দুটো জেনারেসন অবধি কিছু না কিছু চলে আসছিল। শিক্ষা-প্রণালীর গুণে এখন সকলে ঐ ব্যাধি ও আরও বহুপ্রকার ব্যাধির কবলমুক্ত হয়েছে।

বাকী শতকরা পঞ্চাশ ভাগের চল্লিশ ভাগ লোকের কাজচলা গোছ আরও হাল্কা ধরণের শ্রেণী-চেতনা জেগে-ছিল। এদের অনেকে গড্ডলিকা প্রবাহ করেছিল।

বাকী দশ ভাগকে তাদের অন্যায় আবদার ত্যাগ করতে, অনেক চেষ্টার পর অবশেষে বাধ্য করা হয়েছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের দেশের লোকরা।

রেভলিউসনের পরই সমস্ত গ্রহে সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতা পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব হয় নি। তা করতে লেগেছিল প্রায় ৭০ বছর, অর্থাৎ দশটি সপ্ত বার্ষিকী পরিকল্পনা ; তখন রেভলিউসনের পূর্ব্বের সমস্ত প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ গতাসু হয়েছিল। প্রথম সাত বছর ডিক্‌টেটারী শাসন চলেছিল। এই সময়টা অতীব সংকট আর বিঘ্ন-সঙ্কুল ছিল। সেজন্য নেতারা আগে হতে প্রস্তুতও ছিলেন। কোন রকমে প্রথম সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনা আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এতে সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন ছিল তা অপসারণের এবং সেই পথকে সুগম করার কাজে সমস্ত আয়োজন প্রয়োজন সংসাধিত হয়েছিল।

এই সাত বছরে সমস্ত আবাদী জমি, সমস্ত বড় বড় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, যন্ত্র, কারখানা, খনি, যান-বাহন আদি নিয়ন্ত্রণ আর উৎপন্ন বস্তুর বণ্টন আদি ব্যবস্থা, সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত ডিক্‌টেটরের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়েছিল। ডিক্‌টেটার ছিলেন পূর্ব্ব পরিকল্পনার নিয়মাধীনে। তাঁর ছিল বহু পরামর্শদাতা। সকলকে সামর্থ্য মত, সার্ব্বজনীন প্রয়োজন মত এবং রুচি মত

শ্রম করতে হত। তবে এটা বাধ্যতামূলক ছিল না। লোকমতের বৈজ্ঞানিক মর‍্যাল প্রেসারে লোকে স্বেচ্ছায় সাধ্যমত শ্রম করে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। দুটি সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনা সিদ্ধ হওয়ার পর এই শ্রম—শৌচ, স্নান, খাওয়া, পরার মত নিত্য কর্ম্মে পরিণত হয়েছিল।

সর্ব্বত্র প্রায় সকল কাজে সমবায়-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। সমস্ত গ্রহে যুদ্ধ-বিগ্রহ আদির কোন রকম আবশ্যক আর ছিল না বলে তার সম্ভাবনাও একেবারে ছিল না। সামরিক যত কিছু সবই সর্ব্বত্র বেসামরিক কাজে লাগান হয়েছিল। সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনের বেশী কোন কিছু উৎপাদিত হত না। প্রথম কয়েক বছর উৎপন্ন বস্তুর কিয়দংশ সমবায় সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এবং ইমার্জ্জেন্সী আদির জন্য স্থানীয় সমবায়-ভাণ্ডারগুলিতে মজুত রাখা হত। অবশিষ্টাংশ শ্রমিকদিগকে ভাগ করে দেওয়া হত। এখন কিরূপ ব্যবস্থা হয়েছে তা তুমি পূর্ব্বে দেখেছ।

সমস্ত গ্রহে এরূপভাবে বণ্টন আর চালানের কাজ সুরু হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি লোক অনেকটা রুচিমত সমান পরিমাণে ও প্রায় সমান মূল্যের বিজ্ঞান-সম্মত আবশ্যক খাদ্য, বাসভবন, পরিধেয় আর অন্য যাবতীয় ব্যবহার্য্য বস্তু আদি পেয়েছিল। গ্রহের সমস্ত মানুষের ব্যবহার্য্য সমস্ত বস্তু ও স্থান, এমন কি শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর বৈজ্ঞানিকভাবে শুদ্ধ করতে, কত শ্রম আর বৈজ্ঞানিক

উপায় যে প্রয়োগ করতে হয়েছিল তার ইয়ত্তা নাই। আর মানবমনের কৈতববাদের দুর্নীতি চিরতরে মুছে ফেলতে অভিনব বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন সুরু হয়েছিল। তা আগে কিছুটা তুমি দেখেছ।

অর্থের প্রচলন স্থগিদ হওয়ার আগে প্রথম কয় বছরের জন্য অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল নানাবিধ অভিনব উপায়ে। দরিদ্র আর মধ্যবিত্তদের ওপর চাপ একেবারে দেওয়া হয়নি। বরং তাদের অবস্থা এমন স্বচ্ছল হয়েছিল যে তার ধারণাও পূর্ণভাবে কেউ কখনও করতে পারেনি। পূর্ব্বের সমস্ত মুদ্রা আর নোটের চলন বন্ধ হয়েছিল। একই রকমের নতুন নোটও খুচরো মুদ্রা সমগ্র গ্রহে চালু হয়েছিল। ব্যবসায়ী আদি সর্ব্ববিধ ধনী প্রভুদের মজুত ধন, সম্পদ, অর্থ ক্রমে ঋণরূপে গ্রহণ করেছিলেন ডিক্‌টেটার। সাত বছর পরে ডিকটেটারী চলে গেল। সমস্ত গ্রহে সমবায় গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত হল। দ্বাদশ বছরে টাকা, কড়ি, নোট আদির প্রচলন বন্ধ হল; সোনা রূপা মূল্যহীন, অর্থাৎ অন্য ধাতুর মত নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারে লাগান হয়েছিল।

যে সকল দেশের জীবন ধারণ প্রণালী পূর্ব্বে উন্নত ছিল, অথবা যে সব দেশ আংশিক রেভলিউসন দ্বারা পূর্ব্বেই অল্পাধিক জনগণ পরিচালিত সাম্যের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, সেই সকল রাষ্ট্রের মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর অভ্যস্ত বৈজ্ঞানিক রুচিসঙ্গত খাদ্য, পরিধেয় আদি অন্য

সকল দেশের অভিজাত দরিদ্র সকলে সমান ভাবে পেত।

এতে অতি উচ্চ অভিজাত প্রভুদের আবশ্যক বস্তু, প্রথম কয়েক বছর নিকৃষ্টতর হয়েছিল, তাতে অভিজাত, দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যহানি ত হয়নি, অধিকন্তু তাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি আর প্রভুদাস মনোভাবটা একটু হাল্কা হয়ে আস্‌ছিল। এ কথাটা তুমি ধারণা করতে পারছ না ব'লে একটা দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হচ্ছি। এতে কারণ না দেখালেও তুমি সহজে বুঝতে পারবে।

যাবৎজীবন দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ভদ্র, ইতর সাধু সকলকে (সেখানেও সাধু সন্ন্যাসী পাপী সকলকেই সমান অথচ পূর্ব্বোক্ত খাদ্য অপেক্ষাও নিকৃষ্ট) স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিধেয় বাসস্থান আদি দেওয়া হত। যে সকল প্রভু-শ্রেণীর কয়েদী মুক্তির আশায় প্রায়োপবেশন বা স্বাস্থ্য-হানির ভাণ করত, তাদের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখলে বোঝা যেত, প্রায় সকল রকম কয়েদী শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ করত। কয়েদী-দের খাদ্যে যথেষ্ট শ্রমশক্তিবর্দ্ধক বৈজ্ঞানিক উপাদান থাকত; তাতে কারুর শ্রমে আলস্য দেখা দিত না।

প্রথমটা আবশ্যক বস্তু উৎপাদন ঠিকমত বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। যা উৎপন্ন হয়েছিল, তার অনিবার্য্য প্রাথমিক অপব্যয় আদি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট

সমস্তই কতকটা সমানভাগে বণ্টন করাতে, প্রভুশ্রেণীর পক্ষে ভাগটা একটু নিকৃষ্ট হয়েছিল। আগে থেকেই পরিকল্পনায় ধরাই ছিল, প্রভুদের জীবন ধারণের মান (standard of life) না কমিয়ে দাসেদের মান, প্রভুদের সমানে বাড়াতে চেষ্টা করা হবে। দ্বিতীয় সপ্ত-বার্ষিকীর মধ্যে তা কতকটা কার্য্যে পরিণত হয়েছিল।

ধনীদের অভ্যাস ও আবশ্যকের অতিরিক্ত অকারণ অতিভোগের বস্তু বা ব্যবস্থা বন্ধ করে, তা রোগী আর বিপন্ন, যাদের নিতান্ত আবশ্যক, তাদের ব্যবহারে লাগান হয়েছিল।

ঐ অভিজাত ধনী প্রভুরা, পুরুষানুক্রমে হাজার হাজার বছর যাবৎ দুঃখী দরিদ্রের মুখের অন্ন, গায়ের কাপড়, বাসের ঘর আদি থেকে পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক কারণেই নাকি বঞ্চিত করে আসছিল। তাই তাদের বর্ত্তমান ধর্ম্ম (?) বুদ্ধিতে বা বৈজ্ঞানিক বিবেক বুদ্ধিতে, হাতে খড়ি দেবার বা নেবার জন্য আবশ্যক বস্তুর নিকৃষ্টতা জনিত দুঃখকে, ঐ হিমালয় সদৃশ পাপের কিঞ্চিৎমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ব'লে স্বীকার করে নিতে প্রভুরা বাধ্য হয়েছিল।

প্রভুদের সবচেয়ে বেশী আপশোষের বিষয় ছিল, তাদের এত সাধের প্রভুত্ব, যার আসল নাম স্বাধিকার-প্রমত্ততা, তা চিরকালের জন্য ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুটি সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনা আশানুরূপ কার্য্যকরী

হওয়ার পর, কেবল প্রভুদের নয়, সার্ব্বজনীন খাদ্য, পরিধেয়, বাসভবন, যান প্রভৃতি আর জ্ঞান, শ্রমশক্তি, স্বাস্থ্য, চিন্তাশক্তি আদির উৎকর্ষ উত্তরোত্তর অভূতপূর্ব্বরূপে বাড়ছিল। দাসশ্রেণীর আনন্দের কথা আর কি বলব!

সর্ব্বত্রই জনগণের সমবায় ভাণ্ডার খোলা হয়েছিল। তা থেকে সপ্তম বছরের পর সকলে সুশৃঙ্খল ভাবে র‍্যাসন টিকিট অনুযায়ী সব আবশ্যক জিনিষ পেতে সুরু করেছিল। চুরি প্রতারণার সকলপ্রকার উপায় বা পথ কঠোরভাবে বন্ধ করবার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; তবু পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ অর্থ বা সম্পদ্ সঞ্চয় অথবা অপব্যবহার চলত। ব্যক্তিগত সঞ্চিত অর্থ বা সম্পদ্, জনসাধারণের স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্কে বা ভাণ্ডারে জমা দিতে হত। সার্ব্বজনীন কর্তৃত্বা-ধীনে স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য ব্যাঙ্ক আদি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কেউ সঞ্চিত অর্থদ্বারা ব্যক্তিগত উপার্জ্জনের পন্থা স্বরূপ অন্যের শ্রম নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনতে ডিক্‌টে-টারী আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল।

পূর্ব্ব প্রথা অনুযায়ী প্রথম দু-বছর প্রায় সমস্ত গ্রহে সমস্ত বস্তু কিছুটা উৎপন্ন হয়েছিল—। তাই যথাসাধ্য সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারা সার্ব্বজনীন অভাব অতি কষ্টে মোচন করা হয়েছিল। সামরিক যত কিছু ঘর, বাড়ী, ব্যারাক, দুর্গ, জেল, হস্‌পিতাল আদি আর অসংখ্য ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্স বিল্ডিংস্, হরেক রকম অফিস, গুদাম, অভিজাত ধনীদের

অতিরিক্ত বাড়ী ঘর প্রাসাদ আদি আর তার আসবাব-পত্র দরিদ্র গৃহহীনদের বাসস্থান ও ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত হয়েছিল।

তৃতীয় সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে, সকল দেশের মধ্যবৃত্ত আর শ্রমিক শ্রেণী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল যে, আর তারা কিছুই চায় না। এমনি ক'রে তাদের অভাববোধ-শক্তি সঙ্কোচ ও নাশ করা হয়েছিল যে, তারা ভাবতে পারেনি আর তাদের কি অভাব। শ্রেণী-চেতনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ বাধামুক্ত নতুন নতুন জ্ঞানার্জ্জন-শক্তি যেমন তীব্রবেগে বাড়ছিল, সেই সঙ্গে অভাববোধশক্তিও তেমনি বাড়ছিল।

তৃতীয় বছর সমবায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নতুন নতুন কৃষি শিল্প অভূতপূর্ব্ব উদ্যমে অভিনব যন্ত্র সাহায্যে এত অধিক উৎপন্ন হতে লাগল যে, দৈনিক শ্রমের সময় দশ বার ঘণ্টা হতে নেমে এসে পাঁচ ছয় ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয় বছরে নতুন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুরু হয়েছিল, সর্ব্ব বয়সের লোকের শিক্ষা-দীক্ষা। পূর্ব্বেই তোমাকে তার অনেক কিছু দেখিয়েছি।

সমস্ত গ্রহের সামরিক বিভাগ একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে সেই কর্ম্মশক্তি, যন্ত্রশক্তি আর তার সব কিছু দিয়ে পূর্ব্বোক্ত নতুন নতুন সমবায় সহর নির্ম্মাণ সুরু হয়েছিল ৪টি সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত

শহর নির্ম্মাণকার্য্য সম্যক সমাধা হয়েছিল। তারপর গ্রাম ভেঙ্গে, খানা-ডোবা বুজিয়ে, আরও অনেক কিছু করে সমস্ত গ্রহের যেখানে যা আবশ্যক ঠিক তাই ক্রমে সম্পাদিত হতে লাগল।

রেভলিউসনের অব্যবহিত পরেই সমস্ত গ্রহে চিন্তার অনধীনতা * ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে সকল ধর্ম্ম ও উপাসনার পূর্ণ 'স্বাধীনতা'ও ঘোষিত হয়েছিল।

ক্রমে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি এবং অভিনব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ক্রমে সার্ব্বজনীন রূপে দ্রুত প্রসার লাভ করাতে এবং অভিনব বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ভূরি ভূরি সত্যের প্রভাবে যখন সর্ব্বসাধারণের "বৈজ্ঞানিক সত্য-ফোবিয়া ব্যাধি" চিরতবে ঘুচে গেছল, আর যখন ধর্ম্মের উপাসনা, প্রার্থনা, ত্যাগ, সন্ন্যাস আদির দ্বারা কোন রকমে "চতুর্ব্বর্গ ফল" (বিশেষ করে দ্বিতীয় তৃতীয় ফলও) লাভের সম্ভাবনা একেবারে রইল না এবং সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার কল্যাণে উক্ত "চারিটি ফল" ছাড়া, নিত্য নব নব

* অনধীনতার ইংরাজি প্রতিশব্দ Independence, freedom বা liberty, আর স্বাধীন=স্ব (=self)+অধীন (=dependent) অর্থাৎ self-dependent, এর সঙ্গত কোন মানে হয় না। তবু টেনেটুনে যে দুটো মানে করা যেতে পারে তার প্রথমটা হচ্চে স্বাধীনতা মানে স্বরাজ (self-government)=জেতার অধীন বিজেতার স্বহস্তে রাজ্য শাসন। স্বাধীনতার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে স্ব (নিজের অর্থাৎ নিজ মনের ধারণার) +অধীনতা (অর্থাৎ ভক্তিরূপ গণ্ডীদ্বারা সীমাবদ্ধ মনের অধীনতা)=স্বাধীনতা।

সুন্দরতম "ফল" নিত্য প্রত্যক্ষরূপে সকলে সমানভাবে যখন পেতে লাগল, তখন হতে ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যত কিছু শব্দ, এই গ্রহের সার্ব্বজনীন ভাষা হতে বিলুপ্ত হয়েছে। যাই হোক প্রথমে রিলিজান আর উপাসনার পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল।

লীনা। এখনও যে এই গ্রহের অনেক স্থানে ধর্ম্মের উপাসনার মন্দির আদি রয়েছে!

উঃ। সে সব এখন সনাতন ধর্ম্মের মিউজিয়াম্‌রূপে বিদ্যমান রয়েছে।

ডিকটেটার্‌সিপ্‌ যতদিন চালাতে হয়েছিল ততদিন, অর্থাৎ প্রথম সাত বছর, যে কাজের দ্বারা অন্যের কিছুমাত্র অসুবিধা বা অন্যের কোনপ্রকার ক্ষতি হয়, সে রকম কাজ, আইনের দ্বারা সঙ্গতরূপে নিষিদ্ধ হয়েছিল। যেমন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ব্যক্তি বা জাতিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলাদলি, ছুঁত, অস্পৃশ্যতা, কোনপ্রকার অযৌক্তিক সংস্কার, অকারণ কোন কিছু করা ইত্যাদি। এই সকল বহু অবৈধ কাজের অন্যায্যতা বৈজ্ঞানিক যুক্তি, তর্ক, কারণ দিয়ে লোকের মন, চিন্তা, স্বভাব, চরিত্রাদি সংশোধন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন করবার জন্য, হাজার হাজার সুদক্ষ বিজ্ঞানবিদ্‌ বা 'আচরণবিদ্‌' প্রচারক নিযুক্ত হয়েছিল।

প্রথম সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে, যখন দেখা গেল, অনেকগুলি নর-নারী কোন রকমে সনাতন

স্বভাব ও অভ্যাস ত্যাগ করতে এবং নব গঠিত সমাজের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করা ভুলতে পারল না, তখন তাদিগকে বেছে বেছে, কয়েকটা স্বাস্থ্যকর, উর্ব্বর, প্রকাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে সিগ্রিগেট করা হয়েছিল। সেখানে তারা সনাতন প্রথায় ধর্ম্মসম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ আদিতে বিভক্ত হয়ে বাস করতে সুরু করেছিল। সেখানে সেট্‌ল করবার জন্য তা'দিগকে যথেষ্ট খরচ-পত্র সাহায্য দেয়া হয়েছিল। আর দেয়া হয়েছিল একজন উপযুক্ত সহৃদয় গভর্ণর জেনারেল। তাঁর পরামর্শদাতারা ছিলেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক।

লীনা। তারা কি, দ্বৈতবাদ আর তার রিলিজান, ভক্তিবাদ, জাতীয়তাবাদ আদি সব মিথ্যা ব'লে বুঝে সুজে ত্যাগ ক'রে, বিশেষতঃ প্রভুরা প্রভুত্ব ত্যাগ ক'রে সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতা অবশেষে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল ?

উঃ। অবশেষে তারা স্বেচ্ছায় মেনে না নিয়ে পারেনি। প্রথমে কিন্তু তারা মেনে নিতে পারেনি,—কারণ তাদের সব চেয়ে অসহ্য হয়েছিল যা, এবং যা তারা কিছুতেই ধারণার মধ্যে নিতে পারেনি, তা ছিল, সকল রকমের দাসরা, যারা সংখ্যায় প্রায় দশ গুণ ছিল, তারা যে প্রভুদের সঙ্গে সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন, তা স্বীকার করে নেয়া। যারা এই সাম্যের মনোভাব ডিক্‌টেটারির প্রথম সাত বছরের মধ্যে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না, তারা আর তাদের অনুগত দাসরা

সেই সমাজতন্ত্রশাসিত এলাকার বাইরে, সাতটি সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার ৫০ বছর, প্রায় দুটি জেনারেসন প্রভুদাস-তন্ত্রের জাবর কাটছিল।

তারা কিন্তু সমগ্র গ্রহে খবরাখবর আদান প্রদান আর গতিবিধির ফলে, উপনিবেশ স্থাপনের গোড়া থেকে, (তারা রক্ষণশীল হলেও), প্রগতিশীল-জাতীয়তাবাদের পন্থা গ্রহণ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে করে নিয়েছিল। তারা ভক্তিবাদের ধ্বজাধারী হলেও, সমস্ত গ্রহে বেভলিউসনের পূর্ব্ব হতে বৈজ্ঞানিক সত্যের অপ্রতিহত বেহুঁস প্রভাব তারা এড়াতে পারেনি। তাই সেই উপনিবেশ পত্তনের প্রথম হতে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি আদি সর্ব্ব বিষয়ে বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্য নিতে তৎপর হয়েছিল।

প্রভুদাস তন্ত্র, যার একটা ভদ্র নাম জাতীয়তাবাদ, তা বজায় রেখে, সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার মহান্ আদর্শকে চ্যালেঞ্জ ক'রে, যে শ্লোগ্যান তারা নিয়েছিল, তা শান্তি-শৃঙ্খলা-স্বাধীনতা, অথবা ঐক্য-ঐতিহ্য-স্বাধীনতা।

দাসেদের বেকার সমস্যা সহজে তারা ঘুচাতে পেরেছিল। তড়িঘড়ি উপনিবেশ গড়া সুসম্পন্ন করতে লেগেছিল অনেক কুলি মজদুর। মজুরীও বাড়িয়েছিল কিছু, দাসদের বাসস্থান-সমস্যা অনেকটা ঘুচিয়েছিল। শিক্ষা আর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা অনেকটা উন্নত হয়েছিল। সাধারণতঃ জীবনের

মানও কিছুটা বেড়েছিল। শিল্প-বাণিজ্য কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা যেমন বেড়েছিল, ক্রয়-শক্তিও তেমনি বেড়েছিল। বলা যেতে পারে, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের যতদূর উন্নতি সম্ভব সেখানে তা হয়েছিল। আর জাতীয়তাবাদের (প্রভুদাস কৃষ্টির) কর্ণধার প্রভুদের, চরম ও পরম কাম্য যে প্রভুত্ব, যথেচ্ছাচারিতা, যার নাম জাতীয় স্বাধীনতা আর স্বাধিকার প্রমত্ততা ইত্যাদি, তা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেছিল প্রভুরা। দাসেদের কিছুটা অভাব বোধ ঘুচতে না ঘুচতে, চোখের সামনে, প্রভুদের প্রাচুর্য্যের দিন দিন বাড়তির ওপর বাড়তি দেখে দাসেদেরও অভাব বোধ বা দারিদ্র্যবোধ উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে, শান্তি-শৃঙ্খলা আর তথাকথিত স্বাধীনতার গণ্ডী ছাড়িয়ে, অভিনব সাম্য-মৈত্রী-অনধীনতার জন্য তাদের অভাব আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছিল।

এই প্রভুরাও দেখছিল সকল রিলিজান, উপ-রিলিজান আর রাজনীতির বিধি নিষেধ ও আইন প্রচলনের অক্লান্ত চেষ্টা, আদিমকাল হতে রেভলিউসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে যে করা হচ্ছিল, তা ক্রমে নিদারুণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলই, অধিকন্তু সেই সকল শ্রেণী স্বার্থসাধনের নীতি আদি, একপক্ষ থেকে মান্য করাবার জন্য মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শোষণ, অন্যায়, উৎপীড়ন আদি যেমন ক্রম-বর্দ্ধিতভাবে আচরিত হতেছিল, অন্য পক্ষে দাসেদের

তরফ হতে সেই তথাকথিত নীতি আদি থেকে বাঁচবার জন্য ততোধিক ঘৃণিত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চুরি, ডাকাতি, ধর্ম্মঘট, বিদ্রোহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ আদি থেকে নরহত্যা পর্য্যন্ত সকল দুষ্কর্ম্মের ও দুর্নীতির নেশা বা ব্যাধি ক্রমাগত বেড়েই আসছিল।

কিন্তু মানবের আদিম অবস্থা হতে রেভলিউসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাজার হাজার বছরের তুলনায়, তার পরের এই পঞ্চাশ বছর অতি নগণ্য।

এই গ্রহে অনাদিকালের বিষয় বাসনা আদি ত্যাগ করাবার বৃথা চেষ্টা না ক'রে, ঐ পঞ্চাশ বছরে সকলের বিষয়-বাসনা সমান ভাবে ভোগের নিশ্চিত পথ সুগম করবার সুরুতেই সমস্ত গ্রহবাসীর মিথ্যা-প্রবণতা, চুরি, চামারি, নরহত্যাদি ঘৃণিত যাবতীয় দুর্নীতির বদলে, যা সকল রিলিজানের মূলনীতি, পূর্ব্বে যা কখনও সার্থক হয়নি, যা এখন এই গ্রহে চিরস্থায়ীরূপে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে, তা' হচ্ছে:—

সচ্ বাত অভেদ জ্ঞান
পর দ্রব্যেমি নৈরাশ।

তারপরে,—

এ তিন মে যব নাহি মিলে হরি,
তব ত জামিন তুলসী দাস॥

লীনা। যদি সত্যই হরি থাকতেন, তবে ঐ প্রভুদের কি যে দশা হত, তা ধারণা করবার চেষ্টাতেই ঘৃণায় আর দুঃখে সংজ্ঞা লোপ হয়ে আসে। সে রকম অন্তর্য্যামী হরি নিশ্চই নাই, তাই রক্ষা!

উঃ। হরি বলতে এখানে Well-being—যার মানে সার্ব্বজনীন "সত্যম্—শিবম্—সুন্দরম্।"

মূল গ্রহের এই সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করেই অবশেষে হতভাগ্য দ্বীপান্তরিত জাতীয়তাবাদীর শেষদল অগত্যা সাম্য মৈত্রী-অনধীনতা মেনে নিয়ে ধন্য হয়েছিল।

লীনা। তোমার সেই ল্যাংড়া আমের কি হল, শুনি।

উঃ। আচ্ছা! শোন তবে। তোমার সঙ্গে যিনি বসে খাচ্ছিলেন, সেই যুবক বন্ধুটি যাবার সময়, তোমার জানালার পানে চেয়ে, তুমি নাই দেখে ভিখারিণীকে একটা আট আনি দিয়ে গেলেন। একটা পয়সা বা একটা আনি দিয়ে যেকালে লোকে সাধারণতঃ মনে করত, দয়াধর্ম্ম নামে যে একপ্রকার ধর্ম্ম ছিল, তাপালন জন্য যথেষ্ট দান করা হয়েছে, সেখানে আট আনা দেবার অন্য কারণ সম্ভবতঃ ছিল। হয়ত তোমার মত সুন্দরীর সঙ্গে আলাপে তিনি আশাতীত রূপ তৃপ্ত হয়েছিলেন। কিম্বা ভিখারিণীর বয়েস এবং গায়ের রংটা হয়ত মন্দ ছিল না, অথবা সেদিন আশানুরূপ যথেষ্ট কিছু লাভ হয়ত হয়েছিল। যাই হোক

ঐরূপ কোন কারণে তখন তাঁর মেজাজটা ছিল—দিল দরিয়া গোছের।

লীনা। আর এওত হতে পারে তাঁর পকেটে খুচরা ছিলনা; কিম্বা সেই ভিখারিণীকে আমি কিছু দিই নি ব'লে, প্রতিবাদ স্বরূপ বেশী করে দিয়েছিলেন।

উঃ। সে যাই হোক ঐ রকম দুঃখীর দুঃখ নিবারণ জন্য তোমার বন্ধু বা তাঁর মত অন্য কেউ কিছুই করতেন না; এমন কি কারও ঠিক মত দুঃখানুভূতিও জাগত না। অনেকে নরনারায়ণের সেবা রূপে ঐ দয়া ধর্ম্ম পালন করত। তাতে দুঃখীর যেমন ক্ষণিক ক্ষুন্নিবৃত্তি জনিত আপাত একটু দুঃখনিবৃত্তি হত, তেমনি শ্রম-কাতরতা, ভিক্ষাবৃত্তি আর ভিক্ষা-ব্যবসায়ে প্রশ্রয় দেয়া হত। এতে মানব-সমাজে দুঃখীর বা ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ত বই কমত না। বিশেষ করে মানবতার শ্রেষ্ঠ দান যে আত্ম-সম্মান তা থেকে ঐ প্রকার দানের দ্বারা তাদের চির বঞ্চিত করা হত। অধিকন্তু যে দেশে উচ্চ নীচ সব মানুষের পক্ষে ভিক্ষাই ধর্ম্মানুমোদিত পরম পবিত্র উপজীবিকা বলে বিবেচিত হত, সেখানে স্বার্থে বা পরার্থে শ্রম অতীব ঘৃণ ছিল। আর সেইখানে নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারলে আত্মসম্মান, প্রভুত্ব এবং আত্মপ্রসাদ আদি বাড়ত। তাতে রক্ষা হত বনেদি সভ্যতা আর সানাতন ঐতিহ্য।

আচ্ছা! এখন বল—সেদিন দারিদ্র্যের ঐ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখে, কেমন করে তুমি উদাসীন আর নিশ্চিন্ত ছিলে?

লীনা। এর উত্তর তখন দিতে হলে বোধ হয় আবোল তাবোল প্রলাপ বক্‌তাম। কেন নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছিলাম তার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, আত্মীয়-স্বজন আদি সকলকে দেখতাম-নিত্য তাঁরা ঐরকম ঔদাসীন্য দেখাতেন। খুব করুণ ভাবে কাকুতি মিনতি করলে, তবে ওরূপ স্থলে দু-একটা পয়সা অনেকে দিত, আমিও কখনও কখনও দিতাম।

কিন্তু বাল্যে, ক্রমে যখন বোধশক্তি বাড়ছিল, তখন ঐরূপ দুঃখ দৈন্য দেখলে প্রাণে বেশ লাগত। তাদের দুঃখ নিবারণ জন্য কিছু দিতে পারলে, বা অন্য কেউ দিলে বেশ সোয়াস্তি বোধ হত। অন্য অনেক ছেলের দেখেছি, তারাও কখনও কখনও ঘরের লোককে না দেখিয়ে চুপি চুপি কিছু দিত। অনেক সময়, এও দেখেছি পাছে তারা বেশী চাল বা অন্য কিছু দিয়ে ফেলে, তাই ঘরের লোকেরা, ছেলেদের কিছু দেবার আগে, ছেলেদের শেখাবার উদ্দেশ্যে, নিজেরা গিয়ে কম করে তা দিতেন। সেরূপ স্থলে আমার মনে কষ্ট হত। একদিন, মনে পড়ছে, প্রতিবাদও করে. ছিলাম। মা, বাবাকে বলে দিয়েছিলেন। বাবা তখন কিছু না বলে, সন্ধ্যের পর মহাভারত খুলে পড়ে

শুনিয়েছিলেন—ভিক্ষুকের আশা মিটিয়ে দান করা উচিত নয়। এর কারণ অবিশ্যি মহাভারতে দেওয়া ছিল। কৈতব-বাদীদের কারণের অভাব কখনও হয় না।

এই ভাবে দানের দ্বারা ওদের কতখানি দুঃখ-নিবৃত্তি হত অথবা এইরূপ দানধর্ম্ম অনেকে পালন করলেও মানব-সমাজে দারিদ্র্য-দুঃখ কোনও দিন মোচন হতে পারে কি না, অথবা ক্রমে কমতে পারে কি না, কিম্বা কোন দিন কমেছিল কি না এরূপ অনুসন্ধিৎসা-সূচক চিন্তা কখনও কারোর মনে আসেনি। তাই আমার মনেও সে চিন্তা আসেনি। তখন সব কর্ম্মই চলত কর্ত্তার ইচ্ছায়। কর্ত্তা ছিলেন প্রভুরা। আমি অন্তত প্রভু না হলেও, প্রভু সম্প্রদায়ভুক্ত বলে গৌরব অনুভব করতাম অবচেতন মনে।

অতিরিক্ত মাত্রায় দাসেদের বঞ্চিত ক'রে, প্রভুদের অত্যধিক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টাই যে মানব জাতির সমস্ত দুঃখের একমাত্র কারণ, তা সর্দ্দার প্রভুদের সংজ্ঞান মন অনেকখানি অবহিত ছিল। আর নিম্নস্তরের প্রভু আর উপপ্রভুদের এবম্বিধ পরম্পরা অনুসৃত ঔদাসীন্য বহু অভ্যাসের ফলে, সংজ্ঞান মন হতে বেহুঁসে অবচেতন মনে গিয়ে ইনিস্‌টিংট্‌এ পরিণত হয়েছিল।

এই কারণে অন্যের দারিদ্র্যে দুঃখানুভুতি, তার ফলে সেই দুঃখনিবৃত্তির চিন্তার বদলে ঔদাসীন্যের ইহাই প্রকৃষ্ট কারণ।

আর যে সর্দ্দার প্রভুরা একটু আধটু অবহিত ছিলেন তাঁদের মহিমা আর কত কীর্ত্তন করব!

"দুঃখী, ইহকালে যত দুঃখ ভোগ অকাতরে করতে পারত পরকালে তত সুখী হত" ইত্যাদি ছিল দার্শনিক সত্য, কাজেই দুঃখীর দুঃখ ভোগা, অথবা দুঃখীকে দুঃখ ভোগানই ছিল আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম, রিলিজান ইত্যাদি, এরই ওপর ভিত্তি করে সমস্ত দেশের সভ্যতা, কৃষ্টি, বনেদি শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি নীতি, ইত্যাদি, যতসব তথা-কথিত কালচার বা 'কুলটার' গড়ে উঠে ছিল তথা-কথিত সমস্ত সভ্য দেশে। আর আধ্যাত্মিক কালচার নির্ভর করত শতকরা নব্বই জন দাসেদের দুঃখ-দারিদ্র্য নিত্য প্রত্যক্ষ জনিত ঔদাসীন্যের ওপর, আর নির্ভর করত—সেই ঔদাসীন্য দেখে প্রভু শ্রেণীর আত্মপ্রসাদ লাভের ওপর।

এখানে এই গ্রহে এসে এখন দেখছি আর বুঝছি—দুঃখ দারিদ্র্য ব'লে এখানে কোন কথাই নাই। দুঃখ দারিদ্র্য প্রবর্ত্তন জন্য মানব-সমাজে যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, প্রভুদাস তন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল, এক কথায় তুমি তার নাম দিয়েছিলে কৈতববাদ। এখানে তার নাম গন্ধও নাই। এখানে সত্য আপনা হতেই ধরা দেয়। মিথ্যা, প্রতারণা, চুরি প্রভৃতি কোন রকম দুর্নীতি বা কুপ্রবৃত্তির বালাই এখন আর নাই। আমার মনে হয়, এই গ্রহের প্রতিটি মানুষ খাঁটি বুদ্ধ বা

সত্যিকার ইনটুইসনিষ্ঠ হতে পেরেছে। এরাই প্রকৃত হৃদয়বান। এদের তুলনায় সেই ভিখারিণীর প্রতি আমার যে ঔদাসীন্য তা সত্যই হৃদয়-বিদারক বলে এখন তীব্র অনুতাপের সহিত অনুভব করছি।

উঃ। আচ্ছা! তোমার মন ত এখন শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়েছে। এখন বল, সেই ভিখারিণীর দুঃখ দেখে, সে রকম দুঃখ তোমার কখনও ভোগ করতে হত না, এবং তোমার এমন সঙ্গতি ছিল যাতে করে কখনও—ওরূপ দুর্ভোগ ভুগতে হবেনা, আর তোমার কত সৌভাগ্য, কত সুখ,—এইরকম ভাবের একটা মন মাতান সুখানুভূতির আশ্বাস বা সান্ত্বনা সম্বন্ধে তখন কি তুমি অবহিত হওনি?

লীনা। অবহিত নিশ্চয় হয়েছিলাম, অধিকন্তু সে সুখানুভূতির মোহাবেশে তখন নিয়ত বিভোর হয়ে থাকতাম। সংজ্ঞান মনে তার বড় একটা সাড়া পেতামনা। অবচেতন মনে তা ইনষ্টিংট-এ পরিণত হয়ে থাকত। ঐ ভিখারিণীর একঘেয়ে দুঃখও তার সংজ্ঞান মন হতে অবচেতন মনে গিয়ে জুড়ে বসে ছিল। সেও যেমন আমাদের সুখে উদাসীন ছিল, আমিও তেমনি তাদের দুঃখে উদাসীন ছিলাম। তবে সত্য কারো অত্যন্ত দুঃখ দেখলে সংজ্ঞান মনে একটু যে দুঃখানুভূতি সাড়া দিত না তা বলতে পারিনা।

উঃ। এখন দেখ, তোমার সেই কবি গাথা—"দুঃখ বিনা সুখ কভু হয় কি মহীতে?" দুঃখীর দুঃখের সহিত তুলনা

বিনা সুখীর সংজ্ঞান মনে সুখানুভূতি হয়না। সুখ আর দুঃখ এই দুটি শব্দ আপেক্ষিক। নিরবচ্ছিন্ন সুখ যদি থাকে, আর অভাব জনিত দুঃখ যদি একেবারে না থাকে, তবে সুখ শব্দটার যেমন আবশ্যক হয় না, দুঃখ শব্দটার ব্যবহারেরও প্রয়োজন থাকে না। অভাব-বোধের নিবৃত্তি জনিত সুখ ছাড়া অন্য সুখ—আনন্দ, সন্তোষ, তৃপ্তি, প্রীতি ইত্যাদি শব্দের দ্বারা এখানে এখন অভিব্যক্ত হয়। আর অভাব বোধ বা দারিদ্র্য ছাড়া যে দুঃখ, তা কষ্ট, যন্ত্রণা, ব্যথা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা প্রকাশ এখানে হয়ে থাকে।

লীনা। সেকালে তাই সুখীদের সুখানুভূতির জন্য শতকরা নব্বইজনের দুঃখ জিয়িয়ে রেখেছিলেন প্রভুরা।

উঃ। এখন যদি ঐরূপ ভিখারিণীর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখ, তবে—

লীনা। যে দারিদ্র্য হতে সমূহ দুঃখ, পাপ, অপরাধ আদির উদ্ভব হত, মানবজাতির সেই দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন জন্য তুমি কি মনে কর আমি বুদ্ধদেবের মত সন্ন্যাস নিয়ে কৃচ্ছ্র সাধন করতে লেগে যেতাম।

উঃ। বুদ্ধদেবের মত সন্ন্যাস নিয়ে কৃচ্ছ্র সাধন করতে না—নিশ্চয়; কারণ তুমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট অর্জ্জন করেছ। কিন্তু তাঁর খাঁটি দুঃখানুভূতির তুলনা সেকালের ইতিহাসে নাই। তাঁর দুঃখানুভূতির মধ্যে

ছিল না শ্রেণী-স্বার্থের কুমতলব। সেকালে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়নি। মানুষ যে Economic Being এই মৌলিক সত্য তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবু তিনি জ্ঞান-বাদী ছিলেন; কিন্তু সে জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান নয়, কৈতববাদেরই নামান্তর ছিল। তাই তাঁর দুঃখানুভূতি-জনিত সত্যমুক্ত চিন্তাধারা কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতে আবার কৈতববাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর নিরীশ্বর-ধর্ম্ম-বিধানের, সুরুতে সাম্য—মৈত্রীর কতকটা ব্যবস্থা ছিল। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেরা পরবর্ত্তী কালে সব দিয়েছিলেন উল্টে। তিনি কিন্তু ভিক্ষার ইজ্জৎ বাড়িয়ে ছিলেন।

থাক্ সে কথা, বল তুমি কি করতে?

লীনা। বুদ্ধদেবের মত দুঃখানুভূতি জনিত দুঃখনিবৃত্তির কাজে, প্রাণপণ বলতে ঠিক যা বুঝায়, তা যে না করে সে হৃদয়হীন, অর্থাৎ তার হৃদয় fail করেছে; কাজেই সে বেঁচে থেকেও মৃত।

উঃ। এ ত হ'ল তোমার হৃদয়াবেগ! এখন কাজের কথা বল।

লীনা। এ পন ত, জীবিতাবস্থায় বহুকাল আগেই আমরা তিনজন করে ছিলাম। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তার পন্থাইত খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে লিবিডোর টানে পড়ে দেশে এসে মারা গেলুম। তারপর ভাবলুম মরে যখন

গেছি, পন্থা নিয়ে আর কি করব। গন্তব্য স্থানটা দেখেই মনটাকে তৃপ্ত করি। তোমার কৃপায় আমার সত্য চেতনা জেগেছে। নির্জ্ঞান আর অবচেতন মনের অবদমন হতে আমার সংজ্ঞান মন পূর্ণ মুক্ত হয়েছে। যদিও মরে আমার পৃথিবীর পক্ষে অকর্ম্মণ্য হয়েছি, তথাপি কৈতববাদী মানুষের পক্ষে কৈতববাদ হতে মুক্তির পন্থাটা যে কি, তা দেখবার জন্য মন অস্থির হয়েছে। সেই রকম আর একটা গ্রহ তুমি দেখাও। তারপরে জিজ্ঞেস কোরো—আমি বেঁচে থাক্‌লে কি করতাম।

উঃ। তথাস্তু।

লীনাদেবী আমায় বললেন—"এ হোটেলে থাকতে আর ভাল লাগচে না।

আমি বলেছিলাম—কলকাতা যেতে প্রাণ চাচ্ছে বুঝি?

লীনা। কিন্তু মিসেস্ দত্ত বলে পরিচয় দিলে, কৌতুহল নিবারণ জন্য অনেক কিছু বলতে হয়। আমাদের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গোপন রাখতে চাই না; তবু মিসেস রায় বললে—আর কোন কৈফিয়ৎ—নাঃ! তা বল্‌লে সত্য বলা হয় না। আসল কথাটা কি জান? তোমার মন যা চাচ্ছে, আমার মনও ঠিক তাই চাচ্ছে, মিছে সংযমের কসরত চালাবার সার্থকতা কি, তুমি বলতে পার?

আমি। দুনিয়ার ভক্তিবাদ-মতে, কামেচ্ছা দমন করলে নাকি মনবল বা আত্মশক্তি দুর্দ্দমনীয় হয়—এই শাস্ত্র আমার

আছে—এই ভাবের একটা আত্মপ্রত্যয় জন্মালে, অন্য বিষয়েও শক্তি প্রয়োগের দ্বিধাহীন ইন্‌ক্লিনেশন সহজে মনে জেগে ওঠে, তাতে মানুষ ক্রমে শক্তিমান হয়। আমি এই ধারণা নিয়েই, এতদিন, তুমি যা বললে, সেই কস্‌রতই ত করছিলাম। তা মন্দ লাগে নি, অনেক সময় মনে হয়েছে—আর পারি না; কিন্তু—

লীনা। কিন্তু তুমি নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ। তোমার সংজ্ঞান মনের সঙ্গে অবচৈতন্যে স্থিত কম্‌প্লেক্সের এটা ঝগড়া বা কন্‌ফ্লিক্‌ট্‌; যা প্রায় সব সময় বেহুঁসে আর কখন কোন বিশেষ বিষয়ে হুঁসে আমাদের চিন্তার একত্ব নষ্ট করেছে, অর্থাৎ মনের একাগ্রতা ডিষ্টারব্‌ করেছে। এই রকম ডিষ্টারব্‌ না করলে সংজ্ঞান চিন্তার কাজটা অপেক্ষাকৃত অনেক সুষ্টু হত; আমার বাণী বলার আর তোমার তা লেখার মধ্যে বেহুঁসে, আর কখনও ক্বচিত হুঁসে লিবিডোর কম্‌প্লেক্‌স্‌, আমাদের সংজ্ঞান মনকে যে বিক্ষিপ্ত করেছে তা কি তুমি লক্ষ্য কর নি?

আমি বলেছিলাম—এখন তা বুঝছি কিন্তু—

লীনা। আমার বাণী থেকে পেয়েছ—কামেচ্ছা তৃপ্ত না হলে, দেহ মনের বিকৃতি বা অনেক প্রকার নার্ভাস ব্যাধি জন্মে। মনঃ-সমীক্ষক ব্যতীত তা ধরতে বা তার চিকিৎসা করতে পারে না।

যৌন মিলন ব্যতীতও কামেচ্ছা অনেক প্রকারে কিছুটা তৃপ্ত হয়। কিন্তু তাতে সবসময়ে দেহ মন খুব অসুস্থ না হলেও, মনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন ক্রমোন্নতি ব্যাহত হয়। এইরূপে মনের স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট-প্রগতির সুষ্ঠুপথ অনেক সময় রুদ্ধ হলেও, তোমার সেই সংযমের ঢং অপেক্ষা অনেকাংশে সুসংগত।

তোমরা যাকে সংযম বলছ তাতেও স্বাভাবিক যৌন মিলন ব্যতীত, পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিম উপায়ে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হয়। এতকাল তোমার নিজের সংযমের ভাণ যে, বৃথা আত্মতৃপ্তি অথবা বাহাদুরী দেখান, তা তুমি বুঝতে পার। তোমার সবজান্তা বিদ্যা-বাগীশদের রচিত "কামশাস্ত্রের" একটা প্রবচন তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি; তাতে বুঝবে—শাস্ত্রকাররা জেনে শুনে চিন্তাশীলদের মনে ক্লৈব্য আনবার জন্যই বৃথা সংযম সংযম করে নিজদের স্বার্থ সাধনের পথ পরিষ্কার করেছিলেন। কামশাস্ত্রের সেই বচনটা তোমায় শোনাই—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলি
প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষিণং—

আমি। ব্যস! আর না, আমি বুঝেছি—

লীনা দেবী বললেন, তবু তোমাকে শুনতে হবে, এখন মন দিয়ে শোন, সুখ পাবে; তোমার আমার তথা-কথিত বিবাহের রাত্রি অবধি, যদিও আমার মন, রাজীবের

ভাবে একেবারে ছেয়েছিল, আর সেই রাত্রে, যদিও তুমি আমার প্রতি অন্যায় করছ ব'লে বা করবে ব'লে একটা ক্ষীণ সন্দেহ ছিল, তথাপি যখন তোমার সুন্দর মুখখানির মধুর ভাব যা বিবেকের প্রতিভায় তোমার সমস্ত দেহ মনকে সতেজ সজীবতায় তীক্ষ্ণোজ্জ্বল করেছিল, তা থেকে তথা-কথিত সংযমের ঠেলায়, অতি কষ্টে চোখ ফেরাতে বাধ্য হয়েছিলাম। তোমার মনের বা গুণের পরিচয় আগেই পেয়েছিলাম। তখুনি তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার কমপ্লেকস বা সতীত্বের সংস্কার আমার ভাবপ্রবণ মনে ভীষণ খোঁচা দিয়ে বলেছিল এটা সম্পূর্ণ অন্যায়। তাই একনিষ্ঠতা বা সতীত্ব বজায় রাখতে গিয়ে, মন থেকে তা মুছে ফেলেছি বলে নিশ্চিন্ত হবার বৃথা ভাণ করেছিলাম তখন থেকে। এই ভাল লাগাই ক্রমে কামানুরাগে (পূর্ব্বরাগে?) পরিণত হয়েছিল। তার পর ছমাস তোমার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ ও মধুর সাহচর্য্যের বেহুঁস কৃত্রিম উপায়-লব্ধ কাম ভোগের পর, রাজীবের সঙ্গে যৌন মিলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার হুঁস হয়েছিল যে, আমার মন তোমাকেও সমানে চায়। তখুনি অতি ঘৃণার সহিত মন থেকে সেটা বিক্ষিপ্ত করবার বা মুছে ফেলবার বৃথা চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টাটা যে বৃথা হয়েছিল, এখন তা বুঝতে পারছি। পরে মাঝে মাঝে, কাকে অধিক ভাল লাগে তা বিচার

করবার প্রবৃত্তি বেহুঁসে জাগত। তখুনি ঘৃণায়,—লজ্জায় নিজেকে অপরাধী মনে হত। ক্রমে অনেক পরে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, মানুষের মন এককালে একাধিক পুরুষ বা নারীর সমান অনুরাগী হতে পারে। তোমার মন এই রকম সব কথা শোনবার জন্য হ্যাংলা—

আমি। রাজীব বেঁচে থাকলে, তার সামনে এই থিওরী কি এস্‌টাব্‌লিস্‌ করতে পারতে?

লীনা। নিশ্চয়, এখন পারতাম। আমার মৃত্যুর আগে পারতাম কিনা বলতে পারি না। রাজীবের মৃত্যুর পর কিছুকাল কামেচ্ছা দমিত হয়ে ছিল। তখনো বন্ধুরূপেও যে আমার সান্ত্বনা ছিলে তুমিই! একথা আমি ইচ্ছে করেও ভুলতে পারিনি। তারপর তোমার—

আমি। থাক্, আর সমঝাতে হবে না। একটা কি জান? আমাদের রাউলকে এ-কথাটা জানাতে হবে।

লীনা। বেশত! সে বড় হয়েছে, সবই তাকে জানাব। তাকে এখুনি 'তার' কর এয়ারে আসতে।

আমি। তা করেছি। আর জানিয়েছি—সে এসেই যেন আমায় বাবা বলে ডাকে।

লীনা! দেখ, দুজনেরই মন একই তালে একই গতিতে চলেছে!

আমি তখন বলেছিলাম—এবার তোমার বাণী হবে—এই গ্রহ থেকেও এক উন্নততর গ্রহের বিষয়।

লীনা দেবী বল্‌লেন—আচ্ছা, এখন!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন।

পৃঃ	লাঃ	ভুল	শুদ্ধ
১৬	১৫	পাবি	"পাবী"
১৭	১৭	ইচ্ছানুগত	ইচ্ছানুগ
১৪	৪	কাজেই তার নাই	নাই। কাজেই তার
২৯	১২	অসীমই	সসীমই
৩৬	১	বেলুম	বেলুন
৩৭	২০	সদাব	সাদাব
৩৮	৮	জোট	ছোট
৩৯	৮	উন্মুখ	উন্মুক্ত
৬৪	১৩	করলে	করতে
৮০	২০	বব্যস্থা	ব্যবস্থা
৯৩	১৯	অনন্দই	আনন্দই
৯৪	১৭	হয়ে	হয়
১০৮	১২	**লাইনের প্রথমে**	উঃ।
১১০	১৮	তৃহত্যা	ভ্রাতৃহত্যা
১১৩	৬	**লাইনের প্রথমে**	উঃ।
১১৮	১৭	সুস্পষ্ট	সুপুষ্ট
১৩৮	১৬	আমার ছেয়ে	আমার মন ছেয়ে
১৯৯	১	তাহা	তা
১৭১	১	শক্ত করা	শতকরা
১৭২		লীনা	
২০৪	৪	life	living
২২২	২৩	ভাষিনং	ভাষিতং

লেখকের আর একখানি পুস্তক

বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা

বইখানার বিক্রি শেষ হতে আর অল্প বাকী আছে। শীঘ্রই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে বেরোচ্ছে। এই বই সম্বন্ধে কয়েকখানি বিশেষ সাময়িক পত্রিকার সমালোচনা নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত হল।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

এই পুস্তকে গ্রন্থকার ১৯০২ হইতে ১৯০৯ পর্য্যন্ত আলিপুর বোমার মামলার চরম নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বাংলার বিপ্লবীদের কার্য্যাবলী, তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এই বিপ্লব চেষ্টা বাংলা দেশের মনে এক গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র, কানাই, খুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী স্বেচ্ছায় মরণ বরণ করিয়া এই প্রচেষ্টাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। দার্শনিক অরবিন্দ ঘোষ, বাংলা ভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাশয়গণ তাঁহাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধাদির দ্বারা সেই বিপ্লবের কথা গৌণভাবে আমাদিগকে ক্রমাগত মনে করাইয়া দিতেছেন

স্থানাভাব বশতঃ এত বড় পুস্তকের সম্যক সমালোচনা এখানে অসম্ভব। গ্রন্থকার এই পুস্তকে বিপ্লবের বিফলতার কারণ, জনসাধারণের অশিক্ষা ও স্বভাববোধশক্তির লোপ, অহৈতুকী গুরুভক্তি, নেতা ও উপনেতাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের খিচুড়ী বানাইবার চেষ্টা, এবং কর্ম্মবিফলতায় অলৌকিকত্বে বিশ্বাস ও তাহাতে আশ্রয়ের চেষ্টা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, হিন্দুজাতি ও বর্ণ সমস্যা প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের এই পুস্তক লিখিবার অধিকার নির্ণয় করিতে হইলে তাঁহার একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন। ১৯০২ সালে ইনি মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে এই জাতীয় রাজনৈতিক বিপ্লব-চেষ্টা এই দেশে ছিল বলিয়া আমরা জানি না। অতএব এই সমিতির অনভিজ্ঞ নেতা ও উপনেতাদের নানাপ্রকার ভ্রম, ত্রুটি, খামখেয়ালী ও অকর্ম্মণ্যতা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হওয়ায় গ্রন্থকারই সর্ব্বপ্রথম ১৯০৬ সনে ফরাসীদেশে যাইযা সেখানকার Anarchist ও Socialist দলে যোগদান করেন এবং সেখানে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে থাকিয়া বোমা প্রস্তুত এবং বিপ্লবের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিদ্যা যথাসম্ভব শিক্ষা করিয়া ১৯০৮ সনের ফেব্রুয়ারিতে দেশে ফিরিযা আসেন। কিন্তু এখানকার গুপ্তদলের কর্ত্তৃপক্ষ হেমবাবুর সংগৃহীত বিদেশী বৈপ্লবিক দল গঠনের কায়দাকানুন ও নিয়মাবলী ধর্ম্মের দেশের পক্ষে কার্য্যকর নয় মনে করিযা কাজে লাগান নাই। দেশে প্রত্যাগমন করিবার পর তিন মাসের মধ্যেই গ্রন্থকার ধৃত হয়েন এবং যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে যান। সুতরাং বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রণিধানযোগ্য। আমরা অনেক বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত একমত নাও হইতে পারি; এমন কি কোন কোনও নেতা ও উপনেতা সম্বন্ধে তাঁহার মত হয়ত আমাদিগকে পীড়াও দিতে পারে। কিন্তু যুক্তি ও প্রমাণ থাকিলে ঐ কষ্ট সহ্য করিয়া লইতেই হইবে।

আমাদের এই ভক্তির দেশে, আমরা নেতাদের দায়িত্ব স্থির করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি না, কেবল তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ মানিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। ইহার ফলে দেশে দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক ধর্ম্মগুরুর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব! এই গ্রন্থেই প্রথম দেখিলাম যে গ্রন্থকার নেতাদের শ্রেণী-বিভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন

এবং নিজের রাজনৈতিক গুরুরও ভ্রম, ক্রটী, কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রভৃতির সমালোচনা করিয়া এই অহৈতুকী ভক্তির দেশে নিতান্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নেতাদের শ্রেণী এইরূপ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ধোঁয়াময় নেতা, লীলাময় নেতা, চিন্তাধারা প্রবর্ত্তনকারী ভাবের নেতা, আদর্শ-কর্ম্মী নেতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণ নেতা। (কিন্তু প্রয়োজন অভাবে বোধ হয় জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত চাঁদার অসদ্ব্যবহারকারী নেতার উল্লেখ করেন নাই।) তিনি এই গ্রন্থে "ক বাবু" বলিয়া একজন নেতার সমালেচেনা করিয়াছেন। এই 'ক বাবু" ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দবাবু যে একই ব্যক্তি তাহা অগ্নিযুগের অগ্নিপুরোহিত "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা"র রচয়িতা উপেন্দ্রনাথ বলিয়া দিয়াছেন। অতএব আমরা গ্রন্থকারের "ক বাবু"কে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বলিয়া বুঝিব। শ্রীযুক্ত অরবিন্দের বিরুদ্ধ সমালোচনায় তাঁহার বর্ত্তমান ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইবেন।

বিপ্লব-নেতা, ডাকাতি ও সাহেব বধের উপদেষ্টা, নিজ ভ্রাতা বারীনের সর্ব্ব বিষয়ে অবিচারের সমর্থক, বিপ্লব ও অলৌকিক শক্তির সমাবেশকারী, আলিপুরের বিপদসঙ্কুল মোকদ্দমায় আশ্রিতত্যাগী ও নিজপক্ষ সমর্থনকারী শ্রীযুক্ত অরবিন্দের সমালোচনা গ্রন্থকার হেমচন্দ্র করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দের কলিকাতা ত্যাগের পর আর তাঁহার বিষয়ে গ্রন্থকার কোনও সমালোচনা করেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত অরবিন্দের বর্ত্তমান ভক্তবৃন্দ—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বন্দিত, গীতা ও উপনিষদ ব্যাখ্যাতা দার্শনিক, যোগী, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের মীমাংসক পণ্ডিচারীবাসী বর্ত্তমান অরবিন্দের "মাপকাঠীতে" হেম বাবুর অতীত অরবিন্দের সমালোচনা অযৌক্তিক ও বিদ্বেষদুষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

"দূরদৃষ্টিহীন ভাববিলাসী অক্ষম বিপ্লবী নেতা" ও উপনেতার পাল কিরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন হইয়া বাংলার ভাবপ্রবণ বালকবৃন্দকে মরণের পথে ঠেলিতেছিলেন তাহার আভাস এই পুস্তক পড়িয়া পাওয়া যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভিন্ন, অন্যান্য নেতা ও উপনেতারা ডি-এল-রায়ের নন্দলালের মত—আমি মরিলে দেশের দশা কি হইবে—ভাবিয়া চিরকালই নিজেরা নিরাপদ ব্যবধানে থাকিতেন, এবং অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালকদিগকে হত্যা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। "হত্যাকারী লটারী দ্বারা স্থিরীভূত হইত" বলিয়া যে একটা কথা প্রবাদের মত চলিয়া আসিতেছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়াই গ্রন্থকার প্রচার করিয়াছেন।

অবশ্য একথা অনেকে বলিতে পারেন যে, সে সময় গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করাই সাহসের পরিচায়ক। ইহার উত্তরে অপর পক্ষ কি বলিতে পারে না যে, ভাবাবেগে গুপ্তসমিতিতে যোগ দেওয়া এবং ধরা পড়িলে গুপ্তসমিতির সমস্ত বিষয় প্রাণপণে গোপন রাখা কর্ত্তব্য জানিয়াও, বারীন প্রভৃতির মতন ভাবাবেগে সহকর্ম্মীদের নাম ও অন্যান্য বিষয় নিজের সুবিধামতভাবে পুলিশের নিকট প্রকাশ করা খুব বাহাদুরীর কার্য্য বলিয়া মনে হয় না! তবে জগতে ভাষার সাহায্যে ও প্রোপাগ্যাণ্ডা দ্বারা অনেক অসৎ কর্ম্মও সৎ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে।

আমাদের বহুকালের বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে তীব্র ভাষায় আঘাত করায় প্রথমেই আমাদের মন গ্রন্থকারের উপর বিরূপ হইয়া ওঠে—কিন্তু পুস্তক পাঠ শেষ হইলে আমরা গ্রন্থকারের সত্যনিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান্ না হইয়া পারি না। ঘটনার এতদিন পরে এত বড় বই লিখিতে হইলে প্রথম সংস্করণে একটু একটু কথার ভ্রম ও ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক কিন্তু তাহাতে আসল ভাবের বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ হয় না।

দেশপ্রেমিক মাত্রেরই এই পুস্তকখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করা উচিত।

প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩৩৫

এক সময় দেশে বিপ্লবের যে একটা প্রয়াস চলিয়াছিল তাহার নাম ছিল এনার্কি, কন্‌স্পিরেসি ইত্যাদি। তারপরে হঠাৎ চাকা ঘুরিয়া গেল—সেই সময়ের নাম হইয়া গেল 'অগ্নিযুগ', সে সব কথার নাম হইল 'অগ্নিমন্ত্র', সে-সব মানুষের নাম হইল 'অগ্নি-সারথী', ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে রোমান্স ও কল্পনার মায়াজাল সেই বিপ্লবের ক্ষীণ প্রয়াসকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের সম্মুখের এই গ্রন্থখানি লইয়া সেই প্রথম অগ্নি-সারথীদেরই একজন সেই সব ধোঁয়া ও কুয়াসা অপসারিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।' হেমবাবুর সাহস দুর্জ্জয়, সত্যনিষ্ঠা গভীর, দৃষ্টি ব্যাপক ও চিন্তাশক্তি সচরাচরের বাঁধা পথ ছাড়িতে ভীত নয়। ফ্যাশান ও ন্যাকামি ছাড়িয়া বিপ্লবকে পৃথিবীর অন্যান্য বিপ্লবের রীতি ও নীতির সঙ্গে মিলাইয়া, তুলনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, কোথায় গলদ জমিয়াছিল, জাতির বস্তু-বিমুখ মানসলোককে সত্যকারের বস্তুনিষ্ঠ বিপ্লব-প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ না করিয়া অজ্ঞানতা ও হৃদয়াবেগেরই খোরাক জোগাইয়া দূর দৃষ্টিহীন ভাব-বিলাসী অক্ষম বিপ্লবী নেতার পাল কিরূপ বিপ্লবের ছেলেখেলা করিয়াছেন। 'লীলাময় নেতা', ধোঁয়াময় নেতা', 'ভাবের নেতা', 'আদর্শকর্ম্মী নেতা', 'প্রতিহিংসা পরায়ণ নেতা',—নেতা, উপনেতা, এমন কি চ্যালার দলও—লেখকের এই উদ্ধত Iconoclasm সহ্য করিবে না। তথাপি এই স্পষ্ট ভাষণের প্রয়োজন আছে—আজও দেশ হইতে এরূপ নেতারা লোপ পান নাই, এবং ইঁহাদের আওতায় বিপ্লব ত সুদূরের কথা, যে-কোন

স্বাধীনতার প্রয়াসই লোপ পাইতে বাধ্য। আমরা লেখককে সাধুবাদ করিতেছি,—দেশ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠায় উপকৃত হইবে।

মাসিক বসুমতী—৭ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩০

*****ভাষার মনোহারিত্বে, ভাবের আতিশয্যে এবং ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশে গ্রন্থখানি উপাদেয়,****পরন্তু গ্রন্থকারের সহজ, সরল, দ্বেষলেশহীন কঠোর ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা তাঁহার লিপি কুশলতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করে।****

দৈনিক বসুমতী—১১ই শ্রাবণ, ১৯৩৫

****হেমবাবুর এই রচনার বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণ। ঘটনার পর ঘটনার কারণ সন্ধান করিয়া, তাহার ফল বিশ্লেষণ করিয়া, তিনি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন****

আনন্দবাজার পত্রিকা—৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৫

****বিপ্লববাদী নেতা ও কর্ম্মীদের চরিত্রের যে সমস্ত দৌর্ব্বল্য, তাহার প্রধান কারণ—সে সমস্ত বিষয় কেহ সম্যক্ আলোচনা করেন নাই, কিন্তু তবুও উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো সেই অপ্রিয় আলোচনা করিবার দায়িত্ব এই প্রবন্ধে বহন করিয়াছেন। এ তাঁহার কম সাহসের পরিচয় নহে।*** হেমবাবু আরও দেখাইয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন না হয়, দেশের গণশক্তিকে আমরা জাগ্রত করিতে না পারি, সহস্র সহস্র বৎসরের পরাধীনতায় নিষ্পেষিত, অজ্ঞ, কুসংস্কারাবদ্ধ জনগণকে আমরা স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ করিয়া তুলিতে না পারি, ততদিন কোন দিক দিয়াই আমাদের জাতীয় উন্নতি লাভের আশা নাই। এই গ্রন্থ প্রত্যেক দেশহিতকামী বাঙ্গালীর পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য; বিপ্লববাদ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে দূর হইবে।****

AMRITA BAZAR PATRIKA,—Dated 29-9-28 says :

* * * * The book is very interesting from cover to cover, as revealing the mysterious and daring activities of the secret societies****But the author has also pointed out the week spots of those organisations which suffered ship-wreck * * * *

BENGALI,—Dated 29-8-28 says :

* * * * The writer is a keen observer and student of men and things and his analyses of their character and his exposure of their real nature and springs of action could have been easily put down to mischief and, perversity if they did not bear the stamp of fearless dispassionate and outspoken sincerity and genuine love for those who suffered like him * * * * The book is to be praised, not so much as a record, but as an analysis of the entire Organization which had its head-quarters in Murarepukur Garden, its composition, its purposes and ultimate cataclysmic discomfiture * * * * The language of the book is incisive, pungent and direct, There is no attempt at literary finish, or posing for effect ; it is a plain outspoken narrative with a running commentary which at places has a telling effect.

CHARU ROY, Mayor,
Chandernagar,